চোখের সুখ অসুখ



ডঃ রণবীর মুখোপাধ্যায়
ডঃ রমেন মজুমদার



ডঃ রণবীর মুখোপাধ্যায় কলকাতার প্রথম সারির একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ। দীর্ঘদিন তিনি কলকাতার ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষুবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার 'আই কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এর চীফ অর্গ্যানাইজার অ্যান্ড ডিরেকটর এবং 'ইন্টারন্যাশন্যাল' আই-ব্যাঙ্ক, ক্যালকাটা'-র মেডিক্যাল ডিরেকটর।
ইংল্যান্ডের 'কলেজ অভ অফথ্যালমোলজি'-র ফেলো ডঃ মুখোপাধ্যায় এম. বি. বি. এস. ও ডি. ও. এম. এস. পাস করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, এম. এস. হন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং পি-এইচ. ডি. করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
প্যারিসে, সান ফ্রান্সিস্কোয় ও রোমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চক্ষুবিশেষজ্ঞ-সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগ দেন। বহু গবেষণা-নিবন্ধের রচয়িতা তিনি। চিকিৎসাবিষয়ক বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত, যেমন – ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র 'জিমা', 'আফ্রো-এশিয়ান জার্নাল অভ অফথ্যালমোলজি', 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অভ অফথ্যালমোলজি', 'অফথ্যালমিক নিউজ অ্যান্ড ভিউজ' ইত্যাদি।
ডঃ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের প্রাক্তন সদস্য।

চোখের সুখ অসুখ

ডঃ রণবীর মুখোপাধ্যায়
ডঃ রমেন মজুমদার

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলকাতা—৯

প্রকাশক
অরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা—৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : স্বপন পালচৌধুরী
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯১

মূল্য : চল্লিশ টাকা

কম্পোজ ঃ
লেখনী প্রিন্টার্স
এডি-৪৯, সল্ট লেক
কলকাতা-৯১

গ্রন্থ মুদ্রণ ঃ
অরুণ অফসেট
সোনারপুর
দক্ষিন ২৪ পরগনা

If I could write the beauty of your eyes
And in fresh numbers number all your graces,
The age to come would say, "This poet lies—
Such heavenly touches ne'er touched earthly faces."

—SHAKESPEARE

চোখের সুখ অসুখ

"অক্ষোঃ ফলং তাদৃশ-দর্শনং হি," শ্রীমদ্ভাগবতের একথার অর্থ, চোখের চরম সার্থকতা সেই পরম রূপের দর্শনে। সেই পরম রূপের দর্শনের পরে আর কিছু দর্শন করার থাকে না। জীবনে পরম চাওয়া সেই পরম রূপের দর্শন। সেই পরম রূপের দর্শনেই জীবনের পরম সুখ। সুখ শব্দের একটি অর্থ, আনন্দ। জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভের জন্য চাই চোখ অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি।

সুখ শব্দের আর-একটি অর্থ, অসুখের অভাব। সুখের অভাব যদি অসুখ হয় তাহলে অসুখের অভাবও সুখ হতে পারে। অসুখ শব্দের একটি অর্থ, রোগ। রোগ না থাকলে সুখ থাকে।

সুখ আর অসুখ যেন দিন আর রাত্রি, একের বিদ্যমানতায় অপরের অবিদ্যমানতা। কিন্তু রাত্রিকে ঠেকানো যায় না, অসুখকে ঠেকানো যায়। বিংশ শতাব্দীর এই শেষপ্রহরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরমোৎকর্ষের ক্ষণে চোখের বহু অসুখই ঠেকানো যায়, আবার বহু অসুখ অঙ্কুরে বিনষ্ট করা যায়। সেই খবর দিতেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা।

খবর লেখা হয় যে ভাষায়, আমরা সেই ভাষায় এই গ্রন্থ লিখি নি; খবর বলা হয় যে ভাষায়, সেই ভাষায় আমরা এই গ্রন্থ লিখেছি—আর তার জন্য কিছু কিছু পুনরুক্তি আছে, ইংরেজী আছে বেশকিছু। ইংরেজী কথাগুলি অনেকই বাংলা করা যেত, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করেই তা করি নি; পরিভাষার বাসায় হানা দিয়ে অনেক ইংরেজীরই বাংলা আমরা নিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করেই তা আনি নি। কারণ, আমরা তো খবর লিখতে চাই নি, খবর বলতে চেয়েছি—আপনাকে পাশে বসিয়ে আমরা আপনাকে খবর শোনাতে চেয়েছি।

ইংরেজী কথাগুলি যে বাংলা হরফে লিখেছি তারও কারণ আছে; চোখে যেন কাঁটা না ফোটে। এত ইংরেজী কথা যদি বাংলা হরফের মধ্যে উঁচু হয়ে থাকে তাহলে চোখে কাঁটা ফুটবেই। তাই ইংরেজী কথাগুলিকে বাংলা পোশাক পরিয়ে বাংলা কথার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি যাতে তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে। তবু যদি আপনি বোঝার সুবিধার জন্য অ-সাধারণ ইংরেজী কথাগুলি ইংরেজী হরফে দেখতে চান, গ্রন্থের শেষে একসঙ্গে দেখতে পাবেন।

এই গ্রন্থ পড়ার সময় একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা কোনো সিলেবাস অনুযায়ী চোখের রোগ ও তার প্রতিকার বিষয়ে কোনো পাঠ্যপুস্তক

লিখতে চাই নি, তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব সযত্নে সর্বতোভাবে এড়িয়ে গেছি। আমরা চেয়েছি চোখের সাধারণ রোগব্যাধি সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত করতে এবং সেই রোগব্যাধির কী চিকিৎসা আছে তা আপনাকে জানাতে। শুধু এইটুকুই। এইটুকু যদি আমরা করতে পেরে থাকি তাহলে আমাদের প্রয়াস সার্থক।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে কথাটা আগেই বলা যেতে পারত সেই কথাটা পরে বলছি: যাঁরা চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন তাঁদের জন্য এই গ্রন্থ নয়, যাঁরা হারাতে পারেন তাঁদের জন্য। ভয় পাবেন না, তাঁদের মধ্যে আপনিও থাকতে পারেন। আপনি বোধহয় জানেন না, পৃথিবীতে যত অন্ধ আছে, সবচেয়ে বেশি আছে ভারতে; ভারতে যত অন্ধ আছে, তার একটা বড়ো অংশ আছে পশ্চিমবঙ্গে।

অথচ, পশ্চিমবঙ্গে চোখের চিকিৎসার তেমন সুযোগ নেই, যা আছে তা অতি অপ্রতুল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন, গোটা পূর্বভারতেই চোখের চিকিৎসার দৈন্যদশা। তাই যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা দিল্লি চণ্ডীগড় মাদ্রাজ কিংবা ইংল্যাণ্ড অ্যামেরিকা অথবা অন্য কোথাও চলে যান; আর যাঁদের সামর্থ্য নেই তাঁরা অন্ধত্বের অন্ধকারের মধ্যে কাল গোনেন। এই হতভাগ্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে কলকাতার কয়েকজন সেবাব্রতী তরুণ চক্ষুচিকিৎসক আর চিকিৎসাকর্মী ১৯৮৪ সালের ১ জুলাই মধ্যকলকাতায় 'আই কেয়ার অ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার' নামে একটি চারাগাছ রোপণ করেন। বহু মানুষের অকাতর দান অনুদান সমর্থন ও সহযোগিতার জলসিঞ্চনে আর নিঃস্বার্থ যত্নপরিচর্যায় সেই চারাগাছ আজ বৃক্ষে পরিণত। সেবাব্রতীরা এখন এই বৃক্ষকে বিশাল বিটপিরূপে দেখতে চান। তাঁদের কর্মযজ্ঞে আমরা সেই শুরু থেকেই শামিল। তাঁদের যজ্ঞে আজ আমরা যে সমিধ এনেছি সেই সমিধে পরোক্ষে আপনার হাতেরও স্পর্শ আছে, আপনাকে সেজন্য ধন্যবাদ জানাই: যে মূল্য দিয়ে এই গ্রন্থখানি আপনি কিনেছেন তার একাংশ আমাদেরও প্রাপ্য হয়, আমাদের সেই প্রাপ্য অংশ চলে গেছে যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহে। আমরা ধন্যবাদ জানাই এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রী অরুণ পুরকায়স্থকে, কারণ তিনিও তাঁর লভ্যাংশের একাংশ দান করেছেন 'ব্রতচারী' হিসাবে।

১ জুলাই, ১৯৯১

রণবীর মুখোপাধ্যায়
রমেন মজুমদার

আই কেয়ার অ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার
বিপ্লবী নিকেতন
১২-এ ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০১৭

এই গ্রন্থের রয়্যালটি বাবদ লেখকদের
যে অর্থ প্রাপ্য হয় তা চলে যাবে
কলকাতার 'আই কেয়ার অ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টারে'।

এক : প্রকৃতির বিস্ময়কর সৃষ্টি

আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান বলতে এখানে বৈদগ্ধ্য নয়, বোধ বা বোঝবার শক্তি। আমাদের চারপাশের জগৎটাকে আমরা বুঝতে পারি যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার মধ্যে চোখ সর্বশ্রেষ্ঠ। বেঁচে থাকার যে সুখ, চোখের দৃষ্টি ছাড়া সে সুখ সম্পূর্ণ হয় না; বেঁচে থাকার যে দায়িত্ব, চোখের দৃষ্টি ছাড়া সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায় না। বেঁচে থেকে আমাদের যে অযুত কর্ম সম্পাদন করতে হয়, চোখের দৃষ্টি সেই কর্মসম্পাদনে আমাদের সহায়তা করে। চোখ প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আমাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি আর-একটিও নেই।

মানুষের চোখকে অনেকসময় ছবি তোলার ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু মানুষের তৈরি কোনো ক্যামেরাই মানুষের চোখের ধারেকাছে যেতে পারে না—তা তার মধ্যে যত সফিস্টিকেশন আর যত অটো...শনই থাক। পৃথিবীর যত সুন্দর আর যত কুৎসিত বস্তুই হোক, মানুষের চোখ ক্যামেরার মতো তা একেবারে স্ব-রূপে মানুষের মনে মুদ্রিত করে দিতে পারলেও মানুষের চোখের সেই বিস্ময়করতা নেই মানুষের তৈরি ক্যামেরায়।

মানুষের চোখ মানুষের এক অমূল্য সম্পদ, জগতে কোনোকিছুর বিনিময়েই তা পাওয়া যায় না। এই যে অতি-সূক্ষ্ম অতি-জটিল পরম-বিস্ময়কর চোখ সেই চোখ মানুষের কাছে খুব বেশি কিছু দাবি করে না। চোখকে সুস্থ ও কর্মণ্য রাখতে মানুষের বেশি শ্রম, বেশি সময়, বেশি অর্থ দরকার হয় না। দরকার হয় সামান্য একটু যত্ন, সামান্য একটু পরিচর্যা। সেই সামান্য যত্ন আর পরিচর্যা থেকেও মানুষ চোখকে প্রায় সময়েই বঞ্চিত করে। তার ফলে, বহু মানুষের চোখের সামনে থেকে গোটা জগৎটাই হারিয়ে যায়, তারা নিজেরাও নিমজ্জিত হয় নিঃসীম অন্ধকারে।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ বোধ হয় অন্ধত্ব। কিন্তু মানুষ যেভাবে তার চোখকে দেখে তাতে কখনও এই অভিশাপ বড়ো বলে প্রতিভাত হয় না। মানুষ তার দাঁতেরও যেটুকু যত্ন নেয়, চোখের তা নেয় না। অনেকসময়েই তার ফল হয় মারাত্মক। একবার সেই ভয়ঙ্কর সত্যের কথা ভাবুন তো—আপনার চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে, আর কখনও তা ফিরে পাওয়া যাবে না! ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়।

এই যে আপনি এই বইটা পড়ছেন, আপনাকে হয়তো পড়ার জন্য তির্যকদৃষ্টিতে বইটার দিকে তাকাতে হচ্ছে অথবা বইটা আপনার চোখের একেবারে কাছে এনে ধরতে হচ্ছে কিংবা বইটা হাতে ধরে যতখানি সম্ভব চোখ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। আবার, এমনও হতে পারে যে, বইটা আপনি কোথাও ধরে স্বস্তি পাচ্ছেন না, যেখানেই ধরছেন ঝাপসা দেখছেন।

আপনি যদি বয়স্ক মানুষ হন তাহলে হয়তো পরম ঔদাস্যে বলবেন, "এ তো হবেই, বয়সের ধর্ম। বয়স হলে যেমন চুল পাকে, দাঁত পড়ে, কানে কম শোনে তেমনি চোখেও কম দেখে। এতে আর কী করার আছে?" এইখানেই আপত্তি। আপনি প্রথম অর্ধেকটা জানেন, পরের অর্ধেকটা জানেন না। একথা হাজারবার সত্যি, আমাদের বয়স যত বাড়ে, দেহে তত পরিবর্তন ঘটে আর কখনও কখনও সেই পরিবর্তন আমাদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে গণ্ডি টেনে দেয়, আমাদের দৃষ্টিশক্তি তার ব্যতিক্রম নয়—এবং চোখের অনেক অসুখবিসুখ বয়সের জন্যই হয়। কিন্তু আপনার জানা দরকার, আপনি বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাস করছেন, যখন বিজ্ঞান তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল ও অপ্টিক্যাল টেকনিকের আজ এত উন্নতি হয়েছে যে, আপনি যদি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যান তাহলে আপনার বয়স হওয়া সত্ত্বেও আপনার চোখের দৃষ্টি হয়তো অনেকখানি তিনি বজায় রাখতে পারেন। চক্ষুবিশেষজ্ঞরা আজ চোখের কোনো কোনো বিকল-হয়ে-যাওয়া অংশ অনায়াসে বা স্বল্পায়াসে মেরামত করে দিতে পারেন, এমন কি বদলেও দিতে পারেন। তাতে বয়স্ক মানুষেরা তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারেন।

আর, আপনি যদি বয়স্ক মানুষ না হন তাহলে হয়তো পরম গাম্ভীর্যে বলবেন, "হ্যাঁ, চোখে একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে, ডাক্তার দেখাতে হবে। কিন্তু সময় পাচ্ছি না।" কিন্তু সত্যিই কি আপনি সময় পাচ্ছেন না? অস্বীকার করতে পারেন, এর পিছনে আপনার অজ্ঞতা অবহেলা অলসতা কিছুই নেই? আপনার জানা দরকার, চোখের একটা সামান্য উপসর্গও চোখের মারাত্মক কোনো রোগের সূচনা হতে পারে এবং তার দরুন পরিশেষে আপনি চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যেতে পারেন।

আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য একথা বলছি না, বলছি আপনাকে সাবধান করে দেবার জন্য। আপনি বলতে পারেন, কোটি কোটি মানুষ সাবধান না হয়েই চোখ ভালো রাখতে পারছে। সত্যি কথা, অস্বীকার করব না—কিন্তু কীকরে অস্বীকার করব, লক্ষ লক্ষ মানুষ সাবধান না হবার দরুন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে? এবং আপনি যদি সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন হন?

আপনি যদি একবার চোখ চেয়ে পথ চলেন, আপনার চারপাশে নেহাৎ

কম অন্ধ দেখতে পাবেন না। সারা পৃথিবীতে অন্ধের সংখ্যা কত, সঠিক হিসাব দেওয়া শক্ত। আমাদের দেশে অন্ধের সংখ্যা কত তার সঠিক হিসাব দেওয়া আরও বেশি শক্ত। কারণ, পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় সব হিসাবই অনেকাংশে অনুমাননির্ভর এবং আমাদের দেশে আরও বেশি অনুমাননির্ভর।

১৯৯০ সালের জুলাই মাসে ওয়াশিংটনের একটা খবরে দেখা যায়, দি ইন্টারন্যাশন্যাল এজেন্সি ফর দি প্রিভেনশন অভ ব্লাইণ্ডনেস-এর হিসাবে সারা পৃথিবীতে অন্তত চার কোটি অন্ধ আছে এবং সমস্ত অন্ধত্বের শতকরা ৮০ ভাগই নিবারণ করা যায় অথবা চিকিৎসা করে সারানো যায়। এই সংস্থাটির হিসাবে, সারা পৃথিবীতে যত অন্ধ আছে তার শতকরা ৯০ ভাগ আছে উন্নতিশীল দেশগুলিতে এবং ২০১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সারা পৃথিবীতে অন্ধ লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকারের একটা রিপোর্টে দেখা যায়, সারা পৃথিবীতে এখন সম্পূর্ণ অন্ধের সংখ্যা তিন কোটি এবং ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই সংখ্যা চার কোটি হতে পারে। এই যে তিন কোটি সম্পূর্ণ অন্ধ তার দু কোটির বাস এশিয়ায়, ৬০ লক্ষের আফ্রিকায় এবং ২০ লক্ষের লাতিন অ্যামেরিকায়। অর্থাৎ, পৃথিবীর মোট অন্ধের ৯০ শতাংশ আছে এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন অ্যামেরিকায়। অতি-শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যেখানে অন্ধত্বের হার মোট জনসংখ্যার ০.১৫ শতাংশ থেকে ০.২৫ শতাংশের মধ্যে, উন্নতিশীল দেশগুলিতে সেখানে এই হার ১ শতাংশের উপর। অর্থাৎ, উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১ জন অন্ধ।

ভারত সরকারের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৮৬-৮৯ সালে ন্যাশন্যাল প্রোগ্রাম ফর দি কন্ট্রোল অভ ব্লাইণ্ডনেস এবং ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ্‌ অর্গ্যানাইজেশন একটা সমীক্ষা করেছিল, সেই সমীক্ষার হিসাবে দেখা যায়, ভারতে এক কোটি ২০ লক্ষ লোকের দু চোখই অন্ধ, এক চোখ অন্ধ ৮০ লক্ষ লোকের। তার মানে, পৃথিবীতে যত অন্ধ আছে তার চারভাগের একভাগ আছে ভারতে। এছাড়া ভারতে চার কোটি থেকে পাঁচ কোটি লোকের দৃষ্টি ক্ষীণ। ভারতের মোট জনসংখ্যা ৮০ কোটি ধরলে তার অন্ধত্বের হার দাঁড়ায় ১.৪৯ শতাংশ। ভারতে প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ১৫ জন অন্ধ।

অন্ধত্বের সমস্যা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে এই সমস্যা উন্নতিশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির মতো ভয়াবহ নয়। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যসচেতনতা ও উন্নত মানের স্বাস্থ্যব্যবস্থার কল্যাণে উন্নত দেশগুলিতে নিবারণযোগ্য অন্ধত্বের কারণ প্রায় সমস্তই নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে নিবারণযোগ্য ও নিরাময়যোগ্য কারণ এখনও

প্রায় ৮০ শতাংশ। অর্থাৎ, আমাদের দেশে শতকরা প্রায় ৮০ জনের অন্ধত্ব নিবারণ করা যায় অথবা উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে নিরাময় করা যায়।

অন্ধত্বের কারণ সবদেশে এক নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়। আমাদের দেশে ছানি, গ্লকোমা, সংক্রামক রোগ আর অপুষ্টিই অন্ধত্বের প্রধান কারণ। উন্নত দেশগুলিতে এইসব কারণ অনেকদিন আগেই দূর হয়ে গেছে। ঐসব দেশে এইসব কারণে এখন আর কেউ অন্ধ হয় না। উন্নত দেশগুলিতে এখন অন্ধত্বের প্রধান কারণ ডায়াবিটিজ ও হাই ব্লাড প্রেশারের জন্য রেটিনার রোগ, বিভিন্ন বংশগত রোগ, চোখে আঘাত এবং রেটিন্যাল ডিট্যাচমেন্ট।

পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশেই অন্ধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগেও আমাদের দেশে আজ বহু মানুষকে ছানি ও গ্লকোমার কারণে অন্ধ হয়ে থাকতে হয়। ছ মাস থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শতকরা চারজনের চোখ এমনসব কারণে অন্ধ হয়ে যায় যা অতি সহজেই নিবারণ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞান থাকলেই এই কারণগুলি অনায়াসে দূর করা যেতে পারে।

মাত্র কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে অন্ধত্বের একটা বড়ো কারণ ছিল গুটি বসন্তের আক্রমণে চেখে ঘা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নিরলস চেষ্টায় বসন্তের প্রতিষেধক টিকা প্রচলন করে এবং বসন্তরোগ সম্বন্ধে মানুষের কুসংস্কার দূর করে পৃথিবী থেকেই গুটি বসন্ত সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। ফলে, বসন্তের জন্য আজ আর কোথাও কেউ অন্ধ হয় না।

মানুষের ইতিহাসে অন্ধত্ব নতুন কিছু নয়। যতদিন পৃথিবীতে মানুষ এসেছে ততদিন অন্ধত্ব আছে। সেই আদিম কাল থেকেই অন্ধত্ব মানুষের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে এবং মানুষের ইতিহাসে সর্বকালে সর্বদেশে অন্ধত্বের সর্বপ্রধান কারণ ছানি। আজও সারা পৃথিবীতে ছানিতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ অন্ধ হয় এবং সারা পৃথিবীতে আজ চোখের যত অপারেশন হয়, ছানি অপারেশনই হয় সবচেয়ে বেশি। আমাদের চিকিৎসক-শিরোমণি সুশ্রুত ছানি অপসারণে অসামান্য সাফল্য লাভ করার পর অন্যান্য দেশেও ছানি অপসারণ শুরু হয়।

পৃথিবীতে আজ কত ছানি অপারেশন হয় বলা শক্ত। দি ইন্টারন্যাশন্যাল এজেন্সি ফর দি প্রিভেনশন অভ ব্লাইণ্ডনেস বলেছে, ভারতে খুব বেশি হলে বছরে ১২ লক্ষ ছানি অপারেশন করা হয়, কিন্তু বছরে প্রায় ২০ লক্ষ চোখে ছানি পড়ে। সুতরাং সমস্যা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। বছরে ৩০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ ছানি অপারেশন করতে পারলে সমস্যার অনেকটা সুরাহা হতে পারে।

ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যাম ফর দি কন্ট্রোল অভ ব্লাইণ্ডনেস এবং ওয়ার্ল্ড হেল্থ্ অগ্যানাইজেশনের রিপোর্টে দেখা যায়, ভারতে পাকা ছানি-পড়া চোখের সংখ্যা ৭৫ লক্ষ ৩০ হাজার আর আ-পাকা ছানির সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। ছানি পাকতে বছর তিনেক সময় লাগে, সুতরাং যত বছর ঘোরে তত পাকা ছানির সংখ্যা বাড়ে। ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যামে গত দশ বছরে ৮০ লক্ষের উপর ছানি কাটা হয়েছে। তাতে সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হয় নি। ২০০০ সালের মধ্যে বছরে যদি ২৫ লক্ষ ছানি কাটা যায় তাহলে সামান্য সুরাহা আশা করা যেতে পারে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে কর্নিয়ার অস্বচ্ছতার কারণে অন্ধের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। তাদের অধিকাংশেরই চোখে কর্নিয়া ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। তার জন্য মৃত মানুষের সুস্থ স্বচ্ছ কর্নিয়া দরকার। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এইরকম কর্নিয়া বিশেষ পাওয়া যায় না। ভাবপ্রবণতা ও ধর্মীয় কারণে মানুষ তার মৃত আত্মীয়ের চোখ দিতে চায় না।

অন্ধত্ব আজও আমাদের দেশে এক ভয়াবহ সমস্যা। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিচারে, সম্পূর্ণ-অন্ধ আর প্রায়-অন্ধের মধ্যে প্রভেদ খুবই অল্প। আমাদের দেশে আরও অল্প। তার প্রধান কারণ, উন্নত দেশে অন্ধরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য যেসব সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকে, আমাদের দেশে তা দুর্লভ। অন্ধ লোকদের মানসিক ও সামাজিক সমস্যার কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের দেশে অন্ধ মানেই পরনির্ভর।

অন্য অনেক সমস্যার মতো অন্ধত্বের এই ভয়াবহ সমস্যা সম্পর্কে আজও আমরা প্রায় উদাসীন। অন্ধত্বের কারণ সম্পর্কে আমাদের অপরিসীম অজ্ঞতা ও অন্ধত্ব নিবারণের জন্য আমাদের সচেতনতার অভাবের জন্য প্রতিদিন আমাদের দেশে অন্ধের সংখ্যা বাড়ছে।

১৯৮৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ভারতে অন্ধত্বের হার ভয়ঙ্করভাবে বাড়ছে। সারা দেশে প্রায় সারা বছর ধরে হাজার হাজার 'আই ক্যাম্প' করা সত্ত্বেও ভারতে অন্ধত্বের হার শতকরা ১.৪ থেকে বেড়ে ১.৪৯ হয়েছে।

অন্ধত্বের এই হার বৃদ্ধির কারণ যদি বলা হয় জনসাধারণের অজ্ঞতা, অসচেতনতা আর অবহেলা তাহলে সবটা বলা হয় না; অন্ধত্বের এই হার বৃদ্ধির জন্য আংশিকভাবে বিচারবিবেচনাহীন কিছু স্বার্থান্বেষী চিকিৎসকও দায়ী। বহু চিকিৎসক ও হাতুড়ে নির্বিচারে ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড ব্যবহার করেন, তার ফলে কর্নিয়ায় ফাঙ্গাস ইনফেকশন হয় এবং এখনও ফাঙ্গাস নিধনের ভালো ওষুধ না থাকায় ফাঙ্গাস ইনফেকশন দমন করা এত কঠিন হয়ে পড়ে যে, বেশির ভাগ রোগীই অন্ধ হয়ে যায়।

কর্নিয়ায় ভাইরাস ইনফেকশন অন্ধত্বের হার বৃদ্ধির আর-একটা বড়ো কারণ। সম্প্রতি হার্পিস সিমপ্লেক্সের দরুন কর্নিয়ায় ভাইরাস ইনফেকশন বড়ো বেশি দেখা যাচ্ছে। কর্নিয়ায় এই ভাইরাস ইনফেকশনের জন্য বহু লোক অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধত্বের হার বৃদ্ধির আরও একটা বড়ো কারণ ইনট্রা-অকিউলার লেন্স। ছানি অপারেশনের পর বহু উচ্চাভিলাষী চক্ষুচিকিৎসক নির্বিচারে চোখের মধ্যে ইনট্রা-অকিউলার লেন্স বসিয়ে দিচ্ছেন—তা সে বসাবার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তাঁদের থাক বা না থাক। অনেকসময় তার ফল হচ্ছে মারাত্মক—বহু চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

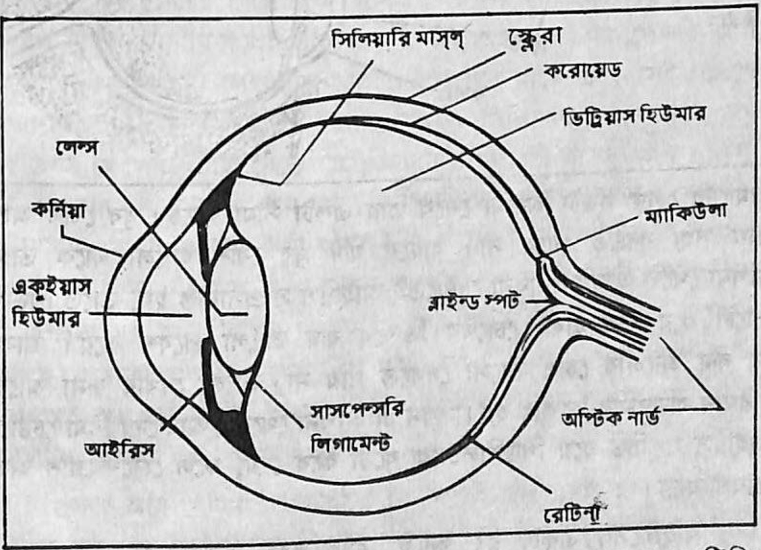
হুজুগে মেতে বহু জায়গায় হাতুড়েদের দিয়ে 'চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির' করা হচ্ছে। তারও ফল হচ্ছে সাঙ্ঘাতিক।

দি ইন্টারন্যাশন্যাল এজেন্সি ফর দি প্রিভেনশন অভ ব্লাইণ্ডনেস সারা পৃথিবীতে অন্ধত্বের প্রধান কারণ বলেছে পাঁচটি: ১. ক্যাট্যার‍্যাক্ট অর্থাৎ ছানি (এতে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে যায়); ২. ট্র্যাকোমা (এ এক ধরনের চোখের সংক্রামক রোগ, এই রোগ সাধারণত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার জন্য হয়); ৩. গ্লকোমা (এতে চোখ শক্ত হয়ে নার্ভ শুকিয়ে যায়); ৪. জেরফথ্যালমিয়া (ভিটামিন-এ'র অভাবে এই অসুখ হয়, এই অসুখে চোখের কর্নিয়া নষ্ট হয়ে যায়); ও ৫. অঙ্কোসারসিয়াসিস (একরকম কালো মাছির কামড়ে এই রোগ হয় এবং গোটা সাব-সাহারান আফ্রিকায় এই রোগ ব্যাপক আকারে দেখা যায়, এই রোগকে 'রিভার ব্লাইণ্ডনেস'-ও বলে)।

ভারতে ন্যাশন্যাল প্রোগ্র্যাম ফর দি কন্ট্রোল অভ ব্লাইণ্ডনেস এবং ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ্ অর্গ্যানাইজেশন যে সমীক্ষা চালিয়েছিল সেই সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে অন্ধত্বের প্রধান কারণ সাতটি: ১. ছানি (৮১ শতাংশ); ২. রিফ্র্যাকটিভ এরার অর্থাৎ মাইওপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া ও অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্ (৭ শতাংশ); ৩. কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা (৩ শতাংশ); ৪. গ্লকোমা (২ শতাংশ); ৫. ট্র্যাকোমা (০.২০ শতাংশ); ৬. ভিটামিন-এ'র অভাব (০.০৪ শতাংশ); ও ৭. অন্যান্য (৭ শতাংশ)।

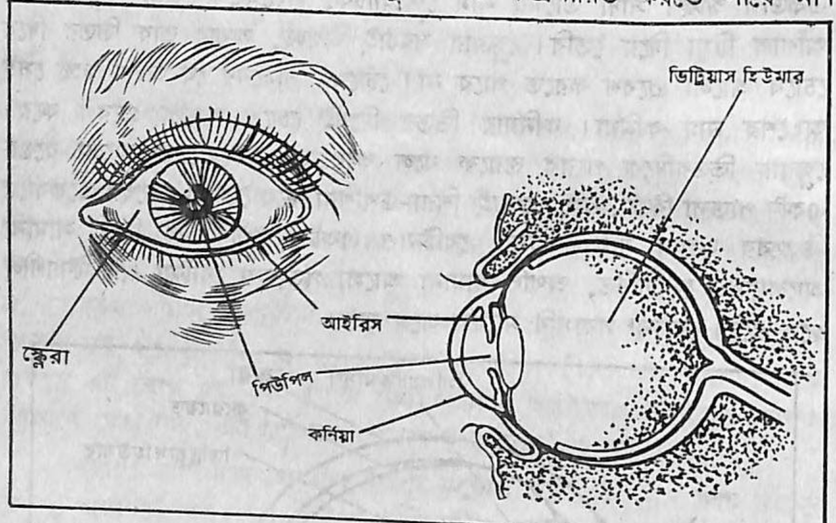
দুই : মানুষের চোখ

মানুষের চোখ প্রায় গোলাকার, কেবল সামনের দিকে খানিকটা অংশ যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। শক্ত হাড়ের কোটরের মধ্যে মাত্র ছটি পেশীর জটিল ক্রিয়ায় নানাদিকে অনেকখানি করে চোখ ঘোরানো যায়। চোখের একেবারে বাইরে যে স্তর সেই স্তরের ছভাগের পাঁচভাগের রং সাদা, বাকি একভাগ স্বচ্ছ। সাদা ভাগের নাম স্কেরোটিক, সংক্ষেপে স্ক্লেরা। স্ক্লেরা শক্ত আঁশাল টিস্যু দিয়ে তৈরি। স্ক্লেরার সবটাই অস্বচ্ছ, অর্থাৎ তার ভিতর দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করতে পারে না। চোখের সামনের যে অংশ স্বচ্ছ সেই অংশের নাম কর্নিয়া। কর্নিয়ার ভিতর দিয়েই চোখে আলো প্রবেশ করে। স্ক্লেরার ভিতরদিকে পরের স্তরকে বলে করোয়েড। করোয়েড কালো রঙের একটা পাতলা ঝিল্লী, বহু রক্তবাহী শিরা-উপশিরা দিয়ে তৈরি। চোখের একেবারে ভিতরের স্তরের নাম রেটিনা। রেটিনাও একটা ঝিল্লী। এই ঝিল্লী সামান্য আলোতেও সেন্সিটিভ, অর্থাৎ সামান্য আলো পড়লেও রেটিনা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। রেটিনা সরাসরি নার্ভের সঙ্গে যুক্ত।



কর্নিয়ার পিছনে সরু লম্বা একটা কক্ষ আছে, তাকে বলে অ্যান্টিরিয়র চেম্বার। এতে লবণের একটা পরিষ্কার সল্যুশন আছে। সেই সল্যুশনকে বলে

একুইয়াস হিউমার। সেই সল্যুশনের জন্যই চোখটা শক্তভাবে ফুলে থাকে। অ্যান্টিরিয়র চেম্বারের ঠিক পিছনে আছে আইরিস। আইরিসও ঝিল্লী। আইরিস আসলে একটা বৃত্তাকার পর্দা। তার মাঝখানে গোল ছিদ্র, ছিদ্রটা আলোর তারতম্য অনুসারে আপনা থেকেই বড়োছোটো হয়। আলো কম হলে ছিদ্রটা বড়ো হয় আর আলো বেশি হলে ছিদ্রটা ছোটো হয়। ছিদ্রটাকে বলে পিউপিল। আইরিসের পেশীই ছিদ্রটাকে অর্থাৎ পিউপিলকে ছোটোবড়ো করে। পিউপিল ছোটো হলে চোখে কম আলো প্রবেশ করে আর পিউপিল বড়ো হলে চোখে বেশি আলো প্রবেশ করে। আইরিস-পেশীর ক্রিয়া সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক, অর্থাৎ মানুষ তার ইচ্ছামতো আইরিস সঙ্কুচিত বা সম্প্রসারিত করতে পারে না।



আমাদের চোখ কতটা আলো নেবে তার একটা সীমা আছে। খুব বেশি আলো চোখ সহ্য করতে পারে না। বাইরে যদি খুব বেশি আলো থাকে তাহলে আপনা থেকে আমাদের বিনা চেষ্টাতেই আইরিস সম্প্রসারিত হয়, তাতে পিউপিল ছোটো হয়ে যায় এবং চোখের ভিতরে কম আলো প্রবেশ করে। আবার, খুব কম আলোয় চোখ ভালো দেখতে পায় না, ভালো দেখার জন্য আলোর পরিমাণ বাড়ানোর দরকার হয়। তখন ঐ আপনা থেকেই আমাদের বিনা চেষ্টাতেই আইরিস সঙ্কুচিত হয়ে পিউপিলটাকে বড়ো করে দেয়, ফলে চোখে বেশি আলো প্রবেশ করে।

আইরিসের একটা রং আছে, সেই রংই চোখের রং। নীল চোখ, কটা চোখ, কালো চোখ সবই নির্ভর করে আইরিসের নিজস্ব রঙের উপর। পিউপিলের কোন রং নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ পিউপিল একটা ছিদ্র।

তবু পিউপিলকে কালো দেখায়, কারণ পিউপিল দিয়ে চোখের মধ্যে যে আলো প্রবেশ করে তা সোজা রেটিনায় চলে যায় এবং রেটিনা প্রায় সমস্ত আলোই শোষণ করে নেয়। রেটিনায় শোষণের পর যদি কিছু আলো অবশিষ্ট থাকে তা রেটিনা ভেদ করে করোয়েডে চলে যায়। করোয়েড রেটিনার পিছনদিকে এবং তাতে একরকম কালো রঞ্জক পদার্থ থাকে। সেই কালো রঞ্জক পদার্থ রেটিনা-ভেদ-করে-আসা সমস্ত আলোই শোষণ করে নেয়। ফলে, রেটিনা-থেকে-আসা আলো আর প্রতিফলিত হয়ে রেটিনায় ফিরে যেতে পারে না। এইভাবে, চোখের মধ্যে যে আলো ঢোকে তার কিছুই আর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। বেরিয়ে এলে ঐ পিউপিল দিয়েই আসত এবং তা আসে না বলেই পিউপিল কালো দেখায়।

আইরিসের পিছনে আছে দুদিকে-উত্তল একটা স্বচ্ছ লেন্স। উত্তল মানে উন্নত অর্থাৎ স্ফীত। যে লেন্সের মাঝখানটা স্ফীত সেই লেন্সকে বলে উত্তল লেন্স, ইংরেজীতে কনভেক্স লেন্স। লেন্সের একদিকও স্ফীত হতে পারে, আবার দুদিকও স্ফীত হতে পারে। যে লেন্সের দুদিকই স্ফীত তাকে বলে বাই-কনভেক্স লেন্স। চোখের মধ্যে এই যে বাই-কনভেক্স লেন্স থাকে তাকে বলে কৃস্ট্যালিন লেন্স। কৃস্ট্যালিন মানে স্ফটিকতুল্য, অর্থাৎ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ও শক্ত। কিন্তু মানুষের চোখের লেন্স স্বচ্ছ হলেও শক্ত নয় মোটেই। এই লেন্স নমনীয় পদার্থে তৈরি। নমনীয় বলেই তার আকৃতি বদলাতে পারে। সাসপেন্সরি লিগামেন্ট নামে একরকম বন্ধনী লেন্সটাকে তার স্বস্থানে ধরে রাখে এবং সেই সাসপেন্সরি লিগামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে সিলিয়ারি মাস্‌ল্। সিলিয়ারি মাস্‌ল্ যখন সঙ্কুচিত হয় তখন লেন্সের স্ফীতি বেড়ে যায় ; আবার সিলিয়ারি মাস্‌ল্ যখন সম্প্রসারিত হয়, লেন্সের স্ফীতি তখন কমে যায়। সিলিয়ারি মাস্‌লের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণও অনৈচ্ছিক, অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করলেই সিলিয়ারি মাস্‌ল্ সঙ্কুচিত বা সম্প্রসারিত করতে পারি না। প্রয়োজন অনুসারে আপনা থেকে সিলিয়ারি মাস্‌ল্ সঙ্কুচিত বা সম্প্রসারিত হয়। বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন বস্তুর দিকে তাকাই। আমরা যখন যে দুরত্বে যে বস্তুর দিকে তাকাই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অজান্তেই লেন্সের স্ফীতি অর্থাৎ বক্রতা এমনভাবে বদলে যায় যে, ঐ বস্তুর ছবি ঠিক রেটিনাতেই গিয়ে পড়ে।

লেন্স আর রেটিনার মাঝখানে যে বিশাল স্থান সেই স্থান জেলির মতো বর্ণহীন এক স্বচ্ছ পদার্থে ভরা। সেই পদার্থকে বলে ভিট্রিয়াস হিউমার। ভিট্রিয়াস হিউমারের জন্যই চোখটা শক্ত রবারের মত মনে হয়।

এখন, কোনো বস্তু থেকে যখন আলো এসে চোখে পড়ে তখন সেই

আলোকরশ্মি প্রথমেই ধাক্কা খায় কর্নিয়ায়। স্বচ্ছ কর্নিয়ার ভিতর দিয়েই আলোকরশ্মি চোখের মধ্যে প্রবেশ করে। কর্নিয়াও অনেকটা লেন্সের মতো কাজ করে। আমাদের চোখের যে দৃষ্টিক্ষমতা, চলতি কথায় তাকে চোখের পাওয়ার বলে। চোখের মোট যে পাওয়ার তার তিনভাগের প্রায় দুভাগই এই কর্নিয়ার জন্য।

আলোকরশ্মি কর্নিয়ার ভিতর দিয়ে চোখের মধ্যে প্রবেশ করে একে একে একুইয়াস হিউমার, লেন্স আর ভিট্রিয়াস হিউমার ভেদ করে রেটিনার উপর গিয়ে পড়ে এবং সেখানে জ্যামিতির হিসাবে বস্তুটার একটা ছবি তৈরি করে। আসলে রেটিনায় একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়। আগেই বলেছি, রেটিনা খুব অল্প আলোতেও প্রতিক্রিয়াশীল। তাই রেটিনার উপর আলো এসে পড়তেই রেটিনায় একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার বার্তা বৈদ্যুতিক স্পন্দনের আকারে অপ্টিক নার্ভ দিয়ে চলে যায় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের পিছনদিকে ভিজ্যুয়াল কর্টেক্সে সেই বার্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়, তারপরই আমরা বস্তুটাকে দেখতে পাই। মস্তিষ্কই বস্তুটার প্যাটার্ন, রং, আকৃতি ইত্যাদি আমাদের বলে দেয়।

চোখের পিছনে রেটিনার মাঝামাঝি অংশে একটুখানি জায়গা সামান্য নিচু। এই নিচু জায়গাটাকে বলা হয় ইয়েলো স্পট অথবা ম্যাকিউলা। ম্যাকিউলার ব্যাস প্রায় ২ মিলিমিটার। তার কেন্দ্র প্রায় ০.২৫ মিলিমিটার ব্যাসের অতিক্ষুদ্র একটা স্থান, তাকে বলা হয় ফোভিয়া সেন্ট্রালিস। রেটিনার এই স্থানটাই সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। কোনো বস্তুর ছবি যখন ফোভিয়ার উপর পড়ে তখন সেই বস্তুকে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট দেখা যায়। স্পষ্ট দেখার জন্য তাই কোটরের মধ্যে চোখ সবসময় ঘোরে, যে ছটি পেশী কোটরের মধ্যে চোখ নিয়ন্ত্রণ করে সেই পেশীগুলি চোখটাকে অবিরাম ঘোরাতে থাকে যতক্ষণ-না ফোভিয়ার উপর ছবি এসে পড়ে।

অপ্টিক নার্ভ যে স্থানে চোখের মধ্যে প্রবেশ করে সেই স্থানে রেটিনা সবচেয়ে কম সংবেদনশীল। সেই স্থানে ছবি পড়লে তা দেখা যায় না। সেই স্থানকে বলে ব্লাইণ্ড স্পট।

দেখার ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস মনে রাখা দরকার, যেমন—অ্যাকোমোডেশন, অ্যাড্যাপ্টেশন, পারসিস্টেন্স অভ ভিশন এবং স্টেরিওস্কোপিক ভিশন।

আগেই বলা হয়েছে, সাসপেন্সরি লিগামেন্টের মাধ্যমে সিলিয়ারি মাস্‌ল্‌ই লেন্সের বক্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। সিলিয়ারি মাস্‌ল্‌ যখন সম্পূর্ণ শিথিল অবস্থায় থাকে তখন স্বাভাবিক চোখে অতিদূরের বস্তুরও ছবি ঠিক রেটিনার উপর

গিয়ে পরিষ্কারভাবে ফোকাস হয় এবং বস্তুটা স্পষ্ট দেখা যায়। কোনো চোখে সর্বাধিক যে দূরত্বের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় সেই দূরত্বের শেষবিন্দুকে বলা হয় সেই চোখের ফার পয়েন্ট। ফার পয়েন্ট থেকে কম দূরত্বের বস্তুর দিকে তাকালেও সেই বস্তুকে যে স্পষ্ট দেখা যায় তার কারণ তখন রেটিনার উপর ছবিটা ফোকাস করার জন্য সিলিয়ারি মাস্‌ল্ আপনা থেকেই প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্কুচিত হয়ে লেন্সের মাঝখানের বক্রতাটা বাড়িয়ে দেয়, অর্থাৎ লেন্স তখন মাঝখানে মোটা হয়ে যায়। ছবিটাকে রেটিনার উপর ফোকাস করার জন্য লেন্সের মাঝখানটা যতখানি বক্র হওয়ার দরকার, ঠিক ততখানিই বক্র হয়। এই যে বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুর ছবি রেটিনার উপর স্পষ্টভাবে ফোকাস করার জন্য লেন্সের বক্রতা প্রয়োজনমতো বদলায়, এই বদলানোর ক্ষমতাকেই বলে অ্যাকোমোডেশন। অ্যাকোমোডেশনের একটা সীমা আছে। চোখের খুব কাছে কোনো বস্তু আনলে সেই বস্তু আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের চেয়ে কম দূরত্বে কোনো বস্তু পরিষ্কার দেখা যায় না। চোখের এই যে ন্যূনতম দূরত্ব যে দূরত্ব আর কমালে স্পষ্ট দেখা যায় না সেই দূরত্বকে বলে লীস্ট ডিস্ট্যান্স অভ ডিস্টিংক্ট ভিশন। একটা স্বাভাবিক চোখে এই দূরত্ব প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার। অর্থাৎ, স্বাভাবিক চোখে ২৫ সেন্টিমিটারের চেয়ে কম দূরত্বে কোনো বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না। কোনো চোখে ন্যূনতম দূরত্বে যে বিন্দুতে কোনো বস্তুকে স্পষ্ট দেখা যায় সেই বিন্দুকে সেই চোখের নিয়ার পয়েন্ট বলে। স্বাভাবিক চোখে ডিস্টিংক্ট ভিশন অর্থাৎ স্পষ্ট দেখা যায় প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার থেকে অনন্ত দূরত্ব পর্যন্ত। এটাই স্বাভাবিক চোখের অ্যাকোমোডেশনের রেঞ্জ, মানে পাল্লা। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিলিয়ারি মাস্‌লের কর্মক্ষমতা কমে যেতে থাকে এবং লেন্সও তার নমনীয়তা হারাতে শুরু করে, ফলে নিয়ার পয়েন্ট দূরে সরে যেতে আরম্ভ করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই যে নিয়ার পয়েন্ট দূরে সরে যায় একে বলে প্রেসবাইওপিয়া।

আগে আরও বলা হয়েছে, পিউপিলের কাজ চোখের মধ্যে কী পরিমাণ আলো যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা। বাইরে যদি বেশি আলো থাকে তাহলে পিউপিল আপনা থেকে ছোটো হয়ে যায়, ফলে চোখের মধ্যে বেশি আলো যেতে পারে না। আবার, বাইরে যদি কম আলো থাকে তাহলে পিউপিল আপনা থেকে বড়ো হয়ে যায়, তাতে চোখের মধ্যে বেশি আলো প্রবেশ করে। এই যে পিউপিলের ছোটোবড়ো হওয়া একে বলে অ্যাড্যাপ্টেশন। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, হঠাৎ আলো বেড়ে গেলে কি কমে গেলে পিউপিল সঙ্গে সঙ্গে ছোটো বা বড়ো হতে পারে না। অর্থাৎ, অ্যাড্যাপ্টেশন সঙ্গে সঙ্গে হয়

না, কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে। সেই কারণে রাত্রে ঘরের মধ্যে জোরাল বিদ্যুতের আলো যদি হঠাৎ নিভিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিছুক্ষণ চোখে অন্ধকার দেখায়, তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার-ভাব কেটে গিয়ে অনেকটা আবছা হলেও ঘরের অনেক জিনিস দেখা যায়। এখানে হয় কী, ঘরে যখন জোরাল আলো জ্বলে, চোখের পিউপিল তখন ছোটো থাকে। হঠাৎ আলো নিভিয়ে দিলেও সাধারণত জানলা-দরজা দিয়ে ঘরে কিছু আলো আসে। কিন্তু পিউপিল ছোটো থাকায় সেই আলো বেশি পরিমাণে চোখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, রেটিনার উপর ছবি তৈরি করার জন্য যে পরিমাণ আলো দরকার সেই পরিমাণ আলো পাওয়া যায় না। ফলে, অন্ধকার দেখায়। তারপর আস্তে আস্তে পিউপিল বড়ো হয়, চোখে বেশি আলো প্রবেশ করে, চোখের অন্ধকার-ভাব কেটে যায়। কিছুক্ষণ পর পিউপিল যতখানি বড়ো হবার তা হয়ে গেলে ঘরের অনেককিছুই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ঠিক এইভাবেই, অন্ধকার থেকে হঠাৎ জোরাল আলোর মধ্যে গেলে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে চোখের পিউপিল ছোটো হয়ে গেলে তখন দৃষ্টি ঠিক হয়ে আসে।

চোখ যখন কোনো জিনিস দেখে, রেটিনার উপর সেই জিনিসটার একটা ছবি পড়ে বলেই দেখে। এখন, হঠাৎ যদি জিনিসটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, রেটিনার উপর তার ছবিটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় না। জিনিসটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেবার পরও কিছুক্ষণ রেটিনার উপর ছবিটা থাকে এবং কিছুক্ষণ জিনিসটা দেখা যায়। এই কিছুক্ষণ বলতে খুবই অল্প সময়—এক সেকেণ্ডের দশভাগের প্রায় একভাগ। এই যে জিনিসটা সরিয়ে নিলেও কিছুক্ষণ জিনিসটা দেখা যায় একে বলে পারসিস্টেন্স অভ ভিশন। এই পারসিস্টেন্স অভ ভিশনের জন্যই মাথার উপর জোরে ঘুরতে থাকা পাখা একটা চাকতির মতো দেখায়, মশাল হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি গোল করে ঘোরালে একটা রিঙের মতো মনে হয়। এই পারসিস্টেন্স অভ ভিশনের ব্যাপারটা কাজে লাগিয়েই সিনেমা তৈরি হয়। সিনেমায় একটা লোক যখন হাঁটে, একটা লম্বা ফিল্মে খুব তাড়াতাড়ি তার অনেকগুলি ছবি তোলা হয়—এক সেকেণ্ডে দশটারও বেশি ছবি। যে দ্রুতিতে ছবি তোলা হয়, পরে ঠিক সেই দ্রুতিতেই পর্দায় ছবি ফেলা হয়। একটা ছবি চলে যাবার পর এক সেকেণ্ডের দশভাগের প্রায় একভাগ সময় পর্যন্ত সেটা দেখা যায়, তার মধ্যেই আর-একটা ছবি আসে, সেই ছবিটাও চোখে এক সেকেণ্ডের দশভাগের প্রায় একভাগ সময় পর্যন্ত থাকে এবং তার মধ্যেই পরের ছবিটা এসে যায়। এইভাবে চলে

আর পারসিস্টেন্স অভ ভিশনের দরুন ছবিগুলি ছাড়া ছাড়া মনে হয় না, মনে হয় লোকটা হাঁটছে।

স্টেরিওস্কোপ হচ্ছে এমন এক যন্ত্র যার মধ্য দিয়ে দেখলে ঈষৎ ব্যবধানে রাখা একই রকম দুটি চিত্রকে এক ও ঘন বলে মনে হয়। ঘন বলতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনমাত্রাবিশিষ্ট, ইংরেজীতে বলে থ্রি ডাইমেনশনাল। আমরা যে ত্রিমাত্রিক বস্তু দেখি তার কারণ আমাদের দুটি চোখ। আমাদের যদি একটিমাত্র চোখ থাকত তাহলে আমরা সব জিনিসকেই অনেকটা ফ্ল্যাট অর্থাৎ চ্যাপ্টা দেখতাম। আমরা যদি একটি চোখ বন্ধ করে অন্য চোখ দিয়ে কোনো জিনিসের দিকে তাকাই তাহলে সেই জিনিসটা আমরা অনেকটা চ্যাপ্টা দেখতে পাব। আমাদের প্রত্যেক চোখেই একটি করে চিত্র সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ আমরা যখন কোনো বস্তুর দিকে তাকাই তখন আমাদের দুটি চোখে একই সঙ্গে সেই বস্তুর দুটি চিত্র ফুটে ওঠে এবং আমাদের মস্তিষ্কে একই সঙ্গে দু প্রস্থ ছবির বার্তা যায়। মস্তিষ্ক সেই দুটি ছবিকে একসঙ্গে মেশায় এবং আমরা একটি বস্তুই দেখতে পাই। আমাদের দুটি চোখ কিছুটা ব্যবধানে থাকায় দু চোখে একই বস্তুর ছবি একই রকম দেখায় না, দু চোখে একই বস্তুর দু রকম ভিউ আসে। দু চোখের দু রকম ভিউতে পার্থক্য খুবই সামান্য। কিন্তু মস্তিষ্ক সেই পার্থক্য ধরতে পারে। মস্তিষ্ক দুটি ভিউকে এমনভাবে মেশায় যে, আমরা বস্তুটির ত্রিমাত্রিক চিত্র দেখতে পাই। অর্থাৎ, বস্তুটি আমাদের চোখে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নিয়ে ধরা দেয়। একেই বলে স্টেরিওস্কোপিক ভিশন।

তিন : রিফ্র্যাকটিভ এরার ও চশমা

কোনো জিনিস দেখতে হলে রেটিনার উপর সেই জিনিসটার একটা ছবি তৈরি হওয়া দরকার। রেটিনার উপর যদি ছবি তৈরি না হয় তাহলে রেটিনায় কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে না এবং অপ্টিক নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কে কোনো বার্তা পৌঁছতে পারে না, ফলে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই না। ছবিটা যদি রেটিনার সামান্য আগেপিছে তৈরি হয় তাহলে রেটিনায় সামান্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং জিনিসটাকে আমরা অস্পষ্ট অর্থাৎ ঝাপসা দেখতে পাই।

এখন, নানা কারণে রেটিনার উপর ছবি তৈরি না হয়ে রেটিনার কিছু আগে বা কিছু পিছে ছবি তৈরি হতে পারে। যে কারণগুলি খুবই সাধারণ সেই কারণগুলি হল—প্রেসবাইওপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া, মাইওপিয়া এবং অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্‌। এর প্রত্যেকটাকে বলে রিফ্র্যাকটিভ এরার। বাংলায় বলা যেতে পারে, প্রতিসরণজনিত ত্রুটি। এই ধরনের সব ত্রুটিই চশমায় দূর করা যায়।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, বাজারে বেশকিছু 'শস্তা' বই কিনতে পাওয়া যায়—ইংরেজীতেই পাওয়া যায় বেশি ; সেইসব বইতে চশমার অপযশ গাওয়া হয়েছে এবং প্রেসবাইওপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া, মাইওপিয়া ও অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে এমনসব কথা বলা হয়েছে যার পিছনে বিজ্ঞানের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। সেইসব বইতে চশমার প্রয়োজন নস্যাৎ করে দিয়ে কিছু ওষুধ, কিছু ব্যায়াম, কিছু কসরৎ ইত্যাদির সাহায্যে অসুখ সারাবার কথা বলা হয়েছে। অসুখ সারাতে মানসিক চাপ কমানো ছাড়া মনের মধ্যে কিছু কল্পনা করার কথাও বলা হয়েছে, খাদ্যাখাদ্যও নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় নি কিছু। সুতরাং এই ধরনের বইয়ের উপদেশ-নির্দেশ মানার আগে একটু চিন্তা করা দরকার। মনে রাখা দরকার, প্রেসবাইওপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া, মাইওপিয়া ও অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্‌ সারাবার কোনো উপায় বিজ্ঞান এখনও বার করতে পারে নি।

প্রেসবাইওপিয়ার কথা আগে অ্যাকোমোডেশন নিয়ে আলোচনার সময় বলা হয়েছে। প্রেসবাইওপিয়াকে ফারসাইটেডনেসও বলে। ফারসাইটেডনেস হল

বার্ধক্যজনিত দূরবদ্ধ দৃষ্টি। বাংলায় চালশে নামটাই বেশি প্রচলিত। চল্লিশ থেকে চালশে। সাধারণত চল্লিশ বছর বয়সের পরেই এই অসুখ হয়।

আমাদের চোখের লেন্স জেলির মতো একরকম নরম ও নমনীয় পদার্থে তৈরি। বয়স যত বাড়ে এই জেলি তত শক্ত হয়। বয়স চল্লিশে পৌঁছলে লেন্স তার নমনীয়তা হারাতে শুরু করে। তখন লেন্স আগের মতো আর তার আকৃতি বদলাতে পারে না।

লেন্সকে সাসপেন্সরি লিগামেন্টের মাধ্যমে ধরে রাখে যে সিলিয়ারি মাস্ল্, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সিলিয়ারি মাস্লের কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। তখন সিলিয়ারি মাস্ল্ প্রয়োজনমতো সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে না। ফলে, লেন্সের আকৃতিও বদলাতে পারে না।

এই যে লেন্স শক্ত হয়ে যাওয়ার দরুন ও সিলিয়ারি মাস্লের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার দরুন লেন্সের আকৃতি বদলাতে পারে না, অর্থাৎ ঠিকমতো অ্যাকোমোডেশন হতে পারে না, এর ফলে নিয়ার পয়েন্ট দূরে সরে যায়। নিয়ার পয়েন্ট দূরে সরে যাওয়া মানে লীস্ট ডিস্ট্যান্স অভ ডিস্টিংক্ট ভিশন বেড়ে যাওয়া। তখন কাছের জিনিসের ছবি রেটিনার উপর না পড়ে রেটিনার পিছনে পড়ে। ফলে, কাছের জিনিস ঝাপসা দেখায়, লেখাপড়া করতে অসুবিধা হয়। তখন কাছের জিনিস পরিষ্কার দেখার একমাত্র উপায় কনভেক্স লেন্সের চশমা নেওয়া। কনভেক্স লেন্স মানে উত্তল লেন্স। এই লেন্স অর্ধবৃত্তাকার, মাঝখানটা উন্নত।

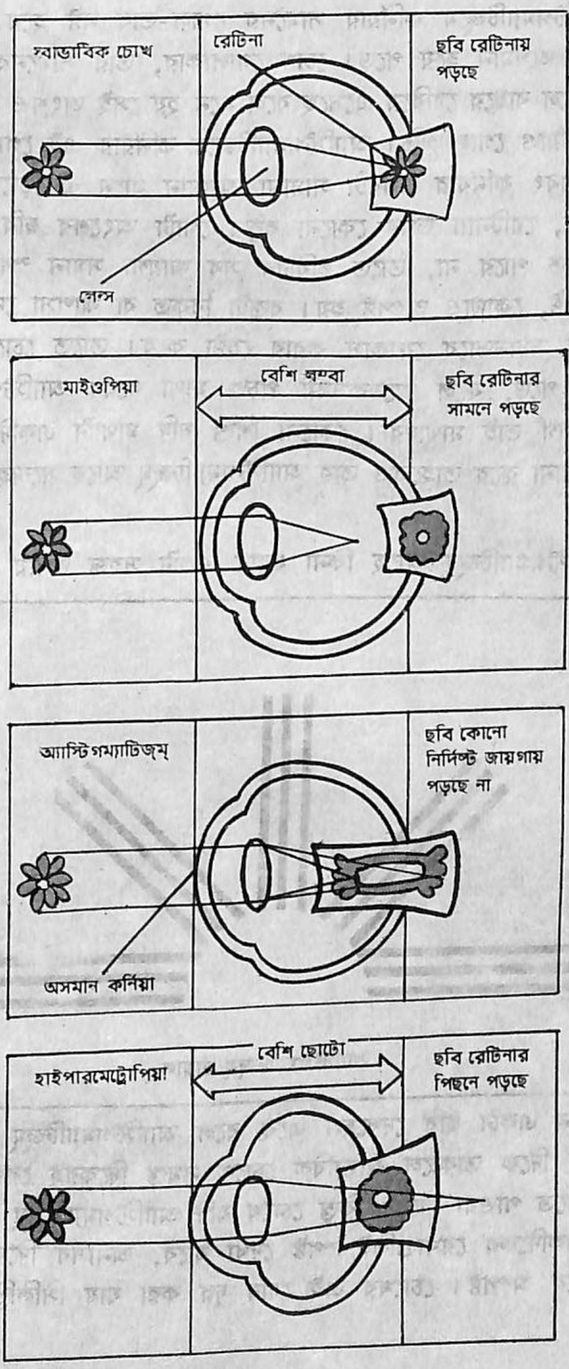
কনভেক্স লেন্সের চশমায় কাছের জিনিস পরিষ্কার দেখা গেলেও দূরের জিনিস দেখার ব্যাপারে ব্যাঘাত ঘটে। তখন দূরের জিনিস ঝাপসা দেখায়। চশমা খুলে ফেললে খালি চোখে দূরের জিনিস আবার পরিষ্কার দেখা যায়। কাছের জিনিস দেখতে চশমা পরা আর দূরের জিনিস দেখতে চশমা খোলা, বার বার এমন করা একটা ঝামেলার ব্যাপার। এই ঝামেলা এড়াতে বাই-ফোকাল চশমা ব্যবহার করা হয়। বাই-ফোকাল চশমার উপরের দিক থেকে দূরের জিনিস দেখে আর নিচের দিক থেকে কাছের জিনিস দেখে।

তবু মুশকিল একেবারে আসান হয় না। কারণ, বয়স তো বেড়েই চলে আর সেই অনুসারে অ্যাকোমোডেশনও কমতে থাকে। তাই ঘন ঘন চশমা পালটাবার প্রয়োজন হয়। চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় দু বছর অন্তর চশমা পালটাতে হয়। ষাট বছরের পর অ্যাকোমোডেশন মোটামুটি 'সেট' হয়ে যায়। তখন আর বিশেষ চশমা পালটাবার দরকার করে না।

হাইপারমেট্রোপিয়াকে লংসাইটেডনেসও বলে। এ-ও একরকম দূরবদ্ধ দৃষ্টি। এই অসুখেও কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু দূরের জিনিস মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যায়। তবে বেশি হাইপারমেট্রোপিয়া হলে দূরের জিনিসও ঝাপসা দেখায়। এই অসুখ বার্ধক্যজনিত নয়, অল্প বয়সেও এই অসুখ হতে পারে। চোখের কর্নিয়া যদি অস্বাভাবিক রকম ফ্ল্যাট থাকে কিংবা চোখ যদি জন্মগত কারণে বেশি রকম ছোটো হয় তাহলে কাছের জিনিসের ছবি রেটিনায় না পড়ে রেটিনার কিছুটা পিছনে পড়ে, ফলে জিনিসটা ঝাপসা দেখায়। এইরকম ক্ষেত্রেও চোখের নিয়ার পয়েন্ট চোখ থেকে দূরে সরে যায় এবং এর একমাত্র প্রতিকার প্রেসবাইওপিয়ার মতো কনভেক্স লেন্সের চশমা নেওয়া। সেই চশমা শুধু কাছের জিনিস দেখার সময় নয়, সবসময়েই পরতে হয়।

মাইওপিয়ার আর-এক নাম শর্টসাইটেডনেস। শর্টসাইটেডনেস মানে অদূরবদ্ধ দৃষ্টি। এই অসুখে অদূর অর্থাৎ কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়, দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়। এই অসুখে দূরের জিনিস ঝাপসা দেখায়। সাধারণত অল্প বয়সেই এই অসুখের সূত্রপাত হয়। এই অসুখে চোখ অস্বাভাবিক রকম লম্বা থাকে। ফলে, দূরের জিনিসের ছবি ঠিক রেটিনার উপর না পড়ে কিছুটা সামনে পড়ে। তাতে জিনিসটা ঝাপসা দেখায়। হাইপারমেট্রোপিয়ার ঠিক উলটো মাইওপিয়া। হাইপারমেট্রোপিয়ায় ছবিটা পড়ে রেটিনার পিছনে আর মাইওপিয়ায় রেটিনার সামনে। কিন্তু স্পষ্ট দেখার জন্য ছবিটা ঠিক রেটিনার উপরেই পড়া চাই, সামনে-পিছনে পড়লে ঝাপসা দেখাবে। মাইওপিয়ায় সামনে পড়ে, তাই ঝাপসা দেখায়। মাইওপিয়ায় চোখের নিয়ার পয়েন্ট ঠিক জায়গাতেই থাকে, কেবল ফার পয়েন্টটা চোখের দিকে এগিয়ে আসে। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য দরকার কনকেভ লেন্সের চশমা। কনকেভকে বাংলায় বলে অবতল। ধনুকের মতো ভিতরদিকে বক্রতা থাকলে অবতল বলে। কনভেক্সের ঠিক উলটো কনকেভ। কনভেক্সের মাঝখানটা মোটা, কনকেভের মাঝখানটা সরু।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চশমার পাওয়ার বাড়া ছাড়াও মাইওপিয়ার প্রধান সমস্যা, এই অসুখে রেটিনা প্রায় অবধারিতভাবে নষ্ট হয়। রেটিনায় ডিজেনারেশন বা ব্রেক মাইওপিয়ার অবশ্য সঙ্গী। রেটিনার ডিট্যাচমেন্টের সম্ভাবনাও তাই মাইওপিয়ার চোখে অনেক বেশি। যেসব ছেলেমেয়ের মাইওপিয়া আছে তাদের নিয়মিত রেটিনা পরীক্ষা করানো দরকার। মাইওপিয়ার রোগীদের দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলো ইত্যাদি সাবধানে করতে হয়। সামান্য আঘাতেই তাদের রেটিনা ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। মাইওপিয়া আবার বংশগত রোগও। বাবা-মায়ের মাইওপিয়া থাকলে সন্তানসন্ততিদের মাইওপিয়া হবেই।


স্বাভাবিক চোখ
রেটিনা
ছবি রেটিনায় পড়ছে
লেন্স
মাইওপিয়া
বেশি লম্বা
ছবি রেটিনার সামনে পড়ছে
অ্যাস্টিগম্যাটিজম্
ছবি কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ছে না
অসমান কর্নিয়া
হাইপারমেট্রোপিয়া
বেশি ছোটো
ছবি রেটিনার পিছনে পড়ছে

অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌মে কর্নিয়ার সামনের গোল-ভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং তার বক্রতা অসমান হয়ে পড়ে। চোখ গোলাকার, তার সামনের যে অংশ খানিকটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হয় সেই অংশও গোলাকৃতি। অর্থাৎ, কর্নিয়াও গোলাকৃতি। অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌মে কর্নিয়ার এই গোলাকৃতি নষ্ট হয়ে যায় এবং কর্নিয়ার উপরটা সামান্য অসমান মানে এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়ে। ফলে, রেটিনার উপর কোনো বস্তুর গোটা অংশের ছবি সমানভাবে ফোকাস হতে পারে না, তাতে ছবিটার সব জায়গা সমান স্পষ্ট হয় না। কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট হয়। বস্তুটা বিকৃত বা ঝাপসা দেখায়। চোখ কিন্তু ছবিটা সমানভাবে ফোকাস করার চেষ্টা করে। তাতে চোখের পেশীর উপর চাপ পড়ে, ফলে অনেকসময় প্রচণ্ড মাথা ধরে। অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌মের একটা উপসর্গ তাই মাথাধরা। কোনো শিশু যদি মাথাটা একদিকে হেলিয়ে বসে পড়াশোনা করে তাহলেও তার অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্ আছে সন্দেহ করা যেতে পারে।

অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্ আছে কিনা ধরার একটা সহজ উপায় আছে। এই



অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্ ডায়াল

যে এখানে একটা ছবি দেখছেন একে বলে অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্ ডায়াল। এই ডায়ালটার দিকে তাকালে স্বাভাবিক চোখে সমস্ত দিকেরই রেখাগুলি সমান স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু চোখে যদি অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্ থাকে তাহলে কেবল একদিকের রেখাগুলিই স্পষ্ট দেখা যাবে, অন্যসব দিকের রেখাগুলি দেখা যাবে অস্পষ্ট। চোখের এই দোষ দূর করা যায় সিলিন্ড্রিক্যাল অর্থাৎ

বেলনাকৃতি লেন্সের চশমা দিয়ে। অ্যাস্টিগম্যাটিজম্ সাধারণত একা আসে না, সঙ্গে হাইপারমেট্রোপিয়া এবং মাইওপিয়াও থাকে। সুতরাং এইরকম ক্ষেত্রে চশমায় একই কাঁচে দুরকম লেন্স দিতে হয়—একদিকে সিলিন্ড্রিক্যাল, আর-একদিকে স্ফেরিক্যাল। এই ধরনের লেন্সকে বলে স্ফেরো-সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স।

প্রেসবাইওপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া, মাইওপিয়া আর অ্যাস্টিগম্যাটিজমে চশমা ছাড়া উপায় নেই। বড়োদেরও না, ছোটোদেরও না।

কিন্তু অনেক বাবা-মা ছোটো ছেলেমেয়েদের চশমা পরা পছন্দ করেন না। ডাক্তার বললেও অনেকসময় তাঁরা ছোটো ছেলেমেয়েদের চশমা দিতে চান না। তাঁদের মনে রাখা দরকার, যদি চশমা দিয়ে দৃষ্টি ঠিক করা যায় তাহলে অবিলম্বে চশমা দেওয়া উচিত। নইলে পরে চশমা দিয়েও পূর্ণদৃষ্টি ফিরে পাওয়া যাবে না। অনেকক্ষেত্রে কমদৃষ্টির চোখ অলস হয়ে পড়ে, তারপর টেরা হয়ে যায়। এই ধরনের চোখ চিরকালের মতো অকেজো হয়ে থাকে।

চার : কনট্যাক্ট লেন্স

আজ থেকে সাড়ে চার শ বছরেরও বেশি আগে 'রেনেসাঁসের যুগে' লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রথম মানুষের চোখে এমন এক লেন্স বসাবার কথা ভেবেছিলেন যে লেন্স খারাপ চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু তিনি তাঁর ভাবনা কার্যে পরিণত করে যেতে পারেন নি। তিনি ইহজগৎ থেকে চলে যাবার বহু বছর পরে উনিশ শতকের গোড়ায় কনট্যাক্ট লেন্সের চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করে এবং ১৮২৭ সালে সার্ জন হার্শেল নামে একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী রোগসংক্রমণ থেকে চোখ রক্ষা করার জন্য চোখের উপর কাঁচের ছোট্ট একটা চাকতি বসাবার কথা বলেন।

এর ষাট বছর পরে দুজন বিজ্ঞানী হার্শেলের চিন্তা অনুযায়ী কাঁচ দিয়ে এমন এক লেন্স তৈরি করেন যা গোটা চোখটাকে ঢেকে দিতে পারে। সে-ই প্রথম কনট্যাক্ট লেন্স তৈরি হয়। কিন্তু সে লেন্স ছিল শক্ত লেন্স, সেই লেন্স পরলে চোখে বেশ অস্বস্তি হত, একনাগাড়ে অল্প কয়েকঘন্টার বেশি চোখে পরা যেত না।

এরপর বহু বছর ধরে কনট্যাক্ট লেন্সের ডিজাইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে, কনট্যাক্ট লেন্স তৈরিও হয়েছে বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে। শেষে এই শতকের তিরিশের দশকের শেষদিকে প্রথম প্লাস্টিক লেন্স তৈরি হয়। কিন্তু গোড়ার দিকের সেই প্লাস্টিক লেন্সও গোটা চোখ ঢেকে রাখত এবং বেশিক্ষণ সেই লেন্স চোখে পরা যেত না।

তারপর ১৯৪৭ সালে যখন কর্নিয়াল লেন্স তৈরি হল তখন কনট্যাক্ট লেন্সের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হল। কর্নিয়াল লেন্স আকারে যেমন ছোটো, ওজনেও তেমনি হালকা। পাতলা প্লাস্টিকের পাতে তৈরি এই লেন্স কেবল কর্নিয়াটাকেই ঢেকে রাখে, তাই তার নাম কর্নিয়াল লেন্স। এই লেন্স গোড়ার দিকেও একনাগাড়ে বেশ কয়েকঘন্টা চোখে পরা যেত, তাতে চোখে অস্বস্তি হত না।

১৯৬০-এর দশকে নতুন এক প্লাস্টিক পদার্থ উদ্ভাবন করা হল। সেই পদার্থ অনেক বেশি নমনীয়। সেই পদার্থ দিয়ে তৈরি হল নরম লেন্স। হার্ড লেন্সের সঙ্গে যুক্ত হল সফ্ট্ লেন্স। কনট্যাক্ট লেন্সের ক্ষেত্র বিস্তৃত হল।

সারা পৃথিবীতেই আজ কনট্যাক্ট লেন্সের কদর। চশমার বদলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ কনট্যাক্ট লেন্স পরছে। যত দিন যাচ্ছে, কনট্যাক্ট লেন্সের তত উন্নতি হচ্ছে—সেইসঙ্গে কনট্যাক্ট লেন্সের ব্যবহারও বাড়ছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, কনট্যাক্ট লেন্সের ব্যবহার যত-না প্রয়োজনের তাগিদে বাড়ছে তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়ছে সৌন্দর্যরক্ষার খাতিরে। কনট্যাক্ট লেন্সের ব্যবহার অনেকটাই কসমেটিক। যেসব বিত্তশালী মানুষ মনে করেন, চশমায় তাঁদের সৌন্দর্যহানি হয় তাঁরা অনেকে কনট্যাক্ট লেন্সের আশ্রয় নিতে চান।



কিন্তু কনট্যাক্ট লেন্সের সুবিধাও আছে অনেক। কনট্যাক্ট লেন্সে চশমার মতো ফ্রেম থাকে না বলে পাশের দিকে দেখতে অসুবিধা হয় না ; চশমার ফ্রেম অনেকসময় নাকের উপর নেমে যায়, কনট্যাক্ট লেন্সে সে অসুবিধা নেই ; গরমে অতিরিক্ত ঘামে কিংবা বাতাসের জলীয় বাষ্পে চশমার কাঁচ প্রায়ই ঝাপসা হয়ে যায়, কনট্যাক্ট লেন্স চোখের মধ্যে থাকায় তা হতে পারে না ; খেলাধুলায় চশমা অনেকসময় একটা বড়ো বাধা, কনট্যাক্ট লেন্স সেই বাধা থেকে মুক্ত ; মাইক্রোস্কোপ, ক্যামেরা প্রভৃতি যন্ত্রে কাজ করতেও চশমা বাধা সৃষ্টি করে, কনট্যাক্ট লেন্সে সেই বাধা দূর হয় ; চশমা পরে ভিড়ের মধ্যে চলাফেরা করতে হলে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়, কনট্যাক্ট লেন্সে সেই সতর্কতার দরকার হয় না। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে চশমার চেয়ে কনট্যাক্ট লেন্সে বেশি স্পষ্ট দেখা যায় এবং চশমায় যে দৃষ্টিবিকৃতি দূর করা যায় না, কনট্যাক্ট লেন্সে তা অনেকখানি দূর করা যায়। কোনো কোনো চোখের অসুখে চশমায় ভালো দেখা যায় না, কিন্তু কনট্যাক্ট লেন্সে ভালো দেখা যায়।

কনট্যাক্ট লেন্সে যেমন অনেক বেশি পরিষ্কার দেখা যায় তেমনি কতকগুলি

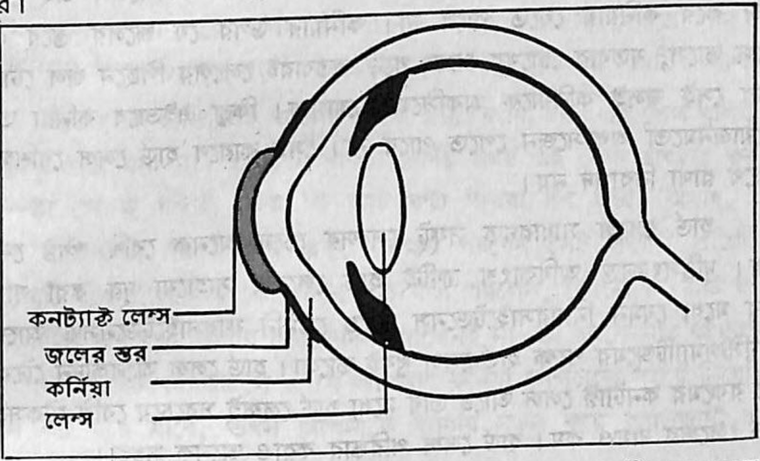
চোখের অসুখের চিকিৎসায় কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করা হয়। এইরকম একটা অসুখ কেরাটোকোনাস। এই অসুখে কর্নিয়ার উপরটা অসমাঙ্গ হয়ে যায়, অর্থাৎ তার সমানভাব নষ্ট হয়ে গিয়ে এবড়োখেবড়ো হয়ে যায়। তাতে প্রায়ই দৃষ্টিহানি ঘটে এবং সাধারণ চশমায় আগের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। এই ধরনের চোখে কনট্যাক্ট লেন্স দিলে অনেক বেশি পরিষ্কার দেখা যায়। কর্নিয়ার অন্য কয়েকটি অসুখেও বিশেষভাবে তৈরি কনট্যাক্ট লেন্স দিলে উপকার পাওয়া যায়। কনট্যাক্ট লেন্সের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার ক্যাট্যার‍্যাক্ট অপারেশনের পর। ছানি কাটার পর সাধারণত যে চশমা দেওয়া হয় তা অনেক মোটা এবং তা চোখে সইয়ে নিতে বেশ অসুবিধা হয়। কনট্যাক্ট লেন্স এক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত।

তবে ইচ্ছা করলেই কনট্যাক্ট লেন্স নেওয়া যায় না। সবার চোখে কনট্যাক্ট লেন্স সয় না। যাঁদের চোখে প্রায়ই ইনফেকশন কিংবা অ্যালার্জি হয় তাঁরা কনট্যাক্ট লেন্স পরতে পারেন না। যদি পরেন তাহলে চোখের সাঙ্ঘাতিকরকম ক্ষতি হতে পারে। আবার, যাঁদের চোখে জল কম কিংবা যাঁদের চোখের জলে মিউকাস অর্থাৎ শ্লেষ্মার ভাগ বেশি তাঁদের পক্ষে কনট্যাক্ট লেন্স সহ্য করা এবং লেন্স পরিষ্কার রাখা খুবই কঠিন। যাঁরা ধুলোবালির মধ্যে কাজ করেন অথবা যাঁদের চশমায় প্রিজ্‌ম্ কারেকশন দরকার তাঁরাও কনট্যাক্ট লেন্স পরতে পারেন না।

তবু বলা যায়, বেশির ভাগ লোকের চোখেই কনট্যাক্ট লেন্স বসানো যায়। কিন্তু চোখে কনট্যাক্ট লেন্স বসালেই হয় না, তার ঝক্কি-ঝামেলাও পোহাতে হয়। কনট্যাক্ট লেন্সে অনেক ধকল। আপনার যদি ধৈর্য থাকে, আপনি যদি চোখে কনট্যাক্ট লেন্স সইয়ে নেবার জন্য এবং প্রতিবার ব্যবহারের পর কনট্যাক্ট লেন্স পরিষ্কার করার জন্য সময় ও শ্রম দিতে রাজী থাকেন তাহলে আপনি কনট্যাক্ট লেন্স নিতে পারেন। প্রতিবার ব্যবহারের পর কনট্যাক্ট লেন্স যত্নসহকারে পরিষ্কার করতে হয় এবং সবসময়েই এই লেন্স হারিয়ে যাবার বা নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকে। তাছাড়া 'ফলো-আপ ভিজিট' হিসাবে মাঝে মাঝেই ডাক্তারের কাছে বা লেন্সের দোকানে যাবার দরকার হয়।

কনট্যাক্ট লেন্স কিন্তু সরাসরি কর্নিয়ার উপর এঁটে থাকে না, কর্নিয়ার উপর জলের যে একটা পাতলা স্তর থাকে সেই স্তরেই লেগে থাকে কনট্যাক্ট লেন্স। ফিজিক্সে সারফেস টেনশন বলে একটা কথা আছে, বাংলায় বলে পৃষ্ঠ-টান। চোখে যখন কনট্যাক্ট লেন্স পরা হয় তখন তা কর্নিয়ার উপর পাতলা

জলের স্তরে ভাসে আর ঐ পাতলা জলের স্তরের পৃষ্ঠ-টানে লেন্সটা তার জায়গায় আটকে থাকে। কর্নিয়া আর লেন্সের মাঝখানে থাকে জলের পাতলা স্তর।



কর্নিয়া যাতে সুস্থ থাকে তার জন্য সবসময় তার অকসিজেন দরকার। বাতাস আর চোখের ভিতরকার জল থেকে কর্নিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সেই অকসিজেন পায়। কিন্তু চোখে কনট্যাক্ট লেন্স থাকলে বাইরের বাতাস আর চোখের কর্নিয়ার মাঝখানে একটা প্রাচীর সৃষ্টি হয়, কর্নিয়া সরাসরি বাতাস থেকে অকসিজেন পায় না। এই সমস্যার খানিকটা সুরাহা হয় অবিরাম আমাদের চোখের পাতা পড়ায়। যতবার চোখের পাতা পড়ে ততবারই লেন্স ঢাকা পড়ে এবং লেন্সটা সামান্য নড়ে ওঠে। তখন একটুখানি জল লেন্সের পিছনে চলে যায়। সেই জল যেমন লুব্রিক্যান্টের কাজ করে তেমনি কর্নিয়াকে অকসিজেন যোগায়। এইভাবে মানুষ যতক্ষণ জেগে থাকে, কনট্যাক্ট লেন্সের বাধা সত্ত্বেও তার কর্নিয়ার লুব্রিকেশন আর অকসিজেনের অভাব হয় না।

সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য এখন চার রকমের কনট্যাক্ট লেন্স পাওয়া যায়—হার্ড, সফ্‌ট্‌, গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ ও এক্সটেন্ডেড ওয়্যার। প্রত্যেকটারই নিজস্ব কিছু সুবিধা-অসুবিধা আছে এবং এক-এক কারণে এক-এক লেন্সের ব্যবহার। সুতরাং কোন্ লেন্স ভালো বলা যায় না। কার পক্ষে কোন্ লেন্স উপযুক্ত তা ঠিক করা হয় চোখ পরীক্ষা করার পর। আপনার লাইফ-স্টাইল কেমন এবং আপনি কী ধরনের কাজ করেন তার উপরও অনেকখানি নির্ভর করে কোন্ ধরনের লেন্স আপনার পক্ষে উপযুক্ত। এককথায় বলা চলে, যাঁর পক্ষে যে লেন্স উপযুক্ত তাঁর পক্ষে সেই লেন্সই ভাল।

হার্ড লেন্স

হার্ড লেন্স তৈরি হয় শক্ত প্লাস্টিক দিয়ে। এই লেন্স আকারে ছোটো। কর্নিয়ার সবটা এই লেন্সে ঢাকা পড়ে না। বাইরের অকসিজেন এই লেন্স ভেদ করে কর্নিয়ায় যেতে পারে না। কর্নিয়ার উপর যে জলের স্তরে এই লেন্স ভাসে, যতবার চোখের পাতা পড়ে ততবারই লেন্সের পিছনে জল ঢোকে আর সেই জলই কর্নিয়াকে অকসিজেন যোগায়। কিন্তু এইভাবে কর্নিয়া তার প্রয়োজনমতো অকসিজেন পেতে পারে না। সেই কারণে হার্ড লেন্স বেশিক্ষণ চোখে রাখা নিরাপদ নয়।

হার্ড লেন্সে সাধারণত সফ্‌ট্ লেন্সের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট দেখা যায়। দৃষ্টিসংক্রান্ত অধিকাংশ ত্রুটিই হার্ড লেন্সের সাহায্যে দূর করা যায়। তার মধ্যে যেমন নিয়ারসাইটেডনেস আছে তেমনি ফারসাইটেডনেসও আছে। অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌মের পক্ষে হার্ড লেন্স খুবই ভালো। হার্ড লেন্স অনেকদিন টেকে। যত রকমের কনট্যাক্ট লেন্স আছে তার মধ্যে হার্ড লেন্সই সবচেয়ে বেশি টেকসই। হার্ড লেন্সের দামও কম। হার্ড লেন্স পরিষ্কার করাও অনেক সহজ।

হার্ড লেন্সের অসুবিধাও আছে কিছু। হার্ড লেন্সে কর্নিয়ার সবটা ঢাকা পড়ে না বলে চোখের মধ্যে অনেকসময় লেন্সের ধারটা দেখা যায়। তাতে দৃষ্টি যেমন কিছুটা বাধা পায় তেমনি কখনও কখনও লেন্সের ধার থেকে আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসে, ফলে আলোর ঝলকানি দেখা যায়।

হার্ড লেন্সে চোখে কিছু অস্বস্তিও হয়। সফ্‌ট্ লেন্স চোখের পক্ষে যতটা আরামদায়ক, হার্ড লেন্স তা নয়। হার্ড লেন্সে কর্নিয়া অনেকসময় ছড়ে যেতে পারে এবং তা থেকে কখনও কখনও কর্নিয়ায় ঘা-ও হতে পারে। হার্ড লেন্স সহজেই ভেঙে-ফেটে যেতে পারে, আবার তাতে দাগও পড়তে পারে সহজে। হার্ড লেন্স একটুতেই কর্নিয়া থেকে সরে যেতে পারে, খুলেও পড়তে পারে। হার্ড লেন্সের পিছনে ধুলোবালি বা ঐরকম কিছু আটকে যেতেও পারে। 'পার্ট-টাইম ওয়্যার' অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্য যাঁরা কনট্যাক্ট লেন্স পরতে চান তাঁদের পক্ষে হার্ড লেন্স ভালো নয়।

হার্ড লেন্সের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা, এই লেন্স চোখে সইয়ে নিতে অনেক বেশি সময় লাগে। কারও কারও কয়েক সপ্তাহও লেগে যায়। এই লেন্স পরার পর প্রথম প্রথম চোখে খুবই অস্বস্তি হয়। চোখে যে কিছু ঢুকে আছে তা বেশ বোঝা যায়। প্রথম কয়েকদিন চোখ দিয়ে জল ঝরে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। পরে অবশ্য আর তেমন অসুবিধা থাকে না। একবার

ঠিকমতো চোখে সয়ে গেলে হার্ড লেন্স দিনে আট থেকে পনের ঘন্টা পরা চলে। কিন্তু ডাক্তাররা একনাগাড়ে পনের ঘন্টা হার্ড লেন্স পরতে দিতে চান না, কারণ তাতে অন্য কমপ্লিকেশন হতে পারে। অনেকে চোখ থেকে হার্ড লেন্স খুলে চশমা পরে প্রথম ঘন্টাখানেক কিছুই পরিষ্কার দেখতে পান না, একে বলে 'স্পেকট্যাক্‌ল্‌ ব্লার'। এতে উদ্বেগের কিছু নেই। এ সাময়িক ব্যাপার।

হার্ড লেন্স প্রতিদিনই ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়। এই লেন্স খুশিমতো ব্যবহার করা যায় না। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় এই লেন্স ব্যবহার করতে হয়—তা সে ছ ঘন্টাই হোক কি আট ঘন্টা অথবা দশ ঘন্টা। অর্থাৎ, এই লেন্স প্রতিদিনই পরতে হবে এবং যতক্ষণ পরবেন সেই সময়টা প্রতিদিনই মোটামুটি ঠিক রাখবেন। কোনোদিন পাঁচ ঘন্টা পরলেন, কোনোদিন আট ঘন্টা, কোনোদিন দশ ঘন্টা আবার কোনোদিন পরলেনই না—তা চলবে না। কয়েকদিন যদি পরা বন্ধ রাখেন তাহলে ঐ যে আপনার কর্নিয়া লেন্সটাকে সইয়ে নিয়েছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আপনাকে আবার নতুন করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে।

হার্ড লেন্স সহজেই ভেঙে-ফেটে যেতে পারে এবং তাতে সহজেই দাগ পড়তে পারে বলে প্রতিবারই পরার আগে দেখে নেবেন লেন্স ঠিক আছে কিনা। হার্ড লেন্সে যদি দাগ পড়ে তাহলে আবার পালিশ করে দাগটা তুলে ফেলা যায়, কিন্তু যদি ভেঙে-ফেটে যায় তাহলে তা আর মেরামত করা যায় না। তখন তা ফেলে দিয়ে নতুন লেন্স নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

সফ্‌ট্‌ লেন্সের চেয়ে হার্ড লেন্স অনেক সহজে ও অনেক কম খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। সফ্‌ট্‌ লেন্সের মতো অত পলকাও নয় হার্ড লেন্স। পরার পর প্রতিবার হার্ড লেন্স ডিসইনফেক্ট অর্থাৎ নির্বীজ করতে হয় না, তবে পরিষ্কার করতে হয় নিয়মিত। যে নিয়মে পরিষ্কার করতে বলে দেওয়া হবে সেই নিয়মেই সবসময় পরিষ্কার করবেন।

সফ্‌ট্‌ লেন্স

সফ্‌ট্‌ লেন্স তৈরি হয় হাইড্রোজেল নামে অনেক নরম ও অনেক নমনীয় এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে। এই প্লাস্টিক দেখতে অনেকটা জেল্যাটিনের মতো। বাতাসের অকসিজেন সহজেই এই প্লাস্টিক ভেদ করে যেতে পারে। ফলে, সফ্‌ট্‌ লেন্সে কর্নিয়া সরাসরি বাতাস থেকেও কিছু অকসিজেন পেতে

পারে। এই প্লাস্টিক স্পঞ্জের মতো জল শোষণ করে, তাতে লেন্সটা নমনীয় থাকে।

সফ্‌ট্‌ লেন্স আকারে হার্ড লেন্সের চেয়ে বড়ো। এই লেন্সে কর্নিয়া ছাড়িয়ে চোখের সাদা অংশেরও কিছুটা ঢাকা পড়ে। ফলে, চোখে আলোর ঝলকানি কম দেখা যায় এবং লেন্সের কিনারায় দৃষ্টি ব্যাহত হতে পারে না। এই লেন্স চোখে এমনভাবে এঁটে থাকে যে, চোখের মধ্যে ধুলোবালি গিয়ে লেন্সের পিছনে বড়ো একটা আটকে থাকতে পারে না।

সফ্‌ট্‌ লেন্সের মস্ত সুবিধা, পরার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখে সয়ে যায়। চোখে সয়ে যেতে এক-দুদিনের বেশি সময় লাগে না। এই লেন্সে চোখে প্রায় একেবারেই অস্বস্তি হয় না। হার্ড লেন্সের চেয়ে সফ্‌ট্‌ লেন্স চোখে অনেক বেশি আরামদায়ক। এই লেন্স একনাগাড়ে অনেকক্ষণ পরে থাকা যায়। যদি কেউ অল্প সময়ের জন্য পরতে চান তা-ও পরতে পারেন, অর্থাৎ পার্ট-টাইম ব্যবহারের পক্ষেও সফ্‌ট্‌ লেন্স ভালো। সফ্‌ট্‌ লেন্সে 'স্পেকট্যাক্‌ল্‌ ব্লার' হয় না। অর্থাৎ, চোখ থেকে সফ্‌ট্‌ লেন্স খুলে চশমা পরলে হার্ড লেন্সের মতো প্রথম কিছুক্ষণ ঝাপসা দেখায় না। এই লেন্স চোখের ঠিক মাঝখানেই এঁটে থাকে, শরীরের খুব বেশি ঝাঁকুনিতেও এই লেন্স চোখের মধ্যে সরে যায় না কিংবা চোখ থেকে খুলে পড়ে না। যাঁরা খেলাধুলো বা দৌড়ঝাঁপ করেন তাঁদের পক্ষে এই লেন্স খুবই ভালো।

সফ্‌ট্‌ লেন্সের অসুবিধার মধ্যে, হার্ড লেন্সের চেয়ে দাম অনেক বেশি এবং পরিষ্কার করায় ঝামেলা। হার্ড লেন্স যত সহজে পরিষ্কার করা যায়, সফ্‌ট্‌ লেন্স তত সহজে পরিষ্কার করা যায় না। সফ্‌ট্‌ লেন্সের উপর প্রায়ই প্রোটিনের একটা আস্তর পড়ে। লেন্স খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করলেও এই আস্তরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। লেন্সের গা থেকে প্রোটিনের আস্তর সরানোর জন্য মাঝে মাঝেই বিশেষ ধরনের এক সল্যুশনে লেন্স ডুবিয়ে রাখার দরকার হয়।

সফ্‌ট্‌ লেন্সও পরার আগে প্রতিবারই পরিষ্কার করে নিতে হয়। রাসায়নিক উপায়ে অথবা তাপের সাহায্যে সফ্‌ট্‌ লেন্স পরিষ্কার আর নির্বীজ করা যায়। রাসায়নিকই হোক অথবা তাপ, যে কোনো একটা পদ্ধতিতেই সবসময় লেন্স পরিষ্কার ও নির্বীজ করা উচিত। পদ্ধতি পরিবর্তন করলে লেন্স নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সফ্‌ট্‌ লেন্সে ব্যাকটিরিয়া, ফাঙ্গাস ইত্যাদি জন্মানোর সম্ভাবনা খুবই বেশি। সুতরাং লেন্স ঠিকমতো পরিষ্কার ও নির্বীজ না করে পরলে চোখে প্রচণ্ড রকম ইনফেকশন হতে পারে।

সফ্‌ট্‌ লেন্স খুব সহজেই সিগারেটের ধোঁয়া, রাসায়নিক বাষ্প, এয়ারোসল-স্প্রে ইত্যাদি শোষণ করতে পারে। সুতরাং যেখানে এইরকম ধোঁয়া ও বাষ্পের আধিক্য সেখানে সফ্‌ট্‌ লেন্স না-ও চলতে পারে।

হার্ড লেন্সের মতো সফ্‌ট্‌ লেন্সে অনেকসময় অত বেশি স্পষ্ট দেখা যায় না। হার্ড লেন্সে যেমন দৃষ্টিসংক্রান্ত কিছু ত্রুটি সংশোধন করা যায়, সফ্‌ট্‌ লেন্সে তা যায় না। সফ্‌ট্‌ লেন্সে সামান্য অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্‌ও দূর করা যায় না বলে যাঁদের চোখে অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্‌ আছে তাঁরা এই লেন্সে খুব বেশি স্পষ্ট দেখতে পান না।

হার্ড লেন্সের চেয়ে সফ্‌ট্‌ লেন্স অনেক কম টেকসই। খুব ঘন ঘন এই লেন্স পালটাতে হয়, তাতে খরচ আরও বেশি পড়ে যায়। সফ্‌ট্‌ লেন্সের গড় আয়ু খুব বেশি হলে দেড় বছর।

বেশির ভাগ লোকের চোখেই সফ্‌ট্‌ লেন্স খুব তাড়াতাড়ি সয়ে যায়। কিন্তু এই লেন্স পরে থাকার সময়টা ক্রমশ বাড়াতে হয়। আপনার ডাক্তারই বলে দেবেন, কীভাবে কতক্ষণ করে বাড়াতে হবে। মনে রাখবেন, সফ্‌ট্‌ লেন্স খুব সহজে চোখে সয়ে গেলেও নিয়ম মেনে এই লেন্স চোখে পরতে হবে। অনেকক্ষেত্রেই রোজ আঠার ঘন্টা পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে এই লেন্স পরে থাকা যায়।

সফ্‌ট্‌ লেন্সের ব্যাপারে আর-একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, লেন্স যেন কখনও শুকিয়ে না যায়। লেন্স যখন পরবেন না তখনও যাতে ভিজে থাকে সেজন্য লেন্স খোলার পর সবসময় সল্যুশনে ডুবিয়ে রাখবেন।

গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্স

গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ মানে যার ভিতর দিয়ে খুব সহজেই গ্যাস প্রবেশ করতে পারে। নানারকম প্লাস্টিক পদার্থ দিয়ে গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্স তৈরি হয়। কোনো কোনো গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্স সফ্‌ট্‌ লেন্সের মতো, আবার কোনো কোনো গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্স অনেকটাই হার্ড লেন্সের মতো। তবে সমস্ত গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্সই গ্যাস-ভেদ্য। অর্থাৎ, অকসিজেন আর কার্বন

ডাই-অকসাইড গ্যাস খুব সহজেই সমস্ত গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্স ভেদ করে কর্নিয়ার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্সের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা, অকসিজেন সরাসরি লেন্স ভেদ করে কর্নিয়ায় প্রবেশ করতে পারে বলে এই লেন্স অনেকক্ষণ বিনা অস্বস্তিতে চোখে রাখা যায়। কর্নিয়া খুব সহজেই তার প্রয়োজনীয় অকসিজেন পায় বলে এই লেন্স অনেক বেশি নিরাপদ। কম অকসিজেন পেলে কর্নিয়া অনেকসময় ফুলে ওঠে, তখন চোখে যন্ত্রণা হয় এবং চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। অনেকক্ষণ হার্ড অথবা সফ্‌ট্‌ লেন্স পরে থাকলে এমন হতে পারে, কিন্তু গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্সে এমনটা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। গাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্স রোজ অনেকক্ষণ বিনা অস্বস্তিতে পরে থাকা যায়।

গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্স আকারে হার্ড লেন্সের চেয়ে সামান্য বড়ো। এই লেন্স হার্ড লেন্সের চেয়ে অনেক সহজে চোখে সয়ে যায়। হার্ড লেন্সে যে স্পেকট্যাক্‌ল্‌ ব্লার হয় এই লেন্সে তা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই লেন্স হার্ড লেন্সের মতোই টেকসই। তবে হার্ড লেন্সের চেয়ে এই লেন্সের দাম বেশি।

যাঁদের অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্‌ আছে অথচ হার্ড লেন্স চোখে সহ্য হয় না তাঁদের পক্ষে গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্স খুবই উপযোগী।

কোনো কোনো গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্স বাইরে এমনি রাখা যায় না, বিশেষ ধরনের সল্যুশনে ডুবিয়ে রাখতে হয় এবং নিয়মিত নির্বীজ করতে হয়। গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌ লেন্সের যত্ন ও পরিষ্কার করার নিয়ম আপনার ডাক্তারের কাছ থেকেই জানতে পারবেন।

এক্সটেন্ডেড ওয়্যার লেন্স

এক্সটেন্ডেড ওয়্যার লেন্স আসলে সফ্‌ট্‌ লেন্সেরই উন্নততর সংস্করণ। এই লেন্স তৈরি হয় জেল্যাটিনের মতো এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে। এই প্লাস্টিক সফ্‌ট্‌ লেন্সের প্লাস্টিকের চেয়ে অনেক বেশি নমনীয় এবং কম টেকসই। অকসিজেন ও অন্যান্য গ্যাস খুব সহজেই এই প্লাস্টিকে তৈরি লেন্স ভেদ করে কর্নিয়ায় প্রবেশ করতে পারে। ফলে, চোখে অস্বস্তি হয় না বললেই চলে। এক্সটেন্ডেড ওয়্যার লেন্স অন্যসব লেন্সের চেয়ে অনেক বেশি আরামদায়ক।

এই লেন্স দিনরাত চব্বিশ ঘন্টাই পরে থাকা চলে। একনাগাড়ে দু সপ্তাহ পর্যন্ত পরলেও চোখে অস্বস্তি হয় না।

যাঁদের ক্যাট্যার‍্যাক্ট অপারেশন হয়েছে, অর্থাৎ ছানি-পড়া লেন্স কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাঁদের পক্ষে এক্সটেন্ডেড ওয়্যার লেন্স খুবই ভালো। যাঁদের আরথ্রাইট্রিস আছে কিংবা হাত কাঁপে অথবা চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ এবং নিজের হাতে অন্য কোনো লেন্স চোখে পরতে পারেন না তাঁদের পক্ষে এক্সটেন্ডেড ওয়্যার লেন্স বিশেষভাবে উপযোগী। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় যাঁরা অশক্ত তাঁদের কাছে তাই এই লেন্সের অনেক কদর।

বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা যাঁদের এখনও স্পর্শ করে নি, যাঁদের বয়স অপেক্ষাকৃত কম তাঁরাও এক্সটেন্ডেড ওয়্যার লেন্স ব্যবহার করতে পারেন। দৃষ্টিসংক্রান্ত অনেক ত্রুটিই এই লেন্সে সংশোধন করা যায়। অধিকাংশ রিফ্র্যাকটিভ এরার-ই এই লেন্সে দূর হয়। এই লেন্সে দেখাও যায় অনেক বেশি স্পষ্ট।

তবে এই লেন্সের দাম সফ্‌ট্‌ লেন্সের চেয়ে অনেক বেশি এবং এই লেন্স খুব সহজেই নষ্ট হয়। সফ্‌ট্‌ লেন্সের চেয়ে অনেক ঘন ঘন এই লেন্স পালটাতে হয়। এই লেন্স খুব তাড়াতাড়ি অস্বচ্ছ হয়ে যায় এবং এতে আস্তরও পড়ে খুব সহজে। তাই নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়। 'ফলো-আপ ভিজিট' হিসাবে ডাক্তারের কাছে যেতেও হয় অনেক ঘন ঘন।

যে ধরনের লেন্সই হোক, সকল রকম সাবধানতা সত্ত্বেও লেন্স নষ্ট হয়ে যাবার দরুন অথবা বেশিক্ষণ চোখে পরে থাকার দরুন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। চোখে যন্ত্রণা হওয়া, চোখ খুব লাল হয়ে যাওয়া, চোখ থেকে জল পড়া অথবা একটু বেশি আলোতে চোখে কষ্ট দেখা দেওয়া এসবই গুরুতর সমস্যার পূর্বাভাস হতে পারে। এরকম কোনো উপসর্গ যদি দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে লেন্স খুলে ফেলবেন এবং ডাক্তারের কাছে যাবেন। ঐ উপসর্গের কারণ কোনো ইনফেকশন অথবা কাটা-ছেঁড়া হতে পারে।

আবার, লেন্স যদি ঠিকমতো চোখে না বসে অথবা যদি ভাঙা-ফাটা কিংবা দাগওয়ালা লেন্স চোখে পরেন তাহলে ঘষটানি লেগে চোখের কর্নিয়ায় আঁচড় পড়তে পারে, কর্নিয়া ক্ষয়ে যেতে পারে—এবং তার ফল সাঙ্ঘাতিক হতে পারে। চোখে কনট্যাক্ট লেন্স থাকা অবস্থায় যদি চোখ রগড়ান তাহলেও এমন হতে পারে। এইভাবে কর্নিয়া কেটে-ছড়ে গেলে চোখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা

হতে পারে, বিশেষ করে কর্নিয়ার উপর চোখের পাতা পড়ার সময়। এমন হলে অনেকসময় চোখে পটি লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং কর্নিয়া স্বাভাবিক হতে বেশ কয়েকদিন সময় নেয়।

কর্নিয়া যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে অকসিজেন না পায় তাহলেও কর্নিয়ার ক্ষতি হতে পারে, কর্নিয়ায় ছড় পড়তে পারে। কর্নিয়ায় অকসিজেন সরবরাহ কমে গেলে কর্নিয়ার কোষ ভেঙে যেতে এবং ফুলে উঠতে আরম্ভ করে। আপনি যদি একনাগাড়ে অনেকক্ষণ লেন্স পরে থাকেন তাহলেও এমনটা হতে পারে। সুতরাং ডাক্তার আপনাকে একনাগাড়ে যতক্ষণ লেন্স পরতে বলবেন তার বেশি পরবেন না।

চোখের ইনফেকশনের একটা বড়ো কারণ ব্যাকটিরিয়া। চোখে লেন্স পরার সময় আপনার হাত যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে চোখে ব্যাকটিরিয়া ঢুকতে পারে। আবার, আমাদের মুখের লালায় প্রচুর ব্যাকটিরিয়া থাকে, সুতরাং কখনও ভুলেও যদি লেন্স মুখ দিয়ে চেপে ধরেন তাহলে চোখে ইনফেকশন হতে পারে। তাছাড়া লেন্স নিজেই ব্যাকটিরিয়া আর ফাঙ্গাসের একটা ভালো বংশবিস্তারক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং সবসময় নিয়ম মেনে ঠিকভাবে লেন্স পরিষ্কার করা দরকার। কখনও কখনও আপনার দোষ না থাকা সত্ত্বেও বাতাস থেকে ব্যাকটিরিয়া আর ভাইরাস আপনার চোখে ঢুকে ইনফেকশন ঘটাতে পারে। চোখে ইনফেকশন ঘটলে প্রথমে চোখ লাল হবে, চোখে যন্ত্রণা হবে।

চোখে কনট্যাক্ট লেন্স পরতে শুরু করার পর প্রথম প্রথম চোখ একটু লাল হওয়া অথবা কিছুক্ষণ অস্বস্তি বোধ করা এবং চোখ দিয়ে জল পড়া অস্বাভাবিক কিছু না। কখনও কখনও বেশি আলোয় চোখে যন্ত্রণা হতে পারে, আবার খুব বেশি করে চোখের পাতা পড়তে পারে। এসবের কোনোটাই উদ্বেগের কারণ নয়, এসবই সাময়িক ব্যাপার। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেরে যায়। আপনি যদি ব্যবহারের পর প্রত্যেকবার যত্নসহকারে লেন্স পরিষ্কার করেন এবং 'ফলো-আপ ভিজিট' হিসাবে মাঝে মাঝে ডাক্তারের কাছে যান তাহলে এইসব উপসর্গের সম্ভাবনা অনেক কমে যেতে পারে।

চোখের যন্ত্রণা অথবা লাল-ভাব যদি আপনা থেকে যেতে না চায় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাবেন।

সাধারণ চশমার চেয়ে কনট্যাক্ট লেন্সের অনেক সুবিধা আছে সত্যি,

কিন্তু কনট্যাক্ট লেন্সে অনেক সাবধানতা দরকার। আপনি যদি ঠিকমতো লেন্স পরিষ্কার না করেন এবং নিয়ম মেনে চোখে লেন্স না পরেন তাহলে শুধু লেন্সেরই নয়, আপনার চোখেরও ক্ষতি হতে পারে। তাই শেষে আপনার কয়েকটা 'করণীয়' ও 'অকরণীয়'-র কথা বলি।

করণীয়র মধ্যে : ১. আপনার ডাক্তার যে সল্যুশন ব্যবহার করতে বলবেন সেই সল্যুশনই ব্যবহার করবেন ; ২. হাতে আর লেন্সে যাতে আই মেক-আপ না লাগে সেদিকে যেমন লক্ষ্য রাখবেন তেমনি আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন চোখে কাজল, ম্যাসকারা ইত্যাদি লেন্স পরার আগে লাগাবেন, না পরে ; ৩. চেক-আপের জন্য নিয়মিত আপনার ডাক্তারের কাছে যাবেন ; ৪. প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর লেন্স পরিষ্কার করবেন ; ৫. লেন্স যাতে কেটে-ছড়ে না যায় সেজন্য নিয়মিত নখ কাটবেন ; ৬. প্রতিবার লেন্স পরার আগে দেখে নেবেন লেন্স ভেঙে-ফেটে বা কেটে-ছড়ে গেছে কিনা ; ৭. লেন্স রাখার পাত্রটা সবসময় পরিষ্কার রাখবেন এবং নিয়মিত তাতে সল্যুশন দেবেন ; ৮. পাত্রটা ভেঙে-ফেটে গেছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন ; এবং ৯. লেন্স হারিয়ে যাবার অথবা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বলে সবসময় হাতের কাছে একজোড়া বাড়তি লেন্স রেখে দেবেন।

অকরণীয়র মধ্যে : ১. কখনও মুখের লালা দিয়ে লেন্স ভেজাবেন না ; ২. লেন্স পরে কখনও চোখ রগড়াবেন না ; ৩. ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া কখনও লেন্স পরে চোখে ওষুধ দেবেন না ; ৪. লেন্স পরে ওভারহেড হেয়ার-ড্রায়ার অথবা হেয়ার-স্প্রে ব্যবহার করবেন না ; ৫. চোখে কনট্যাক্ট লেন্স থাকলেও যে কাজে চোখে বিশেষ চশমা পরার অথবা চোখের সামনে বিশেষ ঢাকনা ধরার দরকার হয় সেই কাজ করার সময় সেই চশমা পরবেন অথবা চোখের সামনে সেই ঢাকনা ধরবেন ; ৬. হার্ড লেন্স অথবা সফ্‌ট্‌ লেন্স পরে কখনও ঘুমোবেন না, এমন কি চেয়ারে চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্নও হবেন না ; ৭. কনট্যাক্ট লেন্স পরে শাওয়ারে স্নান করতে পারেন, কিন্তু নদীতে, পুকুরে কিংবা সুইমিং পুলে নামার আগে চোখ থেকে লেন্স খুলে রাখবেন ; এবং ৮. কখনও একনাগাড়ে বেশিক্ষণ লেন্স পরে থাকবেন না, যে লেন্স যতক্ষণ পরে থাকার কথা, কদাচ তার চেয়ে বেশিক্ষণ পরবেন না।

পাঁচ : শিশুদের চোখের অসুখ

শিশুর চোখ তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে মাতৃগর্ভেই তৈরি হয়ে যায়। সেই কারণে, শিশু যাতে ভবিষ্যতে ক্ষীণদৃষ্টি অথবা অন্ধ না হয় সেজন্য গর্ভাবস্থা থেকেই সাবধান হওয়া দরকার। গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর চোখের প্রতিরক্ষা শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। প্রসূতিকে তখন 'হাই ক্যালরি ডায়েট' খেতে দিতে হয়, লক্ষ্য রাখতে হয় সেই খাদ্যে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়ম এবং ভিটামিন-ডি ও ভিটামিন-এ থাকে। প্রসূতির বিশ্রামও দরকার স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি এবং বাসস্থান হওয়া চাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রসূতির যাতে কোনোরকম ইনফেকশন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখাতে হয়। মনে রাখতে হবে, মায়ের শরীরে পুষ্টির অভাব এবং রোগব্যাধির আক্রমণ হলে শিশুর চোখেরও ক্ষতি হতে পারে। মায়ের শরীরে কোনো কোনো পুষ্টির অভাবে এবং কোনো কোনো রোগে শিশুর চোখের লেন্সের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় যদি মায়ের জার্মান মীজ্‌ল্‌স্‌, টকসোপ্লাজমা ইত্যাদি রোগ হয় এবং তাঁর খাদ্যে প্রোটিন, ক্যালসিয়ম ও ভিটামিনের অভাব থাকে তাহলে শিশু চোখে ছানি নিয়ে জন্মাতে পারে।

শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন যদি মায়ের জার্মান মীজ্‌ল্‌স্‌, সিফিলিস, টকসোপ্লাজমা ইত্যাদি রোগ হয় কিংবা তাঁর শরীরে ক্যালসিয়ম ও ভিটামিন-ডি'র অভাব ঘটে তাহলে শিশুর অন্ধত্ব একরকম অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং শিশুর জন্মের আগে থেকেই তার সম্পর্কে মা-বাবার দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের কোনো রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা করা দরকার এবং রোগ যাতে না হয়, শরীরে যাতে কোনো প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

শিশুর জন্মের পরই লক্ষ্য করা উচিত তার অন্য সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো চোখ দুটিও স্বাভাবিক হয়েছে কিনা। অস্বাভাবিক চোখ সহজেই বোঝা যায় এবং চোখে অস্বাভাবিকতা কিছু দেখলে অবিলম্বে চক্ষুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

অস্বাভাবিকতা অনেকরকমের হতে পারে। একটি সাধারণ অস্বাভাবিকতা,

ষাঁড়ের চোখের মতো বড়ো চোখ। এ এক ধরনের রোগ, একে বলে বুফথ্যালমস। রোগটি জন্মগত গ্লকোমা। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচার না করলে অন্ধত্ব অনিবার্য। অস্ত্রোপচারে দুটো দিনও যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে ক্ষতি।

আর-একটি অস্বাভাবিকতা, ঠিক জন্মের সময় না হলেও জন্মের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিশুর চোখ অসাধারণ রকম উজ্জ্বল দেখায়, বিশেষ করে রাত্রে। রাত্রে চোখ দুটি অনেকসময় বিড়ালের চোখের মতো জ্বল্ জ্বল্ করে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে চোখের ভিতর সাদা ছানির মতো দেখা যায়। এক্ষেত্রেও অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার, কারণ শিশু অচিরেই এক মারাত্মক রোগের শিকার হতে পারে। সে রোগ চোখের ক্যান্সার, ডাক্তাররা বলেন রেটিনোব্লাস্টোমা। এই রোগে শুধু অন্ধত্বই নয়, অনেকসময় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

সুতরাং শিশুর চোখের কোনোরকম অস্বাভাবিকতাই হেলাফেলার বিষয় নয়। অস্বাভাবিকতা কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো দরকার। অনেক জটিল রোগ গোড়ায় খুব সাধারণ মনে হয়। মনে হয়, কিছুই না, এমনিতেই সেরে যাবে। কিন্তু অনেকসময় তা যায় না। তার ফল হয় মারাত্মক। যেমন, শিশুদের চোখ দিয়ে জল পড়া অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু যদি দেখা যায়, অকারণে অর্থাৎ হাসিকান্না ছাড়াই অনবরত চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে তাহলে তা মোটেই সাধারণ ব্যাপার নয়। জন্মের ছ-সাত মাস পরেও যদি জল পড়া না কমে তাহলে নেত্রনালীর অসুখ মনে করতে হবে। এক্ষেত্রে কিছুদিনের মধ্যেই চোখ দিয়ে জলের পরিবর্তে পুঁজ পড়তে আরম্ভ করবে এবং পরিণামে কর্নিয়ায় ঘা হয়ে চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। অথচ, নেত্রনালী পরিষ্কার করা মোটেই কঠিন চিকিৎসা নয়।

জন্মের ছ সপ্তাহ পর থেকেই সাধারণত শিশুর দৃষ্টি কোনো বস্তুতে নিবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। তার আগে তার দৃষ্টি এলোমেলো ঘোরে, কোনো বস্তুর দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে পারে না। শিশু যখন কোনো বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে শেখে তখনই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তখন সে ঘাড় ঘুরিয়ে মাকে দেখে, চোখের সামনে কোনো জিনিস, বিশেষ করে লাল জিনিস ধরে সরিয়ে নিতে থাকলে তার চোখও সঙ্গে সঙ্গে সরে। পূর্ণদৃষ্টির বিকাশের পক্ষে এ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু কখনও কখনও এই ব্যাপারেও ব্যতিক্রম ঘটে। অর্থাৎ, জন্মের ছ সপ্তাহের অনেক পরেও শিশুর দৃষ্টি কোনো বস্তুতে নিবদ্ধ হয় না, তখনও তার দৃষ্টি এলোমেলো ঘোরে। ভবিষ্যতেও তার চোখ সর্বদাই নড়তে দেখা যায়। তার দৃষ্টি কখনও সুস্থ ও স্বাভাবিক হয় না। এটা বংশগত রোগও হতে পারে। একে বলে নিস্ট্যাগমাস।

কোনো শিশু যদি সামান্য টেরা চোখেও তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো উচিত। যে চোখে দৃষ্টিশক্তি কম থাকে, সাধারণত সেই চোখই টেরা হয়। সুতরাং চোখের কোনো অসুখ অথবা দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্য শিশু টেরা চোখে তাকাচ্ছে কিনা তা সংশয়াতীতভাবে জানা প্রয়োজন। চিকিৎসায় যদি দেরি হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে টেরা চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন হাজার চেষ্টা করেও সে চোখের দৃষ্টি আর ফেরানো যায় না। অথচ, প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত চশমা আর সামান্য কিছু চোখের ব্যায়ামে সহজেই চোখের টেরাভাব সারিয়ে তোলা যায়।

ছ মাস থেকে এক বছর বয়স পর্যন্ত অনেক শিশুই অল্পবিস্তর পেটের অসুখে ভোগে। মা-বাবা এটাকে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার মনে করে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। অনেকসময় তার ফল হয় মারাত্মক। চোখের স্বাস্থ্যের জন্য শিশুর খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকা দরকার, কিন্তু পেটের অসুখের জন্য খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকলেও শরীর সেই ভিটামিন নিতে পারে না। ফলে, অচিরেই শিশুর শরীরে ভিটামিন-এ'র অভাব ঘটে। তাতে শুধু চোখের অসুখই নয়, অন্য অনেক অসুখও হয়। তবে চোখের অসুখই হয় বেশি।

ভিটামিন-এ'র অভাবে শিশুর চোখ ঘোলাটে হয়ে যায়, চোখের কোণে সাদা ফেনার মতো জমে, তাকে বলে বিটট্স্ স্পট। একটু বড়ো হলে শিশু রাত্রে কম দেখে, একটু বেশি পড়াশোনা করলে কি টেলিভিশন দেখলে চোখে ক্লান্তি আসে, চোখ ব্যথা করে। অনেকসময় মাথাও ধরে, স্নায়বিক দৌর্বল্যও দেখা দেয়। এই অবস্থায় শিশুকে যদি অবিলম্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-এ দেওয়া না হয় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই তার চোখের কর্নিয়ায় ঘা হবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল অন্ধত্ব। ভিটামিন-এ'র অভাবে এই যে কর্নিয়ায় ঘা হয় একে বলে কেরাটোম্যালেশিয়া। এই রোগে আমাদের দেশে প্রতিদিন বহু শিশু অন্ধ হয়ে যায়। অথচ, এই রোগ প্রতিরো[illegible] খুবই সহজ। প্রকৃতিতে ভিটামিন-এ খুবই সহজলভ্য। মানুষের বহু খাদ্যেই প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে, জেরফথ্যালমিয়া নিয়ে আলোচনার সময় এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে। সেইসব খাদ্য থেকে বেছে বেছে সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুকে যদি খাওয়ানো যায় তাহলে তার শরীরে ভিটামিন-এ'র অভাব হতে পারে না। ফলে, তার চোখ রক্ষা পায়। দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখের দরুন শিশুর শরীরে ভিটামিন-এ'র যে অভাব হয় তারও বিহিত করা যেতে পারে প্রথমে পেটের অসুখ সারিয়ে তারপর ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাদ্য খেতে দিয়ে। আসলে, ভিটামিন-এ'র ঘাটতি সম্বন্ধে সতর্ক থাকলেই শিশুকে অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

ছয়ঃ জেরফথ্যালমিয়া

ভারতীয় উপমহাদেশে অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ, ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত জেরফথ্যালমিয়া রোগ। সাধারণত দু থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদেরই এই রোগ বেশি হয়। শিশু যদি মায়ের দুধ না পায় তাহলে আরও আগে এই রোগ হতে পারে। এই রোগের সুচিকিৎসা না হলে অন্ধত্ব প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

এই রোগে সাধারণত চোখে ব্যথা হয় না। রোগের প্রথমে রাত্রে দেখতে অসুবিধা হয়, সাধারণ আলোতেও চোখে ঝাপসা দেখায়। পরে চোখ শুকিয়ে যায় এবং চোখের সাদা অংশ কুঁচকে যেতে শুরু করে। অনেকসময় চোখে কর্নিয়ার পাশে সাবানের ফেনার মতো ত্রিভূজ দেখা দেয়। সেই ত্রিভূজকে বলে বিটট্স্ স্পট।

রোগের প্রকোপ বাড়লে চোখের কর্নিয়াও শুকিয়ে যায়। কর্নিয়া তখন ঘষা কাঁচের মত অস্বচ্ছ হয়ে যায়। অনেকসময় কর্নিয়া নরম হয়ে ফুলে উঠতে পারে এবং ফেটে যেতেও পারে। রোগের প্রতিটি পর্যায়েই অন্ধত্বের কারণ থাকে।

শিশুর যদি অনেকদিন ধরে পেটের অসুখ চলে তাহলেও তার চোখে এই রোগ হতে পারে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সময় ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে অপুষ্টি ছিল ভয়াবহ আকারে। তাদের খাদ্যে ভিটামিন-এ'র প্রচণ্ড অভাব ছিল। ভিটামিন-এ'র অভাবের দরুন প্রায় এক লক্ষ শিশু জেরফথ্যালমিয়া রোগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের খাদ্যে যদি ভিটামিন-এ'র অভাব না থাকত তাহলে হয়তো এই মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটতে পারত না।

অন্ধত্বের সাতটি প্রধান কারণের মধ্যে একটি হল ভিটামিন-এ'র অভাব। ভিটামিন-এ দুর্লভ কিছু না, যেসব খাদ্যে ভিটামিন-এ পাওয়া যায় সেইসব খাদ্য দুর্মূল্যও না। তবু প্রতি বছর পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ শিশু ভিটামিন-এ'র অভাবে অন্ধ হয়ে যায়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটা হিসাবে দেখা যায়, আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন অ্যামেরিকায় প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশু জেরফথ্যালমিয়া রোগে চিরদিনের

জন্য অন্ধ হয়ে যায় এবং আরও বহু লক্ষ রাত্রান্ধতায় ভোগে। ভারত সরকারের একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত জেরফথ্যালমিয়া রোগে প্রতি বছর ভারতে প্রায় ১,৮০,০০০ মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারায়, তাদের মধ্যে ১৪,০০০ শিশু।

ভিটামিন-এ'র অভাবের প্রথম শিকারই হল শিশু। ভিটামিন-এ'র অভাবে শিশুরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। জেরফথ্যালমিয়া ছাড়াও শ্বাসনালীতে ইনফেকশন, হাম, পেটের অসুখ ও অন্য অনেক অসুখ হতে পারে। এইসব অসুখে অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিশু মারা যায়। অথচ, সামান্য একটু ভিটামিন-এ দিয়ে তাদের শতকরা অন্তত ৬০ জনকে বাঁচানো সম্ভব। মায়েরা যদি শিশুদের যতদিন-সম্ভব বুকের দুধ খাওয়ান তাহলে এইসব রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। কারণ, মায়ের বুকের দুধে যথেষ্ট পরিমাণে শিশুর প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ থাকে। মায়ের দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকায় যেসব শিশু মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হয় তাদের জেরফথ্যালমিয়া রোগ বড়ো একটা হতে পারে না।

শিশু তার জন্মের পর প্রথম তিনমাস মায়ের দুধ থেকে তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ পায়। তারপর তাকে প্রতিদিন ৩০ গ্র্যাম এমন খাদ্য দিতে হয় যাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে। তাহলে তার জেরফথ্যালমিয়া রোগের দরুন অন্ধ হবার আশঙ্কা থাকে না।

মায়ের দুধে যাতে বেশি ভিটামিন-এ পাওয়া যায় সেজন্য গর্ভাবস্থায় মাকে বেশি করে ভিটামিন-এ খেতে হয়। শিশুর যেমন বেশি ভিটামিন-এ দরকার তেমনি মায়েরও দরকার। কিন্তু মনে রাখতে হবে, গর্ভাবস্থায় মাকে বেশি পরিমাণে ভিটামিন-এ দিলেও গর্ভের শিশুর দেহে তা বেশি সঞ্চিত হয় না। তবে গর্ভবতী মায়ের খাদ্যে ভিটামিন-এ'র পরিমাণ বাড়ালে গর্ভস্থ শিশুর দেহে তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। গর্ভবতী মাকে যদি অনেকদিন ভিটামিন-এ দেওয়া না হয় তাহলে সন্তানপ্রসবের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে তাঁকে এই ভিটামিন দিলেও তাঁর নিজের প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত তাঁর দুধে তা বিশেষ আসতে পারে না। সুতরাং গর্ভাবস্থাতেই মাকে বেশি করে ভিটামিন-এ দেওয়া দরকার।

ভিটামিন-এ'র সামান্য অভাবেই দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়। আমাদের চোখের রেটিনার মধ্যে 'ভিজ্যুয়াল পার্প্‌ল্‌' নামে একরকম জিনিস তৈরি হয়, তাতে ভিটামিন-এ থাকে। আমরা যখন কোনো বস্তুর দিকে তাকাই তখন সেই বস্তু থেকে আলো ঠিকরে এসে আমাদের চোখে পড়ে। সেই আলো চোখের ভিজ্যুয়াল



জেরফথ্যালমিয়ায় এই শিশুটির ডান চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।



লক্ষ্মীটেরা



টেরা

পার্প্‌ল্‌ আংশিকভাবে ভেঙে দেয় এবং সেই ভাঙনের ফলে যেসব পদার্থ তৈরি হয় সেইসব পদার্থ নার্ভে স্পন্দন সৃষ্টি করে আর সেই স্পন্দনই মস্তিষ্ককে বলে দেয়, চোখ কী দেখছে। এইভাবে আমরা যতক্ষণ দেখি ততক্ষণ আমাদের চোখের ভিজ্যুয়াল পার্প্‌ল্‌ নষ্ট হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে ভিজ্যুয়াল পার্প্‌ল্‌ তৈরি হয়ে ক্ষয়পূরণ হয় এবং তার জন্য ভিটামিন-এ দরকার হয়। এই প্রক্রিয়া চলে অবিরাম। সারা জীবন।

আমরা যতক্ষণ জেগে থাকি, প্রায় ততক্ষণই দেখি। অর্থাৎ, দিনেরাত্রে সমানে আমাদের দেখার কাজ চলে—এবং দিনের দেখা ও রাত্রের দেখা উভয় দেখাতেই ভিটামিন-এ দরকার হয়। শুধু তা-ই নয়, রাত্রের দেখা সম্পূর্ণই ভিটামিন-এ'র উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ভিটামিন-এ'র সামান্য অভাব হলেই প্রথমে রাত্রে দেখার অসুবিধা হয়। রাত্রে হঠাৎ জোরাল আলোর দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তখন চোখ বন্ধ করতে হয়। জোরাল আলোয় চোখের ভিতরকার ভিটামিন-এ অনেকখানি নষ্ট হয়। চোখের জলীয় পদার্থে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে তাহলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ খুলে আবার আগের মতো দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভিটামিন-এ'র ঘাটতি থাকলে খানিকক্ষণ কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। কতক্ষণ, তা নির্ভর করে ঘাটতির পরিমাণের উপর।

ভিটামিন-এ'র অভাব যদি অল্প হয় তাহলে রাত্রে দৃষ্টিক্ষীণতা দেখা দেবে, দিনের বেলায় অবশ্য স্বাভাবিকই দেখা যাবে। ভিটামিন-এ'র অভাব কিঞ্চিৎ বেশি হলে চোখের সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি আসবে। অনেকক্ষণ ধরে টেলিভিশন কিংবা সিনেমা দেখার পর যেমন আসে। অভাব যদি আরও বেশি হয় তাহলে চোখে ব্যথা হবে, বিশেষ করে অনেকক্ষণ কাজ করার পর। তাছাড়া মাথা ধরবে, স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেবে এবং দেখতে দেখতে চোখ অবসন্ন হয়ে পড়বে। এই ধরনের রাত্রান্ধ লোকেরা উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারেন না। কালো চশমা পরলে তাঁরা অনেক আরাম বোধ করেন।

রাত্রান্ধতা ও মেটের সাহায্যে এই অসুখ নিরাময়ের কথা (মেটেয় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে) খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের মিশরীয় ও চীনা গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমান চিকিৎসকরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও রাত্রান্ধতার বহু উল্লেখ আছে।

শরীরে ভিটামিন-এ'র খুব বেশি অভাব হলে চোখ জ্বালা করে, চোখ চুলকোয়, চোখের পাতা ফুলে ওঠে, গোটা চোখে ব্যথা হয়। চোখের কোণে পিচুটিও জমে অনেকসময়। কর্ণিয়ায় ঘা-ও হয়।

ভিটামিন-এ'র অভাব যদিও প্রথমে ধরা পড়ে বিটট্স্ স্পট ও জেরফথ্যালমিয়া হিসাবে চোখের উপসর্গে, পরিবর্তনটা কিন্তু আগে আসে দেহের চামড়ায়। চামড়ার নিচের দিককার স্তরের কোষ মরে গিয়ে চলটা ওঠার মতো উঠে আসে। মরা কোষ চামড়ার নিচে তেল-ভরা থলি এবং লোমকূপগুলি বন্ধ করে দেয়। ফলে, দেহের ভিতরকার তেল উপরে উঠে আসতে পারে না। তাতে চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে যায়। অনেকসময় সারা গা চুলকোতে থাকে। চামড়ার খসখসে ভাব সাধারণত প্রথমে দেখা দেয় কনুই, হাঁটু, নিতম্ব আর বাহুর পিছনদিকে।

ভিটামিন-এ'র অভাবে কেবল চোখের অসুখ নয়, অন্য অনেক অসুখও হতে পারে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হতে পারে। তাই শরীরে যাতে ভিটামিন-এ'র অভাব না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

উজ্জ্বল আলোয় চোখের ভিটামিন-এ তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। মৃদু আলোয় সম্পূর্ণভাবে ভিটামিন-এ'র উপর নির্ভর করে দেখতে হয় বলে ভিটামিন-এ খরচ হয় বেশি। সেই কারণে মাঝারি আলোই চোখের পক্ষে ভালো। যাঁদের প্রখর আলোয় কিংবা মৃদু আলোয় কাজ করতে হয় তাঁদের ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন বেশি। এমন কি, যাঁরা সাদা কাগজে টাইপ করেন তাঁদেরও বেশি ভিটামিন-এ দরকার, কারণ তাঁদের আলোর ঝলক সহ্য করতে হয় বেশি।

ভিটামিন-এ একটা বর্ণহীন পদার্থ। কেবল প্রাণিজ খাদ্যেই তা পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে পাওয়া যায় ভিটামিন-এ তৈরির উপাদান ক্যারোটিন।

উদ্ভিদজগতে ক্যারোটিন নামে হলদে রঙের এক কঠিন রঞ্জক পদার্থ ভিটামিন-এ'র জনক। প্রাণিদেহে ক্যারোটিন বিশেষ দেখা যায় না। প্রাণিদেহে ক্যারোটিন ভিটামিন-এ'তে রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদ সূর্যকিরণের সাহায্যে ক্যারোটিন তৈরি করে। উদ্ভিদভোজী প্রাণী উদ্ভিদ থেকে যতটা ক্যারোটিন পায় তার খানিকটা ভিটামিন-এ'তে পরিণত হয়, বাকিটা ক্যারোটিন হিসাবে লিভার অর্থাৎ মেটেয় সঞ্চিত থাকে যাতে ভবিষ্যতে দরকারের সময় শরীররক্ষার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। মানুষের খাদ্য প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ উভয় প্রকার, কাজেই মানুষ প্রাণিজগৎ থেকে একেবারে তৈরি ভিটামিন-এ পায় আর উদ্ভিদজগৎ থেকে পায় ক্যারোটিন। সেই ক্যারোটিন থেকে সে নিজের দেহে ভিটামিন-এ তৈরি করে নেয়।

ভিটামিন-এ তৈরির জন্য যে ক্যারোটিন দরকার তা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সবুজ শাকপাতায়। পাতা যত পাতলা আর সবুজ হবে তত ভালো। বীট, গাজর, আলু, রাঙা আলু, শিম, পাকা কুমড়ো, পাকা টম্যাটো, মটরশুঁটি,

বাঁধাকপি, সজনেডাঁটা, উচ্ছে, চিচিঙে, ডুমুর, পটল, বেগুন, লেটুস, ইত্যাদিতেও ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন মেটে। আম, কলা, কাঁঠাল, কমলালেবু, পাকা পেঁপে, খরমুজ প্রভৃতি হলদে রঙের প্রায় সমস্ত ফল থেকেই ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। এমন কি, পাকা লঙ্কা থেকেও পাওয়া যায়। যেসব তরিতরকারির আসল রং সবুজ নয় তাতে ভিটামিন-এ থাকে না। বিবর্ণ, বাসি তরিতরকারিতেও থাকে না।

প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে তৃণভোজী গবাদি পশুর মেটেয় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে। কিডনিতেও থাকে যথেষ্ট, কিন্তু পেশীর মাংসে থাকে না। কড প্রভৃতি মাছের লিভারে প্রচুর ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। চাঁই, ভেটকি, চিতল, মৃগেল, রুই, ইলিশ প্রভৃতি মাছের লিভারের তেলে কড-লিভার অয়েলের চেয়ে অনেক বেশি ভিটামিন-এ থাকে। ছোটো মাছের মধ্যে ট্যাংরা, পারসে, প্রভৃতি মাছেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। ঘি, মাখন, আর ডিমের কুসুমে অঢেল ভিটামিন-এ পাওয়া যায়।

দুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে। তৃণভোজী গবাদি পশু ঘাসপাতা থেকে ক্যারোটিন সংগ্রহ করে তাদের দেহের মধ্যে ভিটামিন-এ তৈরি করে এবং সেই ভিটামিন-এ দুধের সঙ্গে আমাদের ঢেলে দেয়। ভিটামিন, প্রোটিন, লবণ সবদিক থেকেই দুধ অনেকটা 'আদর্শ' খাদ্য। মহাকবি গ্যোটে বলেছেন, 'Milch ist ein ganz besondrer saft', অর্থাৎ 'দুধ প্রকৃতপক্ষেই অমৃতকল্প রস'। আমাদের শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, 'প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ং'।

খাদ্যে ভিটামিন-এ'র যদি অভাব থাকে তাহলে সেই অভাব পূরণের জন্য ভিটামিন-এ ক্যাপসিউল খাওয়া যেতে পারে। শিশুদেরও এই ক্যাপসিউল দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসকই বলে দেবেন ক্যাপসিউলের দরকার আছে কিনা এবং থাকলে কতখানি। তিনিই ক্যাপসিউলের মাত্রা ঠিক করে দেবেন এবং বলে দেবেন কতদিন ক্যাপসিউল খেতে হবে। মনে রাখবেন, শরীরে ভিটামিন-এ'র পরিমাণ যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে উলটে বিপত্তি ঘটতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে পারে।

ভিটামিন-এ শরীরে সঞ্চয় করে রাখা যায়, সুতরাং অনেকসময় ছ মাসে একটা ক্যাপসিউল খেলেই চলে। এই ব্যাপারটাও চিকিৎসকই ঠিক করে দেবেন।

সাত : অ্যামব্লাইওপিয়া

অ্যামব্লাইওপিয়া হচ্ছে এক ধরনের ক্ষীণদৃষ্টি—চোখে কোনো রোগব্যাধি নেই, কেবল দৃষ্টিশক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি বলে ভালো দেখা যায় না। সাধারণত এক চোখেই অ্যামব্লাইওপিয়া হয়। শৈশবে যখন এক চোখে দৃষ্টিশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে এবং অন্য চোখে ঘটে না তখন যে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে যায় সেই চোখকে বলে অ্যামব্লাইওপিক। চলতি কথায় 'লেজি আই' অর্থাৎ 'অলস চোখ'-ও বলা হয়।

একেবারে শৈশবেই যদি চিকিৎসা শুরু করা যায় তাহলে অ্যামব্লাইওপিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। সুতরাং মা-বাবাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে, শিশু যেন এই অসুখের শিকার না হয়। শিশুর চার বছর বয়স হবার আগেই তার চোখ পরীক্ষা করানো দরকার। চার বছরের বেশি বয়স হয়ে গেলে বড়ো দেরি হয়ে যায়, তখন আর তার চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি এনে দেওয়া সম্ভব হয় না।

সদ্যোজাত শিশুও চোখে দেখতে পায়, কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি তখন অপূর্ণ থাকে। তার দৃষ্টিশক্তির বিকাশ ঘটতে কিছু সময় লাগে। জন্মের পর প্রথম একমাসে শিশুর দৃষ্টিশক্তি খুবই বেড়ে যায়, কারণ তখন তার চোখের ব্যবহার বাড়ে। জীবনের প্রথম কয়েক বছর চোখের ভিজ্যুয়াল সিস্টেম অর্থাৎ দর্শনতন্ত্র পরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে, এই সময় চোখের উপযুক্ত ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ বাড়ে। কিন্তু চোখ যদি পূর্ণক্ষমতায় ব্যবহার করা না হয় তাহলে চোখের দৃষ্টিশক্তি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। জীবনের প্রথম দশ বছরের পর দর্শনতন্ত্র স্থির হয়ে যায়, তখন আর তার বিকাশ ঘটে না—তা সে ব্যবহার করা হোক আর না-ই হোক।

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য দু চোখেই সমান দৃষ্টিশক্তির বিকাশ দরকার। যাঁদের মাত্র একটি চোখে ভালো দৃষ্টি, অনেক কাজে তাঁদের নেওয়া হয় না। তাছাড়া জীবনে পরবর্তী কালে যদি কোনো দুর্ঘটনায় বা রোগে একটি চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায় তখন আর-একটি চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টি থাকা নিতান্ত দরকার। সুতরাং অ্যামব্লাইওপিয়া কখনই হেলাফেলার ব্যাপার নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অসুখ নির্ণয় করে চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া উচিত।

কোনোরকম অস্বাভাবিকতার দরুন দু চোখের স্বাভাবিক ব্যবহারে এবং দৃষ্টিশক্তির স্বাভাবিক বিকাশে বাধা ঘটলে অ্যামব্লাইওপিয়া হয়। কোনো কারণে যদি দু চোখ সমানভাবে ব্যবহৃত হতে না পারে এবং দু চোখের দৃষ্টিশক্তি সমানভাবে বিকশিত না হয় তাহলে অ্যামব্লাইওপিয়া হয়। অ্যামব্লাইওপিয়ার বড়ো কারণ টেরা চোখ। আবার, অ্যামব্লাইওপিয়ার কারণেও চোখ টেরা হয়।

খুব বেশি রকমের নিয়ারসাইটেডনেস, ফারসাইটেডনেস অথবা অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌মের কারণে এক চোখ যখন অন্য চোখের চেয়ে 'আউট অভ ফোকাস' হয়ে যায় তখনও অ্যামব্লাইওপিয়া হতে পারে। ছানির মতো অসুখে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেলে চোখ যখন ঠিকমতো আলো ফোকাস করতে পারে না তখন অ্যামব্লাইওপিয়া হতে পারে। অ্যামব্লাইওপিয়ার কিছু কারণ আবার বংশগত। সমস্ত ক্ষেত্রেই শিশু যে চোখে ভালো দেখতে পায় সেই চোখই বেশি ব্যবহার করে, ফলে অন্য চোখ দিন দিন অকেজো হয়ে যেতে থাকে এবং পরে তাতে অ্যামব্লাইওপিয়া হয়।

এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার, যে কারণে অ্যামব্লাইওপিয়া হয় সেই কারণটা দূর করে দিলেই অ্যামব্লাইওপিয়া দূর হয়ে যায় না। আগে টেরা চোখ সোজা করে, চশমা দিয়ে দৃষ্টিশক্তি ঠিক করে অথবা ছানি অপারেশন করে তারপর আলাদাভাবে অ্যামব্লাইওপিয়ার চিকিৎসা করতে হয়।

অনেকসময়েই অ্যামব্লাইওপিয়া ধরা পড়ে না। কারণ, শিশু এ বিষয়ে সচেতন থাকে না। তার একটা চোখ ভালো, একটা চোখ মন্দ এই অবস্থাকে সে অস্বাভাবিক বলে মনে করে না। এটাকে সে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। মা-বাবাকে কিছু বলার দরকার মনে করে না। মা-বাবাও খেয়াল করেন না যদি-না টেরা চোখ অথবা অন্য কোনোরকম অস্বাভাবিকতা দেখতে পান। সুতরাং অ্যামব্লাইওপিয়া ধরা পড়তে অনেকক্ষেত্রেই বড়ো বেশি দেরি হয়ে যায়। তখন আর কিছুই করার থাকে না।

অ্যামব্লাইওপিয়া ধরা হয় দু চোখের দৃষ্টিশক্তির পার্থক্য দেখে। কিন্তু একেবারে শিশুদের চোখের দৃষ্টিশক্তি পরিমাপ করা খুবই কঠিন। চক্ষুবিশেষজ্ঞরা সাধারণত এইরকম শিশুর এক চোখ ঢেকে দিয়ে অন্য চোখের সামনে কোনো জিনিস ধরে সরিয়ে সরিয়ে দেখেন সেই চোখ কোন্‌দিকে ঘোরে। স্বাভাবিক চোখ কোনো জিনিসের দিকে সরাসরি তাকায়, কিন্তু অ্যামব্লাইওপিয়া থাকলে

চোখ পাশে বেঁকে যায়। চক্ষুবিশেষজ্ঞরা শিশুর এক চোখ ঢেকে দিয়ে নানা পরীক্ষার সাহায্যে অন্য চোখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন।

তিন-চার বছর বয়সের শিশুদের দৃষ্টিশক্তি মোটামুটি নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু অ্যামব্লাইওপিয়া আছে কিনা ধরার জন্য যথেষ্ট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দরকার হয়। এক চোখের দৃষ্টিশক্তি কম হলেই অ্যামব্লাইওপিয়া প্রমাণ হয় না। অনেকসময় চশমা দিয়ে দৃষ্টিশক্তি বাড়ানো যায়, কিন্তু চোখের ভিতরটা পরীক্ষা করারও দরকার হয়, কারণ চোখের ভিতরে ছানি, ইনফ্ল্যামেশন, টিউমার বা অন্য কোনো গোলযোগ থাকতে পারে এবং তার জন্য দৃষ্টিশক্তি কম হতে পারে।

অ্যামব্লাইওপিয়ার চিকিৎসায় প্রথমেই দরকার শিশুকে বাধ্য করা যাতে সে তার খারাপ চোখটাই বেশি ব্যবহার করে। এইজন্য তার ভালো চোখটা সাধারণত ঢেকে দেওয়া হয়। কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ কিংবা মাসের পর মাস ঢেকে রাখার দরকার হয়। অনেকসময় ভালো চোখে ওষুধ দিয়ে সেই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তাতে শিশু খারাপ চোখ দিয়ে দেখতে বাধ্য হয়। চোখ যদি টেরা হয়, চোখে যদি ছানি থাকে কিংবা অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তখন ওষুধ দিয়ে অথবা অস্ত্রোপচার করে অ্যামব্লাইওপিয়ার কারণ দূর করা হয়। যা-ই করা হোক, অনেকসময় অনেকদিন পর্যন্ত ভালো চোখটা ঢেকে রাখার দরকার হয়।

এইখানেই মা-বাবার দায়িত্ব বেশি করে দেখা দেয়। চিকিৎসক বলে দিতে পারেন কীভাবে অ্যামব্লাইওপিয়ার চিকিৎসা করতে হবে, কিন্তু চিকিৎসা যথাযথভাবে চালিয়ে যেতে হবে মা-বাবাকে। কোনো শিশুই তার ভালো চোখটাকে ঢেকে রাখতে চায় না, মা-বাবাকে দেখতে হবে যাতে সে ঢেকে রাখে। মা-বাবার চেষ্টার উপরই চিকিৎসার ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে। শিশুর অ্যামব্লাইওপিয়া সারাতে মা-বাবার ভূমিকা অপরিসীম।

চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর। প্রথম, অ্যামব্লাইওপিয়ার প্রকোপ কতখানি ; এবং দ্বিতীয়, কত বয়সে অ্যামব্লাইওপিয়ার চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে। যদি একেবারে গোড়াতেই অসুখটা ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা শুরু করা যায় তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসুখ সেরে যায়, শিশু স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। কিন্তু প্রায় ন বছর বয়স পর্যন্ত কিছু কিছু চিকিৎসা চালিয়ে যাবার দরকার হতে পারে। ন বছর বয়সের পর

আর অ্যামব্লাইওপিয়া হয় না। ছ থেকে ন বছর বয়সের পর যদি অ্যামব্লাইওপিয়া প্রথম ধরা পড়ে তাহলে চিকিৎসায় সাধারণত কাজ হয় না। মনে রাখতে হবে—

১. দু চোখের স্বাভাবিক ব্যবহারের ফলেই একেবারে শৈশবেই ভালো দৃষ্টিশক্তি গড়ে ওঠে। জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ থেকে ন বছর বয়স পর্যন্ত কোনো চোখ স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার না করলে সে চোখের দৃষ্টি ভালো হয় না, সে চোখে পরে অ্যামব্লাইওপিয়া দেখা দেয়।

২. অ্যামব্লাইওপিয়ায় কোনো উপসর্গ থাকে না। কেবল চোখ পরীক্ষা করেই অ্যামব্লাইওপিয়া নির্ণয় করতে হয়।

৩. অ্যামব্লাইওপিয়ার প্রধান কারণ টেরা চোখ এবং নিয়ারসাইটেডনেস, ফারসাইটেডনেস কিংবা অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌মের মতো চোখের দোষ আর ছানি ইত্যাদি চোখের অসুখ।

৪. অ্যামব্লাইওপিয়া সারে, যদি অসুখ প্রথমেই ধরা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করা যায় আর সেই চিকিৎসায় মা-বাবা সহযোগিতা করেন।

আট : টেরা চোখ

টেরা চোখ অতি সাধারণ ঘটনা। এত সাধারণ যে, গোড়ায় অসুখ হিসাবে কেউ একে গুরুত্বই দেন না। শিশুর চোখ যখন টেরা হতে শুরু করে, অনেকে তখন খুশিই হন। তাঁরা একে সুলক্ষণ বলে মনে করেন, বলেন লক্ষ্মীটেরা। আমাদের মা-লক্ষ্মীও নাকি সামান্য টেরা এবং তাতে তাঁর সৌন্দর্য বৃদ্ধিই পেয়েছে।

শিশুর সামান্য টেরা চোখের জন্য মা-বাবার কোনো দুশ্চিন্তাই থাকে না। কিন্তু একদিন যখন হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়, শিশু টেরা চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না তখন মা-বাবার টনক নড়ে। আবার, টেরা চোখের জন্য বয়স্থা মেয়ের যখন বিয়ে হয় না তখনও মা-বাবা ভাবনায় পড়েন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেরা চোখের জন্য অনেকের মনে হীনম্মন্যতা জন্মায়। চাকরির ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয়।

অথচ, প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করালে টেরা চোখ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে যায়। অর্থাৎ, টেরা চোখকে সোজা করে তাতে পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।



অপারেশনের আগে



অপারেশনের পরে

জন্মের পর অনেকসময় শিশুর চোখে টেরা ভাব দেখা যায়, কিন্তু তিন থেকে ছ মাস বয়সের মধ্যেই সাধারণত এই ভাব কেটে যায়। যদি কোনো কারণে তা না কাটে এবং শিশু আগেরই মতো টেরা চোখে তাকাতে থাকে

তাহলে ভাবনার কারণ ঘটে। মা-বাবার লক্ষ্য রাখা উচিত ছ মাস বয়স হবার আগেই শিশুর চোখের টেরা ভাব কেটেছে কিনা। না কেটে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো উচিত।

আমাদের চোখ অনেকটা গোল বলের মতো। তাই ইংরেজীতে বলা হয় আই-বল। বাংলায় বলে অক্ষিগোলক। শক্ত হাড়ের কোটরের মধ্যে ছটি পেশীর সাহায্যে অক্ষিগোলক ডানে-বাঁয়ে, উপরে-নিচে এবং কোণাকুণি যেদিকে ইচ্ছা ঘোরানো যায়। অক্ষিকোটরের মধ্যে হাড় ও অক্ষিগোলকের মাঝে নরম মেদ থাকার জন্যই খুব সহজে চোখ ঘুরতে পারে।

আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের এমনই গঠন যে, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে দু চোখের পেশী একসঙ্গে শুধু একদিকেই ঘোরে। অর্থাৎ, আমরা ডানে-বাঁয়ে উপরে-নিচে যেদিকেই তাকাই না কেন, দু চোখ একই সঙ্গে একই তালে ঘোরে। দু চোখের নড়াচড়ার মধ্যে যদি ছন্দপতন ঘটে তাহলেই চোখ টেরা হয়—এবং এই ছন্দপতন ঘটে দু চোখের পেশীগুলির মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে। দু চোখের পেশীগুলির মধ্যে ভারসাম্য যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন এক চোখ অন্য চোখের সমান্তরাল অক্ষরেখা থেকে সরে যায় আর তার ফলে চোখ টেরা দেখায়।

চোখের পেশীর এই যে ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এই ব্যাপারটা এক বা একাধিক পেশীর পক্ষাঘাতের কারণে ঘটতে পারে। এই ধরনের টেরাকে তাই বলা হয় পক্ষাঘাতজনিত টেরা বা প্যারালিটিক স্কুইন্ট।

পক্ষাঘাতজনিত টেরার প্রধান উপসর্গ কোনো একদিকে চোখ ঘোরাতে না পারা, কোনো জিনিসকে ডবল দেখা, মাথা ঘোরা এবং গা টলা। ডায়াবিটিজ এবং হাই ব্লাড প্রেশারের জন্য শরীরের অন্য যে কোনো পেশীর মতো চোখের পেশীও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার অক্ষিকোটরের অথবা মস্তিষ্কের টিউমারের জন্যও পক্ষাঘাতজনিত টেরার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অতএব সন্দেহ হওয়া মাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চোখের কোনো পেশীর পক্ষাঘাত ছাড়াই চোখ টেরা হয়। এই ধরনের টেরাকে অ-পক্ষাঘাতজনিত টেরা বা নন-প্যারালিটিক স্কুইন্ট অথবা কনকমিট্যান্ট স্কুইন্ট বলা হয়। কোনো কারণে দুটি চোখের কোনো একটির দৃষ্টিশক্তি কম হলে এই ধরনের টেরা হতে পারে। আবার, দুটি চোখ একসঙ্গে কাজ করতে না পারার জন্যও এই ধরনের টেরা হতে পারে। এক্ষেত্রে আলাদা

আলাদাভাবে দু চোখের দৃষ্টিই স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু একসঙ্গে দু চোখ দিয়ে তাকালে দেখা যায় একটি চোখ টেরা। খুব অল্প বয়সে ধরা পড়লে অর্থোপ্টিক একসারসাইজ নামে বিশেষ ধরনের কিছু ব্যায়ামের সাহায্যে এই ধরনের টেরা চোখ ভালো করা যায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মা-বাবার অনবধানতা ও শিশুদের নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থার অভাবে অসুখ ধরা পড়তে অনেক দেরি হয়ে যায়। দেরি হলে আর বিশেষকিছু করার থাকে না। অবশ্য তখন অস্ত্রোপচার করে চোখ সোজা করে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে দু চোখ একসঙ্গে কাজ করে না। খুঁতটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না এই যা! তখনও এক চোখের উপরই নির্ভর করতে হয়।

কোনো কারণে একটি চোখের দৃষ্টি কম হওয়ার জন্য যে অ-পক্ষাঘাতজনিত টেরা তার চিকিৎসা একেবারে প্রথম অবস্থাতেই করা দরকার। মনে রাখা দরকার, যদি কোনো শিশু হঠাৎ এক চোখ টেরা করে তাকাতে শুরু করে তাহলে বুঝতে হবে তার ঐ চোখে দেখতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এই অসুবিধা যেমন ক্ষীণদৃষ্টির জন্য হতে পারে তেমনি চোখে মারাত্মক ধরনের কোনো রোগের জন্যও হতে পারে। এইরকম একটি রোগ হল রেটিনোব্লাস্টোমা। এ এক ধরনের ক্যান্সার, ঠিক সময়ে ধরা না পড়লে এতে শিশুর প্রাণহানিরও সম্ভাবনা থাকে।

অনেকসময় চোখে আঘাত লেগে কর্নিয়ায় ঘা হয়ে অথবা লেন্সে ছানি পড়ে চোখের দৃষ্টি কমে যেতে পারে, পরে সেই চোখ টেরা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং শিশুদের সবসময়েই চোখের আঘাত থেকে সাবধানে রাখা দরকার এবং সন্দেহ হলেই জিজ্ঞাসা করা দরকার চোখে কোনোরকম আঘাত লেগেছে কিনা।

একটি চোখের ক্ষীণদৃষ্টির জন্যই সাধারণত বেশি টেরা হবার ঘটনা ঘটে। যে চোখের দৃষ্টি কম সেই চোখ শিশুর নাকের দিকের কোণায় চলে আসে। একে বলে কনভার্জেন্ট স্কুইন্ট। এই ধরনের শিশুরা যখন কিছু দেখার চেষ্টা করে তখন তাদের টেরা ভাব বেশি করে প্রকাশ পায়।

উপযুক্ত চশমা এবং প্রয়োজনবোধে অর্থোপ্টিক একসারসাইজের সাহায্যে খুব সহজেই এই ধরনের টেরা সারানো যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো চোখটা কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ ঢেকে দিলেও কাজ হয়। ভালো চোখ ঢেকে দিলে শিশু দুর্বল চোখকেই বেশি করে কাজে লাগায়, তাতে সুফল পাওয়া যায়। শেষ-চিকিৎসা হিসাবে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে টেরা চোখ সোজা করে

তারপর উপযুক্ত চশমা আর অর্থোপ্টিক একসারসাইজ দিয়ে টেরা চোখকে আবার কর্মক্ষম করা যায়।

সবসময় মনে রাখতে হবে, টেরা চোখের চিকিৎসার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে কোন্ বয়সে চিকিৎসা শুরু করা গেল তার উপর। সাধারণত ছ মাস বয়স থেকেই চিকিৎসা শুরু করা দরকার। পাঁচ বছর বয়সের পর চিকিৎসা শুরু করলে সুফল পাওয়া দুঃসাধ্য। চিকিৎসায় দেরি হলে যে চোখের দৃষ্টি কম সেই চোখকে আর ভালো করা যায় না। সে চোখ চিরকালের জন্য অলস ও অকর্মণ্য হয়ে থাকে। একেই বলে অ্যামব্লাইওপিয়া। কোনো অবস্থাতেই কোনো অস্ত্রোপচারের সাহায্যেই অ্যামব্লাইওপিয়া সারানো যায় না।

অবশ্য কসমেটিক সার্জারি করে চোখটাকে সোজা করা যায়। তাতে খুঁতটা দূর হয় এবং সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করা যায়, কিন্তু চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা যায় না। চোখটা চিরজীবনের মতো অক্ষম হয়ে থাকে।

একটু বেশি বয়সে চোখ টেরা হতে শুরু করলে চোখ সাধারণত বাইরের দিকে ঘুরে যায়, তাকে বলে ডাইভার্জেন্ট স্কুইন্ট। পক্ষাঘাতজনিত টেরা না হলে এক্ষেত্রেও কিন্তু টেরা হওয়ার কারণ ঐ চোখে কম দেখা। সুতরাং অবিলম্বে কম দেখার কারণ নির্ণয় করতে হবে।

বেশি বয়সে সাধারণত ছানির জন্য চোখে কম দেখা গেলেও গ্লকোমা, চোখের নার্ভ শুকিয়ে যাওয়া অথবা রেটিনার কোনো দুরারোগ্য রোগও ক্ষীণদৃষ্টির কারণ হতে পারে। এখানেও, চোখ টেরা হতে শুরু করেছে দেখতে পেলেই চিকিৎসা করানো দরকার।

নয়ঃ লাল চোখ

মানুষ খুব রেগে গেলে অনেকসময় চোখ লাল হয়। রক্তচক্ষু কথাটাই সেজন্য সৃষ্টি হয়েছে। রক্তচক্ষু কথার অর্থ ক্রোধবশত আরক্ত চক্ষু। রক্তচক্ষু না বলে অনেকে রক্তআঁখি বলেন। একই মানে।

আবার, খুব কাঁদলেও চোখ লাল হয়। অনেকক্ষণ ধরে ফোঁপালে কি গুমরে কাঁদলে চোখ বেশি লাল হয়।

এই যে রেগে গেলে চোখ লাল হয় কিংবা কাঁদলে চোখ লাল হয় এ খুবই সাময়িক ব্যাপার। একটু পরে উত্তেজনা কেটে গেলেই চোখের লাল-ভাব দূর হয়ে যায়। এতে চোখের কোনো ক্ষতি হয় না। এ চোখের কোনো রোগ নয়।

কিন্তু রোগের জন্যও চোখ লাল হয়। চোখ-লাল-হওয়া অনেক রোগেরই অতি সাধারণ একটা লক্ষণ। এতই সাধারণ যে, হঠাৎ চোখ লাল হলে কেউ বড়ো একটা গুরুত্ব দেন না। মামুলি অসুখ মনে করে হাতের কাছে যদি কোনো চোখের ওষুধ পান তারই দু-চার ফোঁটা চোখে ফেলে দেন কিংবা টোটকা-টাটকা করেন অথবা কিছুই করেন না। চোখ একটু বেশি লাল হয়ে ফুলে উঠে কষ্ট দিতে শুরু করলে 'জয় বাংলা'-র আক্রমণ ভেবে বাজার-চলতি কোনো ওষুধ ব্যবহার করে নিশ্চিন্ত থাকার চেষ্টা করেন।

এই যে নিশ্চিন্ত থাকার চেষ্টা এর ফল অনেকসময় মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। গোড়ায় যা সামান্য চোখ-ওঠার জন্য লাল ভাবা গিয়েছিল, পরে দেখা যায় সে এক মারাত্মক চোখের রোগ। ঠিক সময় চিকিৎসা না করার জন্য অনেকক্ষেত্রেই এইসব চোখ চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।

কর্নিয়া ছাড়া চোখের সামনের দিকের সবটাই অর্থাৎ চোখের সামনের দিকের সাদা অংশটা পাতলা ঝিল্লী দিয়ে ঢাকা থাকে। এই ঝিল্লীর নাম কনজাংটাইভা। চোখের সামনের শিরা-উপশিরাগুলি এই ঝিল্লীর মধ্যে থাকে। এই ঝিল্লী অত্যন্ত সংবেদনশীল, খুব সহজেই তাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তখন তা লাল হয়ে ওঠে, চোখ লাল দেখায়।

সামান্য ঠাণ্ডায় বা গরমে, ধোঁয়ায় বা বাতাসের ঝাপটায় অথবা রাত্রিজাগরণের ক্লান্তিতে, এমন কি শরীরের কোনো অসুস্থতাতেও চোখ লাল

হয়। অনেকের চোখ স্নানের পর লাল হয়। পুকুরে বা নদীতে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে চোখ লাল হয়। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ জোর দিয়ে চোখের কাজ করলে, যেমন বই পড়লে, সেলাই করলে কি উল বুনলে চোখ লাল হয়। এই ধরনের চোখ-লাল-হওয়া খুবই সাময়িক ব্যাপার, লাল হওয়ার কারণ দূর হলেই চোখ আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি থেকেও চোখ লাল হয়। গ্রীষ্মকালে ছোটো ছেলেমেয়েদের অসহনীয় চুলকোনির সঙ্গে চোখ-লাল-হওয়া একটা সাধারণ অসুখ, এই অসুখকে বলে ভার্নাল কনজাংটিভাইটিস। এছাড়াও শিশুদের চোখে ফুস্কুড়ির মতো গুটি হয়ে চোখ লাল হতে পারে, তাকে বলে ফ্লিকটেনিউলার কনজাংটিভাইটিস। এইসব অসুখে সাধারণত চোখের কোনো ক্ষতি হয় না।

সাব-কনজাংটাইভাল হীমারেজের কারণে চোখে রক্তপাত হলে অথবা চোখে ধুলো, বালি, কয়লার গুঁড়ো বা ছোটো পোকামাকড় পড়লে চোখ লাল হয়ে ওঠে। খুব জোরে কাশলেও অনেকসময় চোখ লাল হয়। শিশুদের হুপিং কাশি হলে প্রায়ই চোখ লাল হতে দেখা যায়। এইরকম রক্তপাতজনিত চোখ-লাল-হওয়া মারাত্মক কিছু নয়, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই চোখ এমনিতেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিন্তু চোখ যখন কোনো ভাইরাস বা জীবাণুর আক্রমণে লাল হয় তখন বেশ ভোগায়। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে চোখ সহজে সারতে চায় না। রোগ যদি কেবল কনজাংটাইভার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তাহলে অবশ্য ভয়ের কিছু থাকে না, চোখে কষ্ট হলেও চোখ নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয় না। কিন্তু কনজাংটাইভার কাছেই যে কর্নিয়া তাতে যদি রোগ সঞ্চারিত হয় তাহলে বিপদ প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

কর্নিয়ায় আক্রমণ আগে থেকে রোধ করতে না পারলে কর্নিয়া অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়। তাই চোখ লাল হলে একেবারে প্রথমেই ডাক্তার দেখানো দরকার। ডাক্তারই পরীক্ষা করে বুঝতে পারবেন রোগ কনজাংটাইভার মধ্যেই আবদ্ধ আছে, না কর্নিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেইমতো তিনি চিকিৎসা করবেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, হাতের কাছে কোনো চোখের ওষুধ পেলে না জেনেশুনে তা ব্যবহার করলে ফল মারাত্মক হতে পারে। চোখের অনেক ওষুধে স্টেরয়েড জাতীয় জিনিস থাকে, ভাইরাস-জনিত রোগে সেই ওষুধ ব্যবহার করলে কর্নিয়ায় ভয়ঙ্কর রকমের আলসার হতে পারে এবং তার জন্য চোখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কনজাংটাইভায় যখন ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি কোনো জীবাণুর আক্রমণ ঘটে তখন কনজাংটাইভা ও চোখের পাতার ভিতরের অংশে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। অনেকসময় চোখে সবুজাভ সাদা রঙের পুঁজ জমে, চোখের পাতা ফুলে যায়। পুঁজ শুকিয়ে চোখের পাতা দুটো আটকেও দেয় অনেকসময়। কখনও কখনও এক চোখে অথবা দু চোখেই জ্বালা করে। এই রোগকে বলে কনজাংটিভাইটিস। কনজাংটিভাইটিস সাধারণত 'চোখ ওঠা' নামেই বেশি পরিচিত।

কনজাংটিভাইটিস অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সাধারণত আঙুলের মাধ্যমে এই রোগের জীবাণু চোখে সংক্রামিত হয়। তোয়ালে গামছা ইত্যাদির মাধ্যমেও হয়। এই রোগের জীবাণু খুব সহজেই একজন থেকে আর-একজনে ছড়ায়। সুতরাং কারও কনজাংটিভাইটিস হলে তার ধারেকাছে যাওয়া উচিত নয়, তার তোয়ালে গামছা ইত্যাদি ব্যবহার করা তো দূরের কথা।

কনজাংটিভাইটিসের প্রধান চিকিৎসা চোখ পরিষ্কার রাখা। পরিষ্কার গরম জলে পরিষ্কার তুলো বা ন্যাকড়া ভিজিয়ে বারে বারে চোখের পুঁজ পরিষ্কার করে দিতে হয়। সবসময় লক্ষ্য রাখতে হয় চোখে যেন পুঁজ না জমে। চোখ পরিষ্কার করে ডাক্তারের নির্দেশমতো চোখে মলম বা ওযুধ লাগাতে হয়। অবস্থার যদি তাড়াতাড়ি উন্নতি না হয় তাহলে আবার ডাক্তার দেখাতে হয়।

কনজাংটাইভায় জীবাণুর আক্রমণ ছাড়াও কোনো রোগের কারণে চোখ লাল হতে পারে। আইরাইটিস ও গ্লকোমা নামে চোখের দুটি সাঙ্ঘাতিক রোগ আছে। এই রোগ দুটির লক্ষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু দুটি রোগেই গোড়ায় চোখ লাল হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া রোগের প্রথম অবস্থায় কনজাংটিভাইটিস, আইরাইটিস ও গ্লকোমায় পার্থক্য করা শক্ত। তাই চোখ লাল হলেই ডাক্তার দেখানো উচিত।

কনজাংটিভাইটিস কোনোরকম চিকিৎসা না করালেও কয়েকদিনের মধ্যেই সাধারণত সেরে যায়, কিন্তু আইরাইটিস ও গ্লকোমায় এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত নয়। যত দেরি হবে তত বিপদ বাড়বে। সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে আইরাইটিস ও গ্লকোমায় অন্ধত্ব অনিবার্য।

আইরাইটিস হল আইরিসের ইনফ্ল্যামেশন। আইরাইটিস হঠাৎও হতে পারে, ধীরে ধীরেও হতে পারে। কোনো ইনফেকশন বা আঘাতের কারণেই আইরাইটিস হয়। আইরাইটিস হলে চোখ দিয়ে প্রচুর জল পড়ে, জোরাল আলোয় চোখে কষ্ট হয় এবং চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। আইরাইটিসে চোখে পুঁজ হয় না, কিন্তু যন্ত্রণা হয় এবং সেই যন্ত্রণা অনেকসময় কপালে

ও কপালের দু পাশের রগে ছড়িয়ে পড়ে। একে বলে 'মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি'। এই অবস্থা হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো উচিত।

যে কারণেই চোখ লাল হোক, কখনও তা হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। চোখ লাল হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার যে, ঐ লাল-হওয়া মারাত্মক কিছু নয়; আইরাইটিস, গ্লকোমা বা কর্নিয়ার ঘা নয়–শুধু কনজাংটাইভার প্রদাহ, চলতি কথায় যাকে 'চোখ ওঠা' বা 'জয় বাংলা' বলে তা-ই। অতএব ভয়ের কিছু নেই।

দশ : চোখে আঘাত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সে দেশে প্রতি বছর দশ লক্ষের উপর মানুষ চোখের আঘাতে ভোগে এবং হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে যেসব আঘাতের চিকিৎসা হয় তার মধ্যে চোখের আঘাতের চিকিৎসাই হয় সবচেয়ে বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চোখের আঘাতের শতকরা ৪৫ ভাগ ঘটনাই ঘটে বাড়িতে এবং সে দেশে চোখের আঘাতের যত ঘটনা ঘটে তার শতকরা ৯০ ভাগই নিবারণ করা যায়।

আমাদের দেশে তেমন কোনো সমীক্ষা না হলেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, চোখের আঘাতের ঘটনা আমাদের দেশেও কিছু কম নয় এবং অধিকাংশ ঘটনাই নিবারণযোগ্য।

বাড়িতে, স্কুলে, অফিসে, কলকারখানায়, খেলার মাঠে, এমন কি পথেঘাটেও হঠাৎ চোখে আঘাত লাগতে পারে। যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় চোখে আঘাত লাগতে পারে। সেই কারণে সবসময়েই চোখ বাঁচিয়ে চলা দরকার। মনে রাখা দরকার, অধিকাংশ চোখের আঘাতই খুব সহজে নিবারণ করা যায়। সব আঘাত অনিবার্য নয়। বেশির ভাগ আঘাতের কারণ অসাবধানতা।

ছোটো ছেলেমেয়েদের বেশির ভাগ চোখের আঘাতের কারণ বড়োদের অসাবধানতা। বড়োরা যেখানে-সেখানে ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, উল বোনার কাঁটা ইত্যাদি ফেলে রাখেন আর ছোটোরা তা নিয়ে খেলতে গিয়ে অনেকসময় বিপত্তি বাধায়। ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, কাঁটা ইত্যাদি নিয়ে খেলতে গিয়ে শিশুরা অন্ধ হয়েছে এমন ঘটনা খুব বিরল নয়।

ডাংগুলি বা গুলতির আঘাত চোখের পক্ষে মারাত্মক, তবু ছোটোদের এই ধরনের জিনিস নিয়ে খেলতে বড়োরা নিষেধ করেন না। বাজি-পটকায় শুধু আগুন ধরে না, দেহও পুড়ে যায় ; তার চেয়েও বড়ো কথা, অনেকসময় চোখ নষ্ট হয়—তবু বড়োরা কালীপুজোর সময় সানন্দে সাগ্রহে ছোটোদের বাজি কিনে দেন। অনেকে মনে করেন, তারাবাজি নিরাপদ, তাই একেবারে শিশুদের হাতেও জ্বলন্ত তারাবাজি তুলে দেন। কিন্তু তারাবাজির ফুলকি চোখে এসে লাগলে চোখের বিপদ ঠেকানো মুশকিল।

টেলিভিশনে রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ দেখে তীরধনুক নিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে গিয়ে শিশু চিরদিনের জন্য চোখের দৃষ্টি হারিয়েছে সে ঘটনা খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তবু বড়োরা সাবধান হন নি।

স্কুলকলেজের ল্যাবরেটরিতে ছেলেমেয়েরা যখন কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল আরম্ভ করে, মাস্টারমশাইদের বারবার করে বলে দেওয়া উচিত, অ্যাসিডে জল ঢালবে না, অ্যাসিডে জল মেশাতে হলে জলে অল্প অল্প করে অ্যাসিড ঢালবে আর চোখ দূরে রাখবে।

কোনো কোনো অ্যাসিড জল পড়লেই টগবগ করে ফুটে ওঠে এবং চলকে বাইরে পড়ে। চলকে চোখে গিয়ে যদি পড়ে তাহলে চোখের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতার একটি নাম-করা কলেজের একজন নাম-করা ছাত্র এইভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করে দেওয়ায় চোখের দৃষ্টি অনেকখানিই সে ফিরে পেয়েছিল।

বারাণসীর একটি কলেজের একজন ছাত্র সম্পূর্ণ অন্ধই হয়ে গিয়েছিল। আসলে সে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'-র শিকার হয়েছিল। ল্যাবরেটরিতে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল করতে গিয়ে কীকরে যেন কনসেনট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড ছিটকে তার চোখে মুখে মাথায় এসে পড়েছিল। সে চিৎকার করে উঠতেই তার সহপাঠীরা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল, তারপর তাদের মনে পড়েছিল অ্যাসিডে অ্যালক্যালি দিয়ে অ্যাসিড নিউট্র্যালাইজ করা যায়। অমনি তারা শেল্ফ্ থেকে একটা অ্যালক্যালির বড়ো জার তার মাথায় ঢেলে দিয়েছিল। তার ফল হয়েছিল মারাত্মক। অ্যাসিডে যতখানি-না ক্ষতি হয়েছিল তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি ক্ষতি হয়েছিল এই অ্যালক্যালিতে। তার চোখ মুখ মাথা একেবারে পুড়ে গিয়েছিল। কলকাতায় একজন নাম-করা চক্ষুচিকিৎসকের কাছে তাকে যখন চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল তখন তার গোটা মাথাটা একটা বড়ো তোয়ালে দিয়ে জড়ানো ছিল। চিকিৎসক তোয়ালে খুলেই চমকে উঠেছিলেন, এমন 'বীভৎস' দৃশ্য জীবনে কখনও তিনি দেখেন নি। তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু পারেন নি। অনেক চিকিৎসার পর তার চোখে তিনি প্লাস্টিক কর্নিয়া বসিয়েছিলেন। প্রথমে তাতে ঝাপসা দেখতে পেলেও ছেলেটি শেষে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্লাস্টিক কর্নিয়া তার চোখ নেয়নি, 'রিজেক্ট' করেছিল। এই 'রিজেকশন'-এর দরুন আজও মানুষের শরীরে অনেক অঙ্গসংস্থাপন সফল হয় নি।

অ্যাসিড ও অ্যালক্যালি দুই-ই চোখের পক্ষে মারাত্মক। এই ধরনের

রাসায়নিক নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, সবসময়েই তাঁদের সাবধানে থাকতে হয়। চুনও একটি মারাত্মক রাসায়নিক দ্রব্য। চোখে চুন পড়লে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যাঁরা চুনকামের কাজ করেন তাঁরা সাবধান। সাধারণ মানুষ যত রাসায়নিক নিয়ে কাজ করেন তার মধ্যে অ্যাসিড, অ্যালক্যালি আর ক্ষার চুনেই চোখের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। প্রতি বছর দোলের সময় বিষাক্ত রঙের কারণে বহু চোখ নষ্ট হয়। আবিরেও অনেকসময় বিষাক্ত দ্রব্য থাকে, সুতরাং আবিরও নিরাপদ নয়।

কলকারখানায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের চোখে প্রায়ই আঘাত লাগে। গ্রাইণ্ডিং মেশিন অর্থাৎ শান দেবার যন্ত্রে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের চোখেই আঘাত লাগে বেশি। শানযন্ত্র থেকে লোহার কণা ছিটকে এসে চোখের কর্নিয়ায় গেঁথে যায়। অনেকসময় লোহার কণা এত জোরে এসে কর্নিয়ায় আঘাত করে যে, কর্নিয়া ভেদ করে তা চোখের ভিতরে চলে যায়। তাতে চোখের ভিতরের অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইভাবে দুটি চোখই একসঙ্গে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যদি একটি চোখে আঘাত লাগে এবং সেই চোখটি নষ্ট হয় তাহলে অন্য ভালো চোখটিও কিছুদিনের মধ্যে নষ্ট হতে পারে। একে বলে সিমপ্যাথেটিক অফথ্যালমিয়া। এই ধরনের চোখের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য গগ্‌ল্‌স্ ব্যবহার করা যেতে পারে। গগ্‌ল্‌স্ ব্যবহার করে অতি সহজেই এই ধরনের আঘাত থেকে চোখ বাঁচানো সম্ভব।

চোখে যদি জোরে লাঠি, ঘুসি বা ঢিল এসে লাগে তাহলে চোখের ভিতর রক্তক্ষরণ হতে পারে, রেটিনা ছিঁড়ে যেতে পারে অথবা অকালে ছানি পড়তে পারে। এই ধরনের আঘাত কখনও কখনও সাধারণ মনে হলেও পরিণামে অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। তাই চোখে আঘাত লাগলেই অবিলম্বে চোখ পরীক্ষা করানো দরকার।

যাঁরা কৃষিকাজ করেন তাঁরাও সাবধান। ধানের শীষে চোখের কর্নিয়া কেটে যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, যে কোনো আঘাতেই স্বচ্ছ কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে গিয়ে অন্ধত্ব ঘটাতে পারে।

পথেঘাটে প্রায়ই ধুলো, বালি, কাঁকর, কয়লার গুঁড়ো কিংবা ক্ষুদে পোকা চোখে এসে পড়ে এবং বেশির ভাগ সময়েই জলের ঝাপটা দিলে এগুলি বেরিয়ে যায়। কিন্তু কখনও কখনও কর্নিয়ায় গেঁথে যায়। চোখ রগড়ালে আরও বেশি করে গাঁথে। যত ছোটো জিনিসই হোক, কর্নিয়ার মধ্যে গেঁথে গেলে ক্ষত সৃষ্টি হয়। অচিরে সেই ক্ষত বিষিয়ে ওঠে এবং তার ফলে পুরো কর্নিয়াই

পচে যায়। তখন অনিবার্য অন্ধত্ব। অতএব চোখে কিছু পড়লে কখনই চোখ রগড়ানো উচিত নয়, আস্তে করে জলের ঝাপটা দিয়ে অথবা পরিষ্কার কাপড়ের খুঁট দিয়ে তা বার করে ফেলা উচিত। যদি এইভাবে তা বার না হয় তাহলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো দরকার।

চোখে সামান্য আঘাত লাগলেও ডাক্তার দেখানো দরকার। কারণ, আঘাত সামান্য কিনা বেশির ভাগ সময়েই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন না। চোখ এমন জিনিস যে, একটুতেই অত্যধিক যন্ত্রণা হয়। চোখের পাতার ছোট্ট একটা লোমও যদি চোখে ঢোকে কিংবা অতিক্ষুদ্র একটা ধূলিকণাও যদি চোখে যায় তাহলে চোখে দারুণ অস্বস্তি হয়। সুতরাং চোখের আঘাত কতটা, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা অধিকাংশ সময়েই খুব কঠিন হয়। তাই ফার্স্ট এড অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসার পরই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো উচিত।

সবসময়েই মনে রাখবেন, Prevention is the first step towards avoiding eye injuries, অর্থাৎ চোখের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য প্রথমেই যা করা দরকার তা হল চোখে যাতে আঘাত না লাগে তা দেখা। তার জন্য কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলবেন।

বাড়িতে যখনই কোনো স্প্রে-র পাত্রে চাপ দেবেন, আগে দেখে নেবেন স্প্রে-র মুখটা আপনার দিক থেকে ঘোরানো আছে কিনা। কোনো ক্লীনিং ফ্লুইড, ডিটারজেন্ট, অ্যামোনিয়া অথবা কড়া রাসায়নিক ব্যবহার করার আগে পাত্রের গায়ে লেখা নির্দেশগুলি ভালো করে পড়ে নেবেন এবং এইসব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করার পর ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলবেন। রান্নার সময় কড়াই থেকে গরম তেল ছিটকে যাতে চোখে এসে লাগতে না পারে সেজন্য বাঁ হাতে একটা ঢাকনা ধরবেন। এতে যদি অসুবিধা বোধ করেন তাহলে চোখে গগ্‌ল্‌স্‌ পরে নিতে পারেন।

কারখানায় টুকরোটাকরা অনেককিছুই আচমকা উড়ে এসে চোখে লাগতে পারে এবং তাতে চোখের ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং কাজ শুরু করার আগেই সাবধান হবেন। মনে রাখবেন, শুধু উড়ন্ত কণাই নয়—ধোঁয়া, ধুলো, আগুনের ফুলকি, এমন কি চলকে-পড়া রাসায়নিক দ্রব্যেও আপনার চোখের ক্ষতি হতে পারে। তাই প্রয়োজনমতো 'সেফটি গ্লাস' পরে নেবেন।

বাড়ির বাগানে অথবা ক্ষেতে-খামারে কাজ করার সময়েও সাবধান। শুধু যন্ত্রপাতি আর সার-কীটনাশকেই নয়, গাছের পাতার শীষের আঘাতে অথবা গাছের ডালের খোঁচাতেও চোখ নষ্ট হতে পারে। রোয়া লাগাবার সময়

এবং নিড়েন দেবার সময় বেশি করে সাবধান, কারণ তখন নিচু হয়ে কাজ করতে হয়, গাছের পাতায় চোখ ঠেকে যেতে পারে। চোখে শুঁয়োপোকা পড়েও চোখ নষ্ট হতে পারে।

খেলাধুলা এখন যত বাড়ছে, চোখের আঘাতের ঘটনাও তত বেশি ঘটছে। বিশেষ করে, র‍্যাকেট-বল, স্কোয়াশ আর টেনিস খেলায়। সুতরাং যে খেলার যে নিয়ম, মেনে চলবেন—সেফটি গ্লাস, প্রোটেকটিভ ক্যাপ, হেলমেট, ফেস প্রোটেকটর ইত্যাদি যেখানে যা পরার, অবশ্যই পরবেন। সেফটি রুল মানবেন।

মনে রাখবেন, সমস্ত বাজি-পটকাই সমস্ত বয়সের মানুষের ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক হতে পারে, শিশুদের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে পারে। তাই বিস্ফোরক বাজি পোড়াবেন না, শিশুদের বাজি ধরাতে দেবেন না। অন্য কেউ বাজি ধরাতে থাকলে তার ধারেকাছে দাঁড়াবেন না।

শিশুদের সম্বন্ধে বেশি করে সাবধান হবেন। তাদের অনেক খেলনাই বিপদ ঘটাতে পারে। অনেক আধুনিক খেলনা ঠিকভাবে না খেললে তার ফল ভয়ানক হতে পারে। সুতরাং হিসাব করে দেখেশুনে শিশুদের খেলনা কিনে দেবেন। খেলনা কেনার সময় তাদের বয়স ও দায়িত্ববোধ কীরকম সেদিকে খেয়াল রাখবেন। বিপদ ঘটতে পারে এমন খেলনা নিয়ে তারা যখন খেলবে, কাছে দাঁড়িয়ে থাকবেন। লেখাপড়ার কাজে তাদের ছুরি কাঁচি পেন্সিল লাগবেই, সুতরাং কীভাবে ছুরি কাঁচি পেন্সিল ধরতে হয়, শিখিয়ে দেবেন।

কথায় আছে 'সাবধানের মার নেই', কিন্তু সাবধানেরও মার আছে। সাবধানতা সত্ত্বেও কখনও কখনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দৈবাৎ যদি চোখে আঘাত লাগে, তা সে যত সামান্যই মনে হোক না কেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন ডাক্তার দেখাবেন। মনে রাখবেন, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যদি চোখের আঘাতের সঠিক চিকিৎসা হয় তাহলে অনেকসময়েই চোখের দৃষ্টি বাঁচানো যায়।

চোখে কতখানি আঘাত লেগেছে এবং তার দরুন চোখের কতখানি ক্ষতি হয়েছে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা কঠিন বলেই চক্ষুবিশেষজ্ঞের শরণ নিতে হয়। কিন্তু চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে যেতে কিছুটা অন্তত সময় তো লাগবেই, তাই ফার্স্ট এড দরকার। ফাস্ট এড দেবার পর কালবিলম্ব না করে চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত। সবসময় কাছাকাছি চক্ষুবিশেষজ্ঞ না-ও পাওয়া যেতে পারে। তখন যে কোনো ডাক্তারের কাছে যাবেন। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগেও যেতে পারেন।

ফাস্ট এড সম্বন্ধে সকলেরই কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। এখানে কয়েকটি ফার্স্ট এডের কথা বলা হল, চেষ্টা করে মনে রাখবেন—

১. চোখে যদি ধুলো, বালি, কাঁকর, কয়লার গুঁড়ো বা এই ধরনের কিছু পড়ে, ভুলেও চোখ ডলবেন না। তাতে চোখের ক্ষতি হতে পারে। কর্নিয়া যদি সামান্যও ছড়ে যায় তাহলে ব্যাকটিরিয়া, ফাঙ্গাস বা ভাইরাসের আক্রমণে বিষিয়ে যেতে পারে। তখন অন্ধত্ব ঠেকানো মুশকিল। তাই চোখে কিছু পড়লে আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন, তারপর আস্তে করে চোখে পরিষ্কার জলের ঝাপটা দেবেন। অনেকসময় এতেই চোখের ধুলোবালি বেরিয়ে আসে। যদি না আসে তাহলে সামান্য ভিজে তুলো কিংবা ভিজে কাপড় দিয়ে খুঁট পাকিয়ে কণাটা বার করে আনতে পারেন। কখনও কখনও কণা চোখের পাতার তলায় চলে যায়, বাইরে থেকে দেখা যায় না। তখন আস্তে করে পাতাটা টেনে চোখ ফাঁক করে ধরবেন, তারপর এই চোখটা না ডলে অন্য চোখটা আস্তে করে ডললে দু চোখেই জল আসবে। সেই জলে কণাটা ধুয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। নিচের পাতার তলা থেকে কণা বার করে আনা অনেক সহজ। কিন্তু কণা যদি উপরের পাতার তলায় চলে যায় তাহলে অনেকসময় মুশকিল হয়। তখন চোখের উপরের পাতাটা টেনে নিচের পাতার উপর ধরবেন। তাতে নিচের পাতার লোম উপরের পাতার তলা থেকে ঐ ছোট্ট কণাটা ঝাঁট দিয়ে বার করে আনবে। এবার কয়েকবার চোখ পিটপিট করলেই কণাটা বেরিয়ে আসবে। যদি বেরিয়ে না আসে তাহলে চোখ বুজে থাকবেন এবং চোখ বুজেই ডাক্তারের কাছে যাবেন।

২. চোখে যদি কোনোকিছুর গুঁতো লাগে, ঘুসি লাগে কিংবা ঢিল লাগে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চোখে বরফ চাপা দেবেন। হাতের কাছে বরফ না পেলে ঠাণ্ডা জলের কম্প্রেস দেবেন। মিনিট পনের এইভাবে থাকলে চোখে বেশি ব্যথা হতে পারবে না, চোখ বেশি ফুলতেও পারবে না। চোখে যদি কালশিটে পড়ে কিংবা চোখের দৃষ্টি যদি ঝাপসা হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে চোখের ভিতরে হয়তো রক্তক্ষরণ হয়েছে। তখন মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে ডাক্তারের কাছে যাবেন।

৩. চোখে কিংবা চোখের পাতায় যদি কিছু গেঁথে যায় তাহলে কখনই তা টেনে বার করে আনার চেষ্টা করবেন না। টেনে বার করে

আনতে গেলে চোখের আরও ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং কোনোরকম কারিকুরি না করে চোখের মধ্যে জিনিসটা যেমন আছে তেমনি রেখে চোখের উপর আলতো করে একটা তুলোর প্যাড লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবেন। চোখে চাপ দেবেন না একেবারে।

৪. চোখে যদি কাটাছেঁড়ার ঘটনা ঘটে, কখনও জোর করে চোখের পাতা টেনে চোখ খুলে তা দেখার চেষ্টা করবেন না। এই সময় চোখ যত কম ঘোরানো যায় তত ভালো। চোখে চাপ পড়লে ক্ষতি, তাই চোখ ডলবেন না মোটে। চোখ ডললে চোখের কাটাছেঁড়া বেড়ে গিয়ে চোখের আরও বেশি ক্ষতি করতে পারে। তাই এসব কিছু না করে চোখের উপর স্টেরাইল গজ কিংবা তুলো দিয়ে তার উপর একটা ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবেন।

৫. চোখে যদি অ্যাসিড, অ্যালকালি বা অন্য কোনো রাসায়নিক এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চোখে ঈষদুষ্ণ জলের বন্যা বইয়ে দেবেন। মনে রাখবেন, এক্ষেত্রে প্রতিটি সেকেণ্ড জরুরী। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের দেরিতে চোখের সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হতে পারে, চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েও যেতে পারে। সুতরাং চোখে কোনো রাসায়নিক পড়লে কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল দেবেন। আঙুল দিয়ে চোখের পাতা দুটো টেনে যতখানি সম্ভব চোখ ফাঁক করে অন্তত পনের মিনিট কলের তলায় চোখটা ধরবেন অথবা কোনো পরিষ্কার পাত্র থেকে আস্তে আস্তে অবিরাম ধারায় চোখে পরিষ্কার জল ঢালবেন। বাথরুমে যদি শাওয়ার থাকে তাহলে উপর দিকে তাকিয়ে শাওয়ারের তলায় দাঁড়াতে পারেন। যদি হাতের কাছে এসব কিছু না পান তাহলে চোখ খুলে আস্তে করে চোখে পরিষ্কার জলের ঝাপটা দেবেন। যা-ই করুন না কেন, চোখে যখন জল পড়বে, যতখানি পারেন চোখ ঘোরাতে থাকবেন। তাতে চোখ ভালো পরিষ্কার হবে। চোখে কখনও আই-কাপ বা ব্যাণ্ডেজ লাগাবেন না। অন্তত পনের মিনিট চোখে জল দেবার পর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবেন।

একটা কথা মনে রাখবেন, প্রাথমিক চিকিৎসা কখনই আসল চিকিৎসা নয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারি চিকিৎসার আগে যে চিকিৎসা দেওয়া হয় তা-ই প্রাথমিক চিকিৎসা। এতে শুধু বিপদটা কমানো যায় ও আসল চিকিৎসায় সাহায্য করা যায়। তাই প্রাথমিক চিকিৎসায় থেমে থাকবেন না, প্রাথমিক চিকিৎসার পর

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণ নেবেন। চোখের আঘাতে যত তাড়াতাড়ি সঠিক চিকিৎসার আশ্রয় নেওয়া যাবে, চোখের দৃষ্টিশক্তি বাঁচানোর সম্ভাবনা তত বেশি উজ্জ্বল হবে।

প্রকৃতি আমাদের এমনভাবে সৃষ্টি করেছে যাতে সহসা চোখে আঘাত না লাগারই কথা। আমাদের চোখ দুটি বসানো আছে কোটরের মধ্যে। কেবল সামনের দিক ছাড়া কোটরের অন্যসব দিকে শক্ত হাড়। সামনের দিকে হাড় না থাকলেও চামড়ার ঢাকনা আছে। বিপদের সময় দুটি পাতায় চোখ আপনা থেকেই ঢেকে যায়, আমাদের চেষ্টা করে চোখ বুজতে হয় না। আঘাতের সম্ভাবনা দেখলেই আপনা থেকে চোখের পাতা বুজে আসে এবং চোখ দুটি উপরে উঠে যায়। ফলে, চোখ বেঁচে যায়।

বিপদের সময় ছাড়াও চোখের পাতা ধুলোবালি থেকে চোখ দুটিকে বাঁচিয়ে রাখে। অনবরত আমাদের চোখের পাতা পড়ে আর ছোটো ছোটো ধূলিকণা চোখের জলের ধাক্কায় বেরিয়ে আসে।

প্রকৃতির এই বিস্ময়কর সাহায্যের সঙ্গে আমাদের একটু সচেতনতা ও সাবধানতা যদি যোগ হয় তাহলে অনেক মারাত্মক আঘাত থেকে অনেক সহজেই চোখ দুটিকে আমরা রক্ষা করতে পারি।

এগার : লো ভিশন

হ্রস্বদৃষ্টিকে ডাক্তাররা ইংরেজী করে বলেন লো ভিশন। সাধারণ চশমায় অথবা কনট্যাক্ট লেন্সেও যখন কেউ স্পষ্ট দেখতে পান না তখন সেই দৃষ্টিকে বলা হয় হ্রস্বদৃষ্টি। হ্রস্বদৃষ্টি আর ক্ষীণদৃষ্টি কিন্তু এক নয়। ক্ষীণদৃষ্টি অনেকটা অন্ধত্বের কাছাকাছি, হ্রস্বদৃষ্টি তা নয়। হ্রস্বদৃষ্টি মানে দৃষ্টিশক্তির আংশিক হ্রাস। হ্রস্বদৃষ্টিতে দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই বজায় থাকে এবং অনেকসময়েই হ্রস্বদৃষ্টির উন্নতি ঘটানো যায়।

হ্রস্বদৃষ্টি যদিও প্রধানত বার্ধক্যের অসুখ, তবু সব বয়সের মানুষেরই এই অসুখ হতে পারে।

কয়েকরকম ব্যাধিতে চোখ এবং দর্শনতন্ত্র আক্রান্ত হলে হ্রস্বদৃষ্টি হতে পারে। জন্মগত ত্রুটি, আঘাত, দেহের কতকগুলি রোগ এবং বার্ধক্য—সবেতেই দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে পারে। হ্রস্বদৃষ্টির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে রেটিনার ক্ষত কিংবা অবক্ষয়ে। ছানি, গ্লকোমা, অপ্টিক নার্ভের ক্ষতি ইত্যাদিতেও হ্রস্বদৃষ্টি দেখা দিতে পারে।

হ্রস্বদৃষ্টির কয়েকটি সাধারণ কারণ—ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, গ্লকোমা, ক্যাট্যার‍্যাক্ট, কর্নিয়াল স্কারিং ও রেটিন্যাল ডিট্যাচমেন্ট।

ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন : রেটিনার মাঝখানে ম্যাকিউলা নামে যে স্বল্পপরিসর স্থান আছে সেখানে যদি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহলে মধ্যদৃষ্টি হ্রাস পায়। অর্থাৎ, তখন কোনো জিনিসের মাঝখানটা স্পষ্ট দেখা যায় না। তার ফলে লেখাপড়া করতে বা অন্য কোনো চোখের কাজ করতে অসুবিধা হয়।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি : ডায়াবিটিজ অর্থাৎ মধুমেহ রোগের কারণে চোখের পিছনদিকের রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলি থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে অথবা সেগুলি ফুলে যেতে পারে। তার ফলে চোখের মধ্যে অনেক স্কার টিস্যু গজিয়ে দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দিতে পারে।

গ্লকোমা : চোখের মধ্যে চাপ বৃদ্ধি পেলে অপ্টিক নার্ভ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং তার দরুন চোখের সাইড ভিশন অর্থাৎ পার্শ্বদৃষ্টি হ্রাস পেতে পারে।

ক্যাট্যার‍্যাক্ট : চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেলে তার ভিতর দিয়ে ভালোভাবে আলো প্রবেশ করতে পারে না। ফলে, সবকিছু ঝাপসা এবং অস্পষ্ট দেখায়। অস্ত্রোপচার করে অস্বচ্ছ লেন্সটা কেটে ফেলে দিলে দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটে।

কর্নিয়াল স্কারিং : স্কার মানে ক্ষতচিহ্ন। কোনো আঘাতে অথবা রোগজীবাণুর আক্রমণে স্বচ্ছ কর্নিয়ায় ক্ষত সৃষ্টি হলে ক্ষত শুকিয়ে যাবার পরে অস্বচ্ছ ক্ষতস্থানের দরুন দৃষ্টি ঝাপসা ও অস্পষ্ট হয়ে যায়।

রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট : কোনো কারণে চোখের রেটিনা যদি স্থানচ্যুত হয় তাহলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়। এই ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে যদি অপারেশন করা যায় তাহলে দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

এসব ছাড়া আরও কতকগুলি কারণে হ্রস্বদৃষ্টি হতে পারে। যেমন—স্ট্রোক, মাল্টিপ্‌ল্ স্ক্লেরোসিসের মতো নার্ভের অসুখ, চোখে অথবা মস্তিষ্কে আঘাত, রেট্রোলেণ্টাল ফাইব্রোপ্লাসিয়ার মতো বংশগত ত্রুটি (এ একরকম রেটিনার ক্ষত, অকাল-জাত শিশুদের চোখের রেটিনাতেই প্রধানত এই ক্ষত দেখা যায়), এবং রেটিনাইটিস পিগমেণ্টোসা (এ একরকম রেটিনার ক্ষয়, এই ক্ষয়ের দরুন আস্তে আস্তে চোখের পার্শ্বদৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়)।

হ্রস্বদৃষ্টির সঠিক কারণ ও ঠিক কী পরিমাণ হ্রস্বদৃষ্টি ঘটেছে তা নির্ণয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চোখ পরীক্ষা করা দরকার। এ কোনো সাধারণ চিকিৎসকের কাজ নয়, কেবল চক্ষুবিশেষজ্ঞরাই একাজে পারদর্শী। চোখ পরীক্ষা করে তাঁরাই বলতে পারেন, হ্রস্বদৃষ্টি নিরাময়ে ওষুধে কাজ হবে, না অস্ত্রোপচার করতে হবে।

ভিটামিনে, পুষ্টিকর খাদ্যে, চোখের ব্যায়ামে, আই-ড্রপে কিংবা চোখের মলমে হ্রস্বদৃষ্টি সারে না। সুতরাং নিজে অথবা হাতুড়ে চিকিৎসকের নির্দেশে এইসব চিকিৎসা না করে চক্ষুবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। একেবারে প্রথমেই যদি চক্ষুবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হয় তাহলে অনেকসময় উপকার পাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করে দৃষ্টিশক্তির অসাধারণ উন্নতি ঘটানো যায়। ছানির জন্য যদি হ্রস্বদৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে ছানি কেটে ফেলে দিলে দৃষ্টিশক্তির অবিশ্বাস্যরকম উন্নতি ঘটে।

তবে হ্রস্বদৃষ্টির খুব বেশি চিকিৎসা নেই। অনেক হ্রস্বদৃষ্টি ওষুধেও সারে না, অস্ত্রোপচারেও সারে না। এইসব ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে যদি 'লো-ভিশন এড' দেওয়া যায় তাহলে লেখাপড়া ও দৈনন্দিন সাধারণ কাজে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

মনে রাখবেন, সাধারণ চশমায় অথবা কনট্যাক্ট লেন্সে যদি স্পষ্ট দেখা না যায় তাহলে হ্রস্বদৃষ্টি ঘটেছে বলে সন্দেহ করা যেতে পারে এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুবিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। চক্ষুবিশেষজ্ঞ যদি 'লো-ভিশন অপ্টিক্যাল এড' নিতে বলেন তাহলে তা নিতে হবে।

'লো-ভিশন অপ্টিক্যাল এড' আসলে বিশেষ ধরনের লেন্স। এই লেন্সে যে জিনিসটা আপনি দেখতে চাইবেন সেই জিনিসটাকে বড়ো করে দেখাবে। এইরকম অসংখ্য লেন্স আছে এবং কোনো জিনিসকে বড়ো করে দেখাবার ক্ষমতাও তাদের বিভিন্ন রকম। হ্রস্বদৃষ্টিতে চোখে যেটুকু দৃষ্টি অবশিষ্ট থাকে, এই লেন্সের সাহায্যে সেই দৃষ্টিকেই যতখানি সম্ভব কাজে লাগানো হয়।

তবে একটা 'অপ্টিক্যাল এড'-এ চোখের সব কাজ হয় না। এক-এক কাজের জন্য এক-এক ক্ষমতার 'অপ্টিক্যাল এড'-এর দরকার হয়। সেজন্য একজনকে একসঙ্গে অনেকগুলি 'অপ্টিক্যাল এড' কিনতে হতে পারে—কোনোটা কাছে দেখার জন্য, কোনোটা দূরে দেখার জন্য।

কাছে দেখার জন্য আছে জোরাল চশমা, হাতে-ধরা ম্যাগনিফাইং গ্লাস কিংবা স্ট্যাণ্ড ম্যাগনিফাইয়ার। আর, দূরে দেখার জন্য আছে হাতে-ধরা অথবা চশমায়-লাগানো টেলিস্কোপ।

'নন-অপ্টিক্যাল এড'-ও আছে অনেক, যেমন—বড়ো বড়ো হরফে ছাপা বই, খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি এবং বড়ো অক্ষরের টেলিফোন ডায়াল, ক্যালক্যুলেটর, তাস প্রভৃতি। ইলেকট্রনিক এড-ও আছে কিছু। কিন্তু আমাদের দেশে কী কী পাওয়া যায় সে-ই হচ্ছে কথা।

বার : ক্যাট্যার‍্যাক্ট

ক্যাট্যার‍্যাক্টকে বাংলায় বলে ছানি। ছানি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে অনেক ভুল ধারণা আছে। বহু লোকের ধারণা, ছানিতে চোখের উপর একটা সাদা পর্দা পড়ে। ছানি পড়া কথাটা থেকেই এই ধারণার আভাস পাওয়া যায়। বহুলপ্রচলিত একটি বাংলা অভিধানে ছানি অর্থে লেখা হয়েছে, ''অক্ষি-তারকার উপরে শ্বেত ঝিল্লীর যে আবরণ পড়িয়া দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা নষ্ট হয়।''

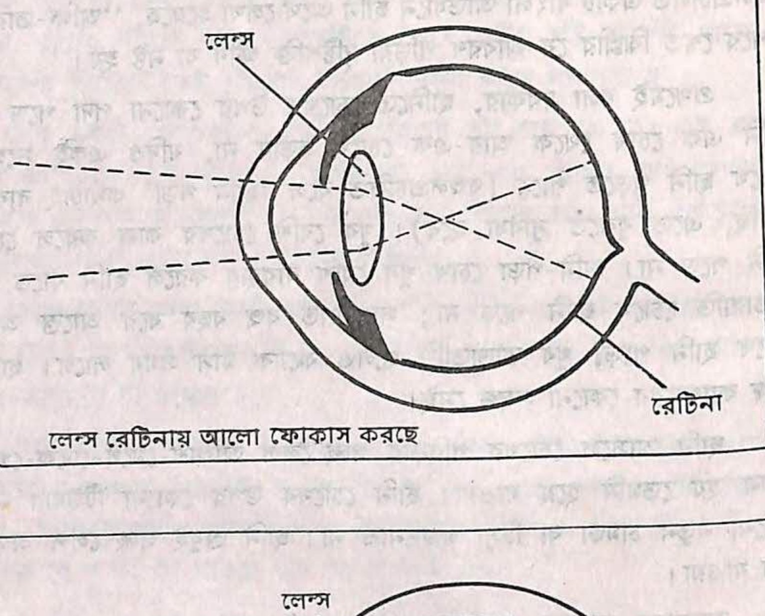
প্রথমেই বলা দরকার, ছানিতে চোখের উপর কোনো পর্দা পড়ে না। ছানি এক চোখ থেকে আর-এক চোখে ছড়ায় না, যদিও একই সঙ্গে দু চোখে ছানি পড়তে পারে (বহুলপ্রচলিত বলে 'ছানি পড়া' কথাটাই ব্যবহার করছি, এতে বুঝতে সুবিধা হবে)। খুব বেশি চোখের কাজ করলে চোখে ছানি পড়ে না। ছানি-পড়া চোখ খুব বেশি ব্যবহার করলে ছানি বাড়ে না। রাতারাতি চোখে ছানি পড়ে না; সাধারণত বহু বছর ধরে আস্তে আস্তে চোখে ছানি পড়ে, খুব তাড়াতাড়ি হলেও কয়েক মাস সময় লাগে। ছানির সঙ্গে ক্যান্সারের কোনো সম্বন্ধ নেই।

ছানি আসলে চোখের পরিষ্কার স্বচ্ছ লেন্স আকাশ-মেঘে-ঢেকে-গেলে যেমন হয় তেমনি হয়ে যাওয়া। ছানি চোখের উপর কোনো টিউমার নয়, কোনো নতুন চামড়া বা টিস্যু গজানোও না। ছানি শুধুই স্বচ্ছ লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে যাওয়া।

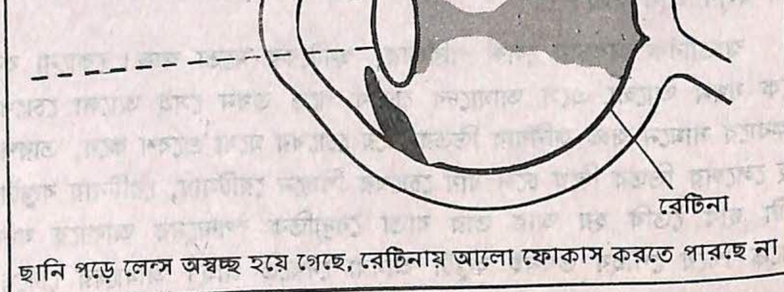
আমাদের চোখের লেন্সের বেশির ভাগই জলীয় পদার্থ—৬৫ শতাংশ জলীয় পদার্থ আর বাকি ৩৫ শতাংশ প্রোটিন ও লবণ জাতীয় পদার্থ। লেন্সটা থাকে একটা পাতলা ক্যাপসিউলের মধ্যে। লেন্স আর এই ক্যাপসিউল আশ্চর্য রকম মসৃণ আর স্বচ্ছ।

স্বাভাবিক অবস্থায় লেন্স পরিষ্কার, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। কোনো বস্তু থেকে যখন আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে তখন সেই আলো চোখের একেবারে সামনে স্বচ্ছ কর্নিয়ার ভিতর দিয়ে চোখের মধ্যে প্রবেশ করে, তারপর স্বচ্ছ লেন্সের ভিতর দিয়ে চলে যায় চোখের পিছনে রেটিনায়, রেটিনায় বস্তুটার একটা ছবি তৈরি হয় আর তার বার্তা বৈদ্যুতিক স্পন্দনের আকারে যখন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছয় তখনই বস্তুটা আমরা দেখতে পাই। আমাদের চোখের

কর্নিয়া আর লেন্সই রেটিনার উপর আলো ফোকাস করে ছবিটা তৈরি করে। লেন্স যদি স্বচ্ছ হয় তাহলে সহজেই তার ভিতর দিয়ে আলো গিয়ে রেটিনায় পড়তে পারে এবং ছবিটা স্পষ্ট হতে পারে। এখন, কোনো কারণে যদি লেন্স মেঘাচ্ছন্নর মতো হয় অর্থাৎ তার স্বচ্ছতা কমে যায় তাহলে তার ভিতর দিয়ে বেশি আলো যেতে পারে না, ফলে রেটিনায় ছবিটা স্পষ্ট হতে পারে না। ছবি কতখানি স্পষ্ট হবে তা নির্ভর করবে লেন্সের স্বচ্ছতা কতখানি কমেছে



লেন্স রেটিনায় আলো ফোকাস করছে



ছানি পড়ে লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেছে, রেটিনায় আলো ফোকাস করতে পারছে না

তার উপর, অর্থাৎ লেন্সের ভিতর দিয়ে কতখানি আলো যেতে পারছে তার

উপর। যদি খুব কম আলো যেতে পারে তাহলে ছবি খুব কম স্পষ্ট হবে, বস্তুটা ঝাপসা দেখাবে; আর যদি একেবারেই আলো যেতে না পারে তাহলে একেবারেই ছবি তৈরি হবে না, সেক্ষেত্রে অন্ধত্ব।

চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেলে কীকরে চোখের দৃষ্টি ব্যাহত হয় তা বোঝার জন্য চোখকে একটা ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। চোখ আর ক্যামেরা দুইয়েরই আলো ফোকাস করে ছবি তৈরি করার জন্য একটি করে লেন্স থাকে। ক্যামেরার লেন্স ফিল্মের উপর আলো ফোকাস করে ছবি তৈরি করে আর চোখের কর্নিয়া ও লেন্স রেটিনার উপর আলো ফোকাস করে ছবি তৈরি করে। ক্যামেরার লেন্স যদি পরিষ্কার হয় তাহলে তার মধ্য দিয়ে সহজেই আলো যেতে পারে এবং ফিল্মের ছবি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হতে পারে। ক্যামেরার লেন্স যদি ধুলোবালি পড়ে কিংবা ফাঙ্গাসে অপরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে ফিল্মের ছবি অস্পষ্ট ও ঝাপসা দেখায়। ক্যামেরার লেন্স ধুলোবালি পড়ে কিংবা ফাঙ্গাসে সম্পূর্ণ ঢেকে গেলে ফিল্মে ছবিই তৈরি হতে পারে না।

ঠিক এইভাবে, চোখের লেন্স যত অস্বচ্ছ হবে, চোখে তত কম দেখা যাবে এবং চোখের লেন্স সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হয়ে গেলে চোখে কিছুই দেখা যাবে না।

ক্যামেরার লেন্সের সঙ্গে চোখের লেন্সের পার্থক্য, ক্যামেরার লেন্স বাইরে থেকে ধুলোবালি পড়ে কিংবা ফাঙ্গাস জমে অস্বচ্ছ হয় আর চোখের লেন্স তার ভিতরের রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে অস্বচ্ছ হয়।

চোখের লেন্স কেন অস্বচ্ছ হয়ে গিয়ে চোখে ছানি পড়ে, এখনও ভালো করে জানা যায় নি। অনেক রকমের ছানি আছে এবং অধিকাংশ ছানিরই কারণ লেন্সের রাসায়নিক পরিবর্তন। লেন্সের প্রোটিনের গঠনে একটা পরিবর্তন আসে, ফলে লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন আসে, বিজ্ঞানীরা এখনও তা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারেন নি। তাঁরা দেখেছেন, বয়সের ভারে, চোখের আঘাতে, চোখের ও দেহের কোনো কোনো অসুখে এবং বংশগত বা জন্মগত ত্রুটির কারণে এই পরিবর্তন আসতে পারে।

অর্থাৎ, যে কোনো বয়সেই চোখে ছানি পড়তে পারে, ছানি বয়স মানে না। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বয়স হলে চোখে ছানি পড়তে দেখা যায়। বয়স হলে প্রকৃতির নিয়মে যেমন চুল পাকে তেমনি চোখে ছানি পড়ে। বয়সের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় চোখের লেন্সের ভিতরকার নমনীয় ও স্বচ্ছ পদার্থ শক্ত ও অস্বচ্ছ হয়ে যায়। এই যে বার্ধক্যজনিত ছানি, একে বলে সীনাইল ক্যাট্যার‍্যাক্ট।

এই জাতীয় ছানিই বেশি দেখা যায়। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেও চোখে এই ধরনের ছানি পড়তে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, ছানি বয়স মানে না। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই চোখে ছানি পড়তে পারে। শিশুদের চোখে যে ছানি পড়ে সেই ছানি সাধারণত বংশগত, বংশে যদি ছানির ইতিহাস থাকে তাহলে শিশু চোখে ছানি নিয়ে জন্মাতে পারে। আবার, শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন মায়ের যদি রুবেলা অর্থাৎ জার্মান মীজ্‌ল্‌স্ হয় তাহলেও শিশু চোখে ছানি নিয়ে জন্মাতে পারে। গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন প্রসূতি জার্মান মীজ্‌ল্‌সে আক্রান্ত হলে এই রোগের ভাইরাস গর্ভস্থ শিশুর দেহে সঞ্চারিত হতে পারে এবং তার ফলে শিশু মানসিক ও শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্মাতে পারে। সেই ত্রুটিগুলির মধ্যে একটি ত্রুটি হল চোখে ছানি। শিশুর এই যে জন্মগত ছানি, একে বলে কনজেনিট্যাল ক্যাট্যার‍্যাক্ট। আবার, মাতৃগর্ভে এবং ভূমিষ্ঠ হবার পরে শিশুর চোখের মধ্যে যখন লেন্স গড়ে উঠতে থাকে তখন রাসায়নিক কারণে লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গিয়ে ছানি পড়তে পারে। এই ধরনের ছানিকে বলে ডেভেলপমেন্ট্যাল ক্যাট্যার‍্যাক্ট।

কোনো কারণে চোখে ক্ষত সৃষ্টি হলে চোখে ছানি পড়তে পারে। চোখে যদি জোরে আঘাত লাগে, চোখ যদি কোনোভাবে কেটে-ফেটে যায় কিংবা খোঁচা লেগে ফুটো হয়ে যায় এবং তার দরুন লেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে চোখে ছানি পড়তে পারে। চোখে কোনো রাসায়নিক পদার্থ পড়ে চোখ পুড়ে গেলে লেন্সের যদি ক্ষতি হয় তাহলেও চোখে ছানি পড়তে পারে। প্রচণ্ড গরমেও অনেকসময় চোখে ছানি পড়ে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃক্ষপত্রহীন উষর প্রান্তরে রোদ্দুরে যাঁদের কাজ তাঁদের চোখে প্রায়ই ছানি পড়ে। সান-গ্লাস না পরে বেশিক্ষণ ঘরের বাইরে থাকায় সূর্যের অতিবেগুন। রশ্মিতে চোখের লেন্স নষ্ট হয়ে গিয়ে তাঁদের চোখে ছানি পড়ে। আবার, যাঁরা প্রচণ্ড উত্তাপের কাছে কাজ করেন, যেমন কারখানায় অতি উত্তপ্ত চুল্লীর ধারে, তাঁদের চোখেও ছানি পড়তে পারে। নিউক্লিয়র রেডিয়েশনেও চোখে ছানি পড়তে পারে। দিল্লির এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাঁরা উনুনে জ্বালানি হিসাবে ঘুঁটে কিংবা কাঠ ব্যবহার করেন তাঁরা 'হাই রিস্ক গ্রুপ'-এ পড়েন, অর্থাৎ তাঁদের চোখে ছানি পড়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। এই জাতীয় সব ছানিকে বলা হয় ট্রম্যাটিক ক্যাট্যার‍্যাক্ট।

কোনো কোনো অসুখে বা ইনফেকশনে চোখে ছানি পড়া খুবই সাধারণ ঘটনা। এইসব অসুখের মধ্যে আছে ডায়াবিটিজ, গ্যালাকটোসিমিয়া আর

হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজ্‌ম্‌। ডায়াবিটিজের জন্যই চোখে বেশি ছানি পড়তে দেখা যায়। দিল্লির ঐ সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাঁদের হাই ব্লাড প্রেশার আছে তাঁদের চোখে ছানি পড়ার সম্ভাবনা বেশি। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে ডায়াবিটিজ হয়। গ্যালাকটোসিমিয়া এনজাইমের অভাবজনিত রোগ আর হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজ্‌ম্‌ হরমোনের ঘাটতির কারণে ঘটে। এই যে রোগব্যাধির কারণে চোখে ছানি পড়ে, একে বলে মেট্যাবলিক ক্যাট্যার‍্যাক্ট।

ছানি কদাচিৎ এক চোখে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দু চোখেই ছানির আক্রমণ ঘটে। এক চোখে ছানি পড়লে অন্য চোখেও পড়বে, ধরেই নেওয়া যেতে পারে। তাই বলে ছানি এক চোখ থেকে আর-এক চোখে ছড়ায় না, দু চোখে স্বতন্ত্রভাবেই ছানি পড়ে।

যত রকমের ছানি আছে তার মধ্যে জন্মগত ছানি প্রতিরোধ করাই অনেকটা সহজ। সমস্ত শিশুকেই জার্মান মীজ্‌ল্‌সের টিকা দেওয়া উচিত। অল্পবয়সী মেয়েদের এই টিকা দিলে তারা নিজেরা যেমন এই ভয়াবহ ব্যাধি প্রতিরোধ করতে পারে তেমনি ভবিষ্যতে তারা যখন মা হয় তখন তাদের সন্তানেরা ছানির অভিশাপ নিয়ে জন্মায় না।

কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারীর যদি ডায়াবিটিজ অথবা ডায়াবিটিজের ইতিহাস থাকে তাহলে গর্ভকালে সবসময় তাঁকে রোগ দমন করে রাখতে হবে। আধুনিক চিকিৎসায় অল্প আয়াসেই ডায়াবিটিজ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। গর্ভাবস্থায় ডায়াবিটিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে গর্ভস্থ শিশু এই বিকট রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় যাতে হরমোনের অভাবজনিত কোনো অসুখ না হয় সেজন্য পুরো গর্ভকালে চিকিৎসকের পরামর্শমতো চলা দরকার।

অনেকরকমের ছানি আছে, কিন্তু কোনো ছানিই রাতারাতি পড়ে না। কোনো কোনো ছানি খুব আস্তে আস্তে ছড়ায়, আবার কোনো কোনো ছানি অনেক তাড়াতাড়ি ছড়ায়। খুব আস্তে আস্তে ছড়ায় যেসব ছানি সেইসব ছানি পাকতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগে আর খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায় যেসব ছানি সেইসব ছানি পাকতে সময় লাগে বেশ কয়েক মাস। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছানি প্রথমে ধরে লেন্সের ছোট্ট একটি অংশে, তারপর ধীরে ধীরে তা ছড়ায়। ছড়াতে ছড়াতে একসময় হয়তো গোটা লেন্সটাই ছেয়ে ফেলে। যদিও একই সময়ে দু চোখে ছানি ধরতে পারে, দু চোখে একই হারে সবসময় ছানি ছড়ায় না। প্রথম যখন চোখে ছানি ধরে তখন দেখতে বিশেষ অসুবিধা হয় না,

কিন্তু যখন ছানিতে পুরো লেন্স ঢেকে যায় তখন প্রায় কিছুই দেখা যায় না।

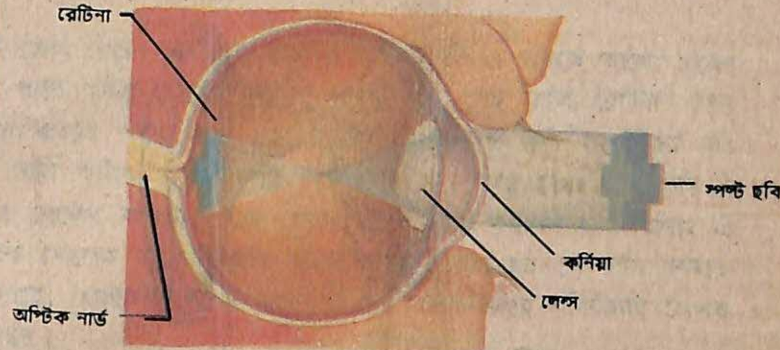
ছানির প্রধান উপসর্গ চোখে ঝাপসা দেখা। ছানি যত ছড়ায় আর যত ঘন হয়, চোখের দৃষ্টি তত ঝাপসা হয়। ছানি ধরার পর প্রথম অবস্থায় অনেকসময় 'ডাব্‌ল্ ভিশন' হয় অর্থাৎ একটা জিনিসকে দুটো দেখায়। সবকিছু মনে হয় জোড়া জোড়া। চোখ তখন আলোয় খুবই সেন্সিটিভ থাকে, একটু বেশি আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়, আলোর ঝলক সহ্য করতে কষ্ট হয়। তখন ঘন ঘন চশমা পালটাবার দরকার হয়। শেষে একসময় অনেক মোটা চশমাতেও কাজ হয় না, অর্থাৎ পুরো লেন্স তখন ছানিতে ছেয়ে গেছে। তখন প্রায় কিছুই দেখা যায় না। চোখের খুব কাছে বই ধরলে হয়তো কিছুটা পড়া যায়। চোখের কালো পিউপিল তখন সাদা দেখায়।

প্রথম যখন চোখে ছানি ধরে, অনেকসময় বোঝাই যায় না চোখে ছানি ধরেছে। ছানি কত বড়ো, কত ঘন এবং লেন্সের কোন্‌খানে ছানি ধরেছে তার উপরই নির্ভর করে প্রথমে বোঝা যাবে কি যাবে না। লেন্সের কিনারায় যদি প্রথমে ছানি ধরে তাহলে দৃষ্টি ব্যাহত হয় না, ছানি ধরেছে বোঝা যায় না। কিন্তু যদি লেন্সের মাঝখানে কোনো জায়গায় ছানি শুরু হয় তাহলে অনেকক্ষেত্রেই দৃষ্টি বাধা পায়, তখন সন্দেহ হয় চোখে হয়তো ছানি পড়তে শুরু করেছে।

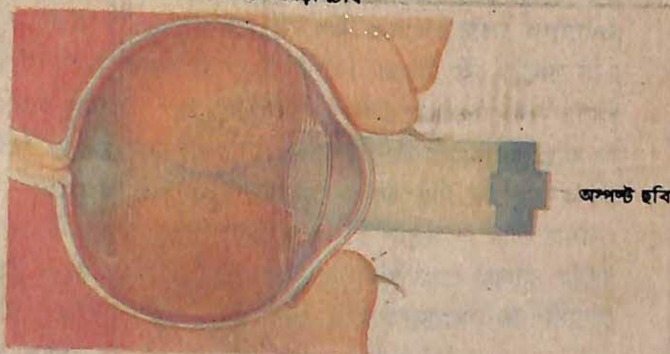
অনেকসময় ছানি বলে সন্দেহই হয় না। কারণ, প্রথম অবস্থায় ছানির উপসর্গ আর চোখের অন্য অনেক অসুখের উপসর্গ প্রায় একই রকম। ছানির উপসর্গের সঙ্গে অন্য অনেক অসুখের উপসর্গ মিলে যায় বলে গোলমাল বাধে। প্রথম অবস্থায় বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না, চোখে ছানি ধরেছে। একমাত্র চোখের ডাক্তারই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে প্রথম অবস্থায় ছানি ধরতে পারেন। তাই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে থাকলে কিংবা চোখে অন্য কোনো অসুবিধা দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার দেখানো উচিত।

কিন্তু প্রথমেই জানা দরকার, ছানি সারে না। এমন কোনো ওষুধ নেই যা দিয়ে ছানি সারানো যেতে পারে। ড্রপ, পিল, মলম, স্পেশাল ডায়েট, ব্যায়াম প্রভৃতি কোনো কিছুতেই ছানি 'গলে' না বা 'কমে' না। ওষুধবিষুধে বা ব্যায়ামে ছানি খারাপও হয় না, ভালোও হয় না। এখনও পর্যন্ত ছানির একমাত্র চিকিৎসা অস্ত্রচিকিৎসা, অর্থাৎ অস্ত্রোপচার করে ঘোলাটে লেন্সটা বার করে ফেলে দেওয়া। ছানি আসলে লেন্সের ভিতরে রাসায়নিক পরিবর্তন, যে পরিবর্তনের ফলে স্বচ্ছ লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গিয়ে চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়।

স্বাভাবিক চোখ

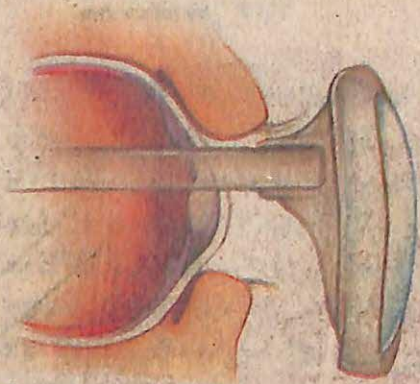


ছানি পড়া চোখ

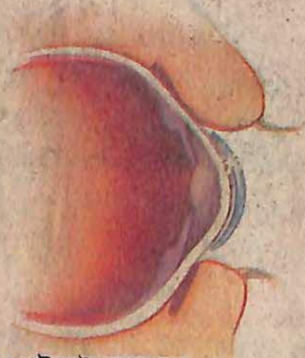




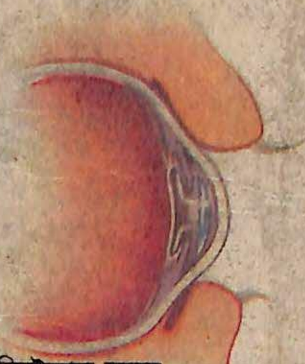
পাকা ছানি



ছানি চশমা



কন্ট্যাক্ট লেন্স



ইনট্রা-অকিউলার লেন্স

অস্বচ্ছ লেন্স কেটে বাদ দিলে চোখের ভিতরে আবার অবাধে আলো প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু চোখে লেন্স না থাকায় চোখ সেই আলো রেটিনার উপর ফোকাস করতে পারে না। একা কর্নিয়ার পক্ষে তা করা সম্ভব হয় না। ফলে, ছানি কাটার পরেও স্পষ্ট দেখা যায় না। স্পষ্ট দেখা যায়, যদি ঐ হারানো লেন্সের কাজটা কৃত্রিম কোনো লেন্স দিয়ে করানো যায়, অর্থাৎ ঐ স্বাভাবিক লেন্সের বদলে একটা কৃত্রিম লেন্স দেওয়া হয়—সে ছানি চশমাও হতে পারে, কনট্যাক্ট লেন্সও হতে পারে, আবার ইনট্রা-অকিউলার লেন্সও হতে পারে।

ছানি যে অপারেশন করাতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। চোখের দৃষ্টি যদি সেরকম ব্যাহত না হয় তাহলে অপারেশন না করালেও চলে। অপারেশন করাবেন কিনা সেটা নির্ভর করবে আপনার উপর। আপনি কী ধরনের কাজ করেন, আপনার লাইফ-স্টাইল কেমন, আপনার কতখানি অসুবিধা হচ্ছে- এইসব বিষয়ের উপরই নির্ভর করে আপনি কী করবেন। কেউ কেউ সামান্য দৃষ্টিহানিতেই অসুবিধায় পড়েন। তাঁরা হয়তো লেখাপড়া করেন কি ছবি আঁকেন অথবা সেলাইফোঁড়াই করেন কিংবা হাতের কোনো সূক্ষ্ম কাজ করেন বা গাড়ি চালান। তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছানি অপারেশন করিয়ে নিতে চান। আবার, যাঁদের জীবনধারা এমন যে, চোখের তেমন কাজ নেই তাঁরা অপারেশন না করিয়েও দিব্যি চালিয়ে দিতে পারেন।

ছানি না পাকলে অপারেশন করা যায় না বলে অনেকের মনে যে একটা ধারণা আছে সেই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে কোনো সময়ে যে কোনো অবস্থাতেই ছানি অপারেশন করা যেতে পারে। তবে যেহেতু সব অপারেশনেই কিছু-না-কিছু ঝুঁকি থাকে সেইহেতু যতদিন চশমা বদলে অথবা আলো ঠিকঠাক করে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় ততদিন অপারেশন না করাই ভালো।

অপারেশনের দরকার আছে কিনা সেটা ডাক্তার যেমন বলবেন তেমনি আপনাকেও বলতে হবে। দুজনে মিলেই অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারপর ডাক্তারই অপারেশনের উপযুক্ত সময় স্থির করবেন।

তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে, সাধারণত দু চোখে প্রায় একই সময়ে ছানি ধরলেও দু চোখে একই হারে বড়ো একটা ছানি ছড়ায় না। ফলে, এক চোখে কিছু ভালো দেখা যায়। ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করে মোটামুটিভাবে বলে দিতে পারেন কতদিন সেই চোখে কাজ চালানোর মতো দৃষ্টি থাকবে।

তার মধ্যেই খারাপ চোখে অপারেশন করতে হবে। সাধারণত একসঙ্গে দু চোখে অপারেশন করা হয় না। একবারে এক চোখেই অপারেশন করা হয় যাতে একটা চোখ দিয়ে কিছুটা অন্তত দেখা যায়। যে চোখটা বেশি খারাপ সেই চোখটাই আগে অপারেশন করা হয়।

ছানি অপারেশনের একাধিক পদ্ধতি আছে। প্রতিটি পদ্ধতিরই একই উদ্দেশ্য— চোখের ভিতরকার ঘোলাটে লেন্সটা বাদ দেওয়া। চোখ কেটে যেমন ফরসেপ দিয়ে লেন্স তুলে বাদ দেওয়া যেতে পারে তেমনি ক্রায়ো-প্রোব দিয়েও লেন্সটা তুলে ফেলা যেতে পারে। কখনও কখনও আলট্রা-সোনিক ওয়েভ দিয়ে লেন্সটা গলিয়ে তারপর ছোট্ট একটা নলের মধ্য দিয়ে সেই গলিত পদার্থ বাইরে টেনে আনা হয়। আপনার ডাক্তারই স্থির করবেন, আপনার ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতি ভালো। তবে জোর দিয়ে বলা যায়, প্রতিটি পদ্ধতিরই সাফল্যের হার আশ্চর্যরকম বেশি।

শিশুদের ছানি অপারেশন অনেক সহজ। শৈশবে চোখের লেন্স খুবই নরম থাকে, সেজন্য চোখের সামান্য একটু অংশ কেটে সেখান দিয়ে লেন্সের পদার্থগুলি সহজেই শোষণ করে আনা যায়। এই পদ্ধতিকে বলে সাকশন-ইভ্যাকিউয়েশন। কিন্তু বয়স বেশি হয়ে গেলে এই পদ্ধতিতে আর অপারেশন করা যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেন্সও শক্ত হতে থাকে, তখন অত সহজে লেন্সের পদার্থ বার করে আনা সম্ভব হয় না। তখন চোখের কর্নিয়ায় হাত না দিয়ে তার পাশ থেকে চোখ কেটে পুরো লেন্সটাই বার করে আনা হয়। কখনও ক্যাপসিউলসুদ্ধ লেন্স বার করে আনা হয়, আবার কখনও ক্যাপসিউলটা রেখে তার ভিতর থেকে কেবল লেন্সটাই বার করে আনা হয়। ক্যাপসিউলসুদ্ধ লেন্স বার করে আনলে তাকে বলে ইনট্রা-ক্যাপসিউলার এক্সট্র্যাকশন আর ক্যাপসিউল রেখে দিয়ে কেবল লেন্সটা বার করে আনলে তাকে বলে এক্সট্রা-ক্যাপসিউলার এক্সট্র্যাকশন। দুটোরই ভালোমন্দ দিক আছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই স্থির করতে পারেন, কার পক্ষে কোন্টা ভালো।

হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে যদি না পড়েন তাহলে কোনো ছানি অপারেশনেই ভয় নেই। ছানি অপারেশন এখন খুবই সাধারণ অপারেশন। এই অপারেশনে হাসপাতালে থাকার দরকারও হয় খুব কম। যেদিন সকালে অপারেশন হবে সেইদিন বিকেলেই আপনি উঠে হেঁটেচলে বেড়াতে পারবেন। অপারেশনের পর আপনার একটু ঘোর ঘোর লাগতে পারে, তবু ডাক্তার হয়তো আপনাকে বিকেলে একটু হাঁটাচলা করতে বলবেন। তখন কাউকে ধরে আস্তে আস্তে একটু হাঁটবেন। একা হাঁটার চেষ্টা করবেন না।

বাড়ি ফিরে আসার পরও কিন্তু আপনার কিছুটা অস্বস্তি ভাব থাকবে। আপনাকে নিয়মিত চোখে ওষুধ দিতে হবে, ব্যাণ্ডেজ লাগাতে হবে। এই চোখটায় যতদিন ব্যাণ্ডেজ লাগানো থাকবে ততদিন আপনাকে অন্য চোখের উপর নির্ভর করে চলতে হবে। এই সময় আপনার কতকগুলি করণীয় ও অ-করণীয় আছে। আপনার ডাক্তার আপনাকে সেগুলি বলে দেবেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে মনে রেখে

১. চোখে নিয়মিত ওষুধ দেবেন;
২. ডাক্তার যেভাবে চোখে ব্যাণ্ডেজ লাগাতে বলবেন সেইভাবেই চোখে ব্যাণ্ডেজ লাগাবেন;
৩. জুতো পরার সময় একটা টুল বা ঐরকম কোনো উঁচু জিনিসের উপর পা রেখে নেবেন;
৪. একেবারে শুয়েবসে কাটাবেন না, সামান্য কিছু কাজকর্ম করবেন;
৫. নিচু হতে হলে মাথা সোজা রেখে হাঁটু ভেঙে নিচু হবেন;
৬. কোমর ভেঙে মাথা ঝুঁকিয়ে কখনও নিচু হবেন না;
৭. কখনও চোখ রগড়াবেন না;
৮. কোনো ভারী জিনিস তোলার চেষ্টা করবেন না;
৯. যতদিন-না ডাক্তার বলছেন ততদিন মাথায় শ্যাম্পু করবেন না বা সাবান দেবেন না;
১০. টিভি দেখতে পারেন, কিন্তু খুব বেশি লেখাপড়ার কাজ করবেন না;
১১. যে চোখে অপারেশন হয়েছে সেই চোখ নিচের দিকে রেখে সেদিকে কাত হয়ে শোবেন না; এবং
১২. ডাক্তার যেমন যেমন দেখা করতে বলবেন তেমন তেমন তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

কিছুদিন পরে আপনাকে একটা কৃত্রিম লেন্স নিতে হবে। সেই লেন্স আপনি চোখের বাইরে নিতে পারেন, চোখের উপরে নিতে পারেন, আবার চোখের মধ্যেও নিতে পারেন— যেমন আপনার সুবিধা। আপনার সুবিধার কথা বিচার করেই ডাক্তার আপনাকে বলে দেবেন, কোন্ লেন্স আপনার পক্ষে ভালো। চোখের বাইরে যে লেন্স সে হল চশমা, চোখের উপরে কনট্যাক্ট লেন্স আর চোখের মধ্যে ইনট্রা-অকিউলার লেন্স।

ছানি অপারেশনের পর যে চশমা নেওয়া হয় সেই চশমাকে বলে ছানি-চশমা। ছানি চশমা কিন্তু আপনার সারা জীবনের সঙ্গী। আপনি যদি কনট্যাক্ট

লেন্স বা ইনট্রা-অকিউলার লেন্স নেনও তবু আপনার ছানি চশমার দরকার হবে। তবে সেই ছানি চশমার পাওয়ার অনেক কম হবে। অনেকসময় হয়তো কেবল কাছে দেখার জন্যই আপনার ছানি চশমার দরকার হবে।

ছানি চশমা সবচেয়ে নিরাপদ, ছানি চশমার দাম সবচেয়ে কম, ছানি চশমা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তবে ছানি চশমায় অভ্যস্ত হতে কিছু সময় লাগে। এই চশমায় আপনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন ঠিকই, কিন্তু এই চশমায় জগৎটা আপনার কাছে অন্যরকম দেখাবে। যতদিন-না আপনি এই চশমায় অভ্যস্ত হচ্ছেন ততদিন জগৎটা বড়ো অদ্ভুত মনে হবে আপনার। প্রথম কয়েক মাস আপনি এক মজার জগতে বাস করবেন। আপনাকে সব নতুনভাবে দেখতে শিখতে হবে।

অন্যরা যেভাবে পৃথিবীটাকে দেখে, ছানি চশমায় আপনি সেইভাবে দেখতে পাবেন না। আপনার চোখে সবকিছু বড়ো বড়ো ঠেকবে, অনেক বেশি উজ্জ্বল মনে হবে সবকিছু। আপনার চারপাশটা দেখবেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাবেন, কিম্ভূতকিমাকার মনে হবে সব। দরজাটা যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, দেওয়ালগুলো যেন বেঁকে গেছে। একটা খুঁটিও আপনি সোজা দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাবেন না। অনেক জিনিস মনে হবে হঠাৎ যেন পাশ থেকে আপনার সামনে এসে পড়ছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত-না আপনার অন্য চোখেও অপারেশন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ছানি চশমায় একসঙ্গে দুটো চোখ ব্যবহার করতে পারবেন না। যে চোখে অপারেশন হয়েছে সেই চোখের চশমার লেন্সে সবকিছু বড়ো দেখাবে। যে চোখে অপারেশন হয়েছে সেই চোখে বড়ো ছবি হবে আর যে চোখে অপারেশন হয় নি সেই চোখে ছোটো ছবি হবে। আপনার মস্তিষ্ক ছোটো ছবির সঙ্গে বড়ো ছবি মেলাতে পারবে না। ফলে, আপনি সব জিনিস দুটো করে দেখবেন। এইজন্য যে চোখে অপারেশন হয় নি সেই চোখ ঘষা কাঁচ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

সাধারণত মস্তিষ্ক দু চোখের দুটো ছবি একসঙ্গে মিশিয়ে আমাদের কাছে একটা ছবির ধারণা সৃষ্টি করে। একে বলে বাইনোকিউলার ভিশন। বাইনোকিউলার ভিশনের জন্যই আমরা ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে পাই, অর্থাৎ একটা জিনিস তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। এক চোখে অপারেশনের পর অর্থাৎ মনোকিউলার অ্যাফেকিয়ায় ত্রিমাত্রিক ছবি হয় না বলে আপনার কাছে সব জিনিস অনেকটা ফ্ল্যাট মনে হবে।

মনোকিউলার অ্যাফেকিয়ায় আপনি কেবল অপারেশন-করা চোখেই স্পষ্ট দেখতে পাবেন। তবে দূরত্বের হিসাবে আপনার কখনও কখনও গোলমাল হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ কোন্ জিনিস কত দূরত্বে আছে, সবসময় আপনি ঠাহর না-ও করতে পারেন। তাই চলতে গেলে আপনার হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, কোনোকিছু ধরতে গেলে হয়তো ধরতে পারবেন না, কাপে চা ঢালতে গেলে হয়তো বাইরে চা পড়ে যাবে। তবে আপনার অন্য চোখে অপারেশন হয়ে গেলে তখন আর এই সমস্যা থাকবে না। কারণ, তখন দু চোখে একই রকম ছবি তৈরি হবে; এক চোখে বড়ো ছবি, আর-এক চোখে ছোটো ছবি তৈরি হবে না।

ছানি চশমা দেখতে সাধারণ চশমার মতো নয়। ছানি চশমা অনেক পুরু, অনেক ভারী। ছানি চশমার কেবল মাঝখানটা দিয়েই দেখা যায়, তার চারপাশে অনেকখানি এলাকা নিয়ে একটা বলয় অকেজো থাকে। তাই পেরিফেরাল ভিশন কমে যায়, মাথা না ঘুরিয়ে পাশের জিনিস ভালো দেখা যায় না। এই চশমায় অপারেশন-করা চোখে যে লেন্স দেওয়া হয় সেই লেন্সে খুবই ভালো দেখা যায়, কিন্তু যে চোখে অপারেশন হয় নি সেই চোখে যে ঘষা কাঁচের লেন্স দেওয়া হয় তাতে কিছুই দেখা যায় না।

এক চোখে অপারেশনের পর যতদিন-না সেই চোখ সারছে ততদিন আপনি অন্য চোখ ব্যবহার করবেন। কিন্তু যে-ই ছানি চশমা নেবেন অমনি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে যাবে। তখন আর আপনি অপারেশন-না-করা চোখ ব্যবহার করবেন না, তখন আপনাকে অপারেশন-করা চোখে দেখতে শিখতে হবে। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হবে, অপারেশন-না-করা চোখটাই ব্যবহার করতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু সেই ইচ্ছা আপনাকে দমন করতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে, অপারেশন-না-করা চোখে জগৎটা আপনার কাছে পরিচিত মনে হলেও সেই চোখে আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না; স্পষ্ট দেখার জন্যই অন্য চোখে আপনি অপারেশন করিয়েছেন। অপারেশন-করা চোখটাই আপনি ব্যবহার করুন।

ধৈর্য হারাবেন না। ছানি চশমা চোখে সইয়ে নিতে সময় দিতে হবে। দূরত্বের হিসাবটা ঠিক করতে আপনার সময় লাগবে। প্রথম প্রথম আপনি হয়তো ব্যালান্স হারাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, শিশু ব্যালান্স হারিয়েই হাঁটতে শেখে, আপনি ব্যালান্স হারিয়ে নতুন করে দেখতে শিখছেন। সামনের জিনিস যখন দেখবেন, সোজা তাকাবেন; পাশের জিনিস যখন দেখবেন, মাথাটা ঘোরাবেন। পাশের জিনিস দেখতে যদি আড়চোখে তাকান তাহলে গোলমাল

বাধবে, কারণ আপনার ছানি চশমায় পাশের দৃষ্টি সীমিত। পাশের জিনিস দেখতে আপনাকে মাথা ঘুরিয়ে সোজা তাকাতে হবে। গোড়ার দিকে অসুবিধা হলেও আস্তে আস্তে দেখবেন এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তখন আর অসুবিধা হবে না।

আপনি যদি কাঁচের চশমার বদলে প্লাস্টিকের চশমা নেন তাহলে অসুবিধা অনেক কম হবে। প্লাস্টিকের লেন্স পুরুও নয়, ভারীও নয়। প্লাস্টিকের লেন্স অনেক পাতলা, অনেক হালকা। প্লাস্টিকের লেন্সে 'ওয়াইড অ্যাঙ্গল ভিউ' পাওয়া যায়, অর্থাৎ পাশের জিনিস দেখতে হলে মাথা ঘোরাতে হয় না। এই লেন্সে সমস্ত দিকেই দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্লাস্টিক লেন্সের অসুবিধা হল, একটুতেই লেন্সে আঁচড় পড়ে। এই লেন্স সহজে ভাঙে না, ফাটে না—কিন্তু সামান্য ঘষা লেগে দাগ পড়ে যায়। বেশি ঘষটানি লাগলে কখনও কখনও এমন অবস্থা হয় যে, ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। প্লাস্টিক লেন্স খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়।

ছানি অপারেশনের পর কনট্যাক্ট লেন্সে অনেক আরাম। ছানি চশমায় যেমন সবকিছু অস্বাভাবিক রকম বড়ো দেখায়, কনট্যাক্ট লেন্সে তা দেখায় না। কনট্যাক্ট লেন্সে ম্যাগনিফিকেশন খুবই কম, সাধারণভাবে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কনট্যাক্ট লেন্সে উল্লেখযোগ্য ম্যাগনিফিকেশন ছাড়াই পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু কনট্যাক্ট লেন্সও চোখে সইয়ে নিতে কিছু সময় লাগে।

ছানি অপারেশনের পর আপনি যদি কনট্যাক্ট লেন্স নেন তাহলে ছানি ধরার আগে এই চোখে যেমন দেখতেন, এখন অনেকটা সেইরকমই দেখতে পাবেন। কনট্যাক্ট লেন্সে কোনো জিনিস বিশেষ বড়ো দেখায় না, মনোকিউলার অ্যাফেকিয়ার সমস্যাও থাকে না। আবার, পাশের দৃষ্টিও বজায় থাকে। পাশের দৃষ্টি বজায় থাকার কারণ, লেন্সটা চোখের সঙ্গে লেগে থাকে বলে চোখ ঘোরালে লেন্সও ঘোরে। ফলে, মাথা না ঘুরিয়েও পাশের জিনিস দেখা যায়।

তাই বলে কনট্যাক্ট লেন্স আপনার সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে না। লেখাপড়া আর অন্যসব চোখের কাজের জন্য আপনার ছানি চশমারও দরকার হবে।

প্রথম অপারেশনের পর কনট্যাক্ট লেন্সে আপনি একসঙ্গে দু চোখেই দেখতে পাবেন—যে চোখে অপারেশন হয়েছে সেই চোখে আর যে চোখে এখনও অপারেশন হয় নি সেই চোখেও। তবে আপনি যখন কনট্যাক্ট লেন্স খুলে রাখবেন তখন সেই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাবে।

ছানি-কাটা লোকদের জন্য দু ধরনের কনট্যাক্ট লেন্স আছে—একটা রোজ ব্যবহারের জন্য, আর-একটা সর্বক্ষণ ব্যবহারের জন্য। রোজ ব্যবহারের জন্য যে লেন্স তা সফ্‌ট্‌ও হতে পারে, আবার হার্ডও হতে পারে। সফ্‌ট্‌ লেন্স নরম প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি আর হার্ড লেন্স শক্ত প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। সফ্‌ট্‌ই হোক কি হার্ড, এই লেন্স রাত্রে শোবার আগে খুলে রাখতে হয়, রোজ পরিষ্কার করতে হয়। এই লেন্স চোখে সইয়ে নিতে কারও কারও কিছু সময় লাগে।

সর্বক্ষণ ব্যবহারের জন্য যে কনট্যাক্ট লেন্স তাকে বলে এক্সটেণ্ডেড ওয়্যার লেন্স। এই লেন্স রোজ শোবার সময় খুলতে হয় না। একবার পরলে একনাগাড়ে দু থেকে চার সপ্তাহ চোখে রাখা যায়। এক জাতীয় বিশেষ প্লাস্টিক দিয়ে এই লেন্স তৈরি। সেই প্লাস্টিক খুবই নরম। ফলে, চোখে কোনো অসুবিধা হয় না, একেবারে প্রথম থেকেই চোখে আরাম লাগে। ডাক্তার একবার চোখে পরিয়ে দিলে যতদিন চোখে থাকবে, খোলার দরকার হবে না, পরিষ্কার করার দরকার হবে না, কোনোভাবে ছোঁবারও দরকার হবে না। এই কারণে যাঁদের আরথ্রাইটিস আছে অথবা যাঁরা রোজ লেন্স পরা ও খোলা এবং পরিষ্কার করার ঝামেলা এড়াতে চান তাঁদের পক্ষে এই লেন্স খুবই ভালো।

তবে এই লেন্সে কিছুই করণীয় নেই, একবার পরলেই নিশ্চিন্ত—এমন কথা ভাববেন না। এই লেন্স নরম আর পরিষ্কার রাখার জন্য রোজ আপনাকে চোখে ওষুধ দিতে হবে, কয়েক মাস অন্তর অন্তর ডাক্তারের কাছে গিয়ে লেন্স ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করাতে হবে, দরকার হলে লেন্স খুলে পরিষ্কারও করাতে হবে। এক্সটেণ্ডেড ওয়্যার লেন্সের দাম অনেক বেশি, কিন্তু টেকে কম। ঘন ঘন এই লেন্স পালটাতে হয়।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার, ইচ্ছা করলেই কনট্যাক্ট লেন্স নেওয়া যায় না, সকলের চোখে কনট্যাক্ট লেন্স সয় না—সফ্‌ট্‌, হার্ড, এক্সটেণ্ডেড কোনোটাই না। যাঁদের চোখে কনট্যাক্ট লেন্স সয় না তাঁদের একমাত্র ছানি চশমাই ভরসা।

সবরকম কনট্যাক্ট লেন্সেই কিছু-না-কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তাই সবসময় খেয়াল রাখতে হয়—চোখ লাল হচ্ছে কিনা, চোখ দিয়ে বেশি জল পড়ছে কিনা, একটু বেশি আলোয় চোখে কষ্ট হচ্ছে কিনা অথবা চোখে কোনোরকম যন্ত্রণা হচ্ছে কিনা। যদি এর একটা উপসর্গও দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো দরকার।

ছানি অপারেশনের পর যদি একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে চোখের দৃষ্টি ফিরে পেতে চান তাহলে ইনট্রা-অকিউলার লেন্সই ভালো। ছানি চশমায় যেসব অসুবিধা আছে, কনট্যাক্ট লেন্সে যেসব ঝামেলা আছে তার কিছুই নেই ইনট্রা-অকিউলার লেন্সে। এই লেন্সও এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। ছানি যখন অপারেশন করা হয় তখনই এই লেন্স চোখের মধ্যে একেবারে স্থায়িভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে এই লেন্স ধরাছোঁয়া যায় না। এই লেন্স পরিষ্কার করতে হয় না, মাঝে মাঝে বদলাতে হয় না--কোনো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটই পোয়াতে হয় না এই লেন্সে। সমস্ত রকম কৃত্রিম লেন্সের মধ্যে এই লেন্সেই সবচেয়ে বেশি ভালো দেখা যায়। এই লেন্সে প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে আসে। তবে কোনো কোনো কাজ করার সময় চশমারও দরকার হয়। কিন্তু সে পুরু ভারী ছানি চশমা নয়, সাধারণ চশমা। কারণ, চোখের মধ্যে তো লেন্স আছেই, স্বাভাবিক লেন্সের জায়গায় কৃত্রিম লেন্স কাজ চালাচ্ছে।

ইনট্রা-অকিউলার লেন্স নির্ঝঞ্ঝাট হলেও সকলের চোখে দেওয়া যায় না। চোখের কোনো কোনো রোগে এই লেন্স অচল।

ইনট্রা-অকিউলার লেন্সে সাধারণত চোখে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। দৈবাৎ যদি কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় তাহলে লেন্স খুলে ফেলার দরকার হতে পারে। তাই সমস্যা দেখা দেওয়া মাত্র ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।

ইনট্রা-অকিউলার লেন্স বসানোর জন্য চোখে যে অপারেশন করতে হয় তা অত্যন্ত জটিল অপারেশন। এই অপারেশন সম্পূর্ণ নিরাপদ, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। নির্বিচারে ইনট্রা-অকিউলার লেন্স বসানোর জন্য বহু চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এই সূক্ষ্ম ও কঠিন অপারেশনের জন্য যে উন্নত মানের নিখুঁত যন্ত্রপাতি দরকার এবং ডাক্তারের যে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, অনেকক্ষেত্রেই তা থাকে না। বহু উচ্চাভিলাষী ডাক্তার কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য এই অপারেশন করে বহু লোকের অন্ধত্বের কারণ হন। এ ব্যাপারে হাতুড়ে ডাক্তারদের ভূমিকাও অনেক বেশি। অনেক 'চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবিরে' হাতুড়েদের দিয়ে অপারেশন করানোর ফলে বহু লোক অন্ধ হয়ে যান।

ইনট্রা-অকিউলার লেন্স অপারেশন আসলে মাইক্রোসার্জারি। মাইক্রোসার্জারি মানে, মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সার্জারি অর্থাৎ অপারেশন। কানের বিভিন্ন সূক্ষ্ম অপারেশনের ক্ষেত্রে মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার অনেকদিন ধরেই প্রচলিত আছে। চোখের অপারেশনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার অবশ্য বেশিদিন নয়। চোখের বিভিন্ন অপারেশন, যথা ছানি, গ্লকোমা, কর্নিয়া গ্রাফটিং ইত্যাদিতে

বর্তমানে খুব সরু সুতো দিয়ে সেলাই করা হয়। সে সুতো চুলের চেয়েও সরু এবং সে সুতো সিল্ক, ডেক্রন, নাইলন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। খুব সরু সুতো দিয়ে সেলাই করার জন্য বিশেষ ধরনের ছোটো সূক্ষ্ম ছুঁচ ব্যবহার করা হয়। খালি চোখে সুষ্ঠুভাবে এসব ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব। সেইজন্যই ক্রমে চোখের অপারেশনে মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মাইক্রোস্কোপে শুধু অপারেশনের ক্ষেত্রটাই বড়ো দেখায় না, মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে উন্নত মানের ঠাণ্ডা আলোর ব্যবস্থা থাকে এবং মাইক্রোস্কোপ বিভিন্ন কোণে ঘোরানো যায় বলে অপারেশন করাও অনেক সহজসাধ্য হয়। এইভাবে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে যে অপারেশন করা হয় তাকে মাইক্রোসার্জারি বলে। ইনট্রা-অকিউলার লেন্স অপারেশনে ভালো মাইক্রোস্কোপ দরকার।

মোটামুটি দু ধরনের ইনট্রা-অকিউলার লেন্স অপারেশন চালু আছে। একটি অ্যান্টিরিয়র চেম্বার লেন্স, অন্যটি পস্টিরিয়র চেম্বার লেন্স। অ্যান্টিরিয়র চেম্বার লেন্স কর্নিয়ার ঠিক পিছনে ঢোকানো হয় বলে কর্নিয়ার পিছনের সংবেদনশীল স্তর সহজেই নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। সেইজন্য এই অপারেশন আজকাল প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে।

পস্টিরিয়র লেন্সই আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র জনপ্রিয় হয়েছে। এই অপারেশনে অস্বচ্ছ লেন্সটিকে তার ক্যাপসিউল থেকে বার করে এনে ঠিক ঐ জায়গায় কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেওয়া হয়। চোখের ছোট্ট কাটা জায়গাটি আবার সুন্দর করে সেলাই করে দেওয়া হয়। এই অপারেশনে রোগীকে একেবারেই হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হয় না। নিখুঁত অপারেশনের পর অনেক জায়গায় রোগীকে তখনই হেঁটে বাড়ি যেতে দেওয়া হয়।

এই অপারেশনে লেন্সের ক্যাপসিউল রেখে দেওয়া হয় বলে পরবর্তী কালে কৃত্রিম লেন্সের পিছনে আবার শক্ত পর্দা তৈরি হয়ে দৃষ্টি কমে যেতে পারে। তখন পর্দায় ফুটো না করলে আলোর রশ্মি চোখের ভিতরে যেতে পারে না, রোগী ভালো দেখতে পান না। এই ফুটো করার জন্য একধরনের লেজার-রশ্মির প্রয়োজন হয়, তার নাম ইয়াগ লেজার। ছানি অপারেশনে লেজারের এইটুকুই ভূমিকা। এ ছাড়া আর কোনো ভূমিকা নেই।

তের : গ্লকোমা

অন্ধত্বের একটা বড়ো কারণ গ্লকোমা। চল্লিশ বছর বয়সের পর এই রোগ বেশি দেখা যায়। সময়মতো ধরা পড়লে গ্লকোমার দরুন অন্ধত্ব প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নিবারণ করা সম্ভব। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, গ্লকোমা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোড়ার দিকে ধরা পড়ে না।

গ্লকোমা কোনো ইনফেকশন নয়, কোনো সংক্রামক রোগও না। চোখের মধ্যে যে জলীয় পদার্থ থাকে তার চাপ অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই বলে গ্লকোমা। সাধারণত দু চোখেই গ্লকোমা হয়।

আগেই বলেছি, আমরা যখন কোনো বস্তুর দিকে তাকাই তখন সেই বস্তু থেকে আলো এসে চোখের মধ্যে রেটিনার উপর বস্তুটার একটা ছবি তৈরি করে, তারপর সেই ছবির বার্তা অপ্টিক নার্ভের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক স্পন্দনের আকারে চলে যায় মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্কই আমাদের বলে দেয় বস্তুটা কী, অর্থাৎ বস্তুটা তখন আমরা দেখতে পাই। এই যে অপ্টিক নার্ভ এ অনেকটা ইলেকট্রিক কেব্‌লের মতো। এতে অনেকগুলি 'তার' থাকে, প্রত্যেকটা 'তার'-ই বার্তা বহন করে। মস্তিষ্কের মধ্যে 'তারগুলি' এক জায়গায় যুক্ত হয়ে আমাদের দেখার অনুভূতি ঘটায়—আমরা দেখতে পাই। আমরা যেমন সামনের জিনিস দেখতে পাই তেমনি পাশের জিনিসও দেখতে পাই। সামনের জিনিস দেখতে পাই স্পষ্ট, সরাসরি; পাশের জিনিস দেখতে পাই কিছুটা অস্পষ্ট, কিছুটা তেরছাভাবে। সামনের দেখাকে বলে সেন্ট্রাল ভিশন আর পাশের দেখাকে বলে সাইড ভিশন বা পেরিফেরাল ভিশন।

এখন, চোখের মধ্যে চাপ অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেলে ঐ 'তারগুলি' কিছু কিছু করে নষ্ট হতে থাকে আর ফিল্ড অভ ভিশনে ব্লাইণ্ড এরিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ, চোখের সামনে যে দৃষ্টিক্ষেত্র তাতে খানিকটা করে জায়গা অন্ধকার হয়ে যেতে থাকে। যখন সমস্ত নার্ভ নষ্ট হয়ে যায় তখন সম্পূর্ণ অন্ধত্ব ঘটে। কিন্তু নার্ভের মারাত্মক রকম ক্ষতি হবার আগেই যদি চিকিৎসা শুরু করা যায় তাহলে সম্পূর্ণ অন্ধত্ব নিবারণ করা সম্ভব হয়।

চোখের মধ্যে একটা চাপ কিন্তু সবসময়েই দরকার। এই চাপের জন্যই চোখ বলের মতো ফুলে থাকে। চাপ না থাকলে চোখ বাতাসবিহীন বেলুনের মতো চুপসে থাকত।

আমাদের চোখের সামনের দিকে অ্যান্টিরিয়র চেম্বার আর পস্টিরিয়র চেম্বার নামে দুটি কক্ষ আছে। কর্নিয়া ও আইরিসের মাঝখানে যে জায়গা তাকে বলে অ্যান্টিরিয়র চেম্বার আর আইরিস ও লেন্সের মাঝখানে যে জায়গা তাকে বলে পস্টিরিয়র চেম্বার। অ্যান্টিরিয়র চেম্বারের মতো পস্টিরিয়র চেম্বারও একুইয়াস হিউমার নামে একরকম জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। অ্যান্টিরিয়র চেম্বার আর পস্টিরিয়র চেম্বারকে একত্রে বলে ইনার আই। ইনার আইকে বাংলায় বলা যেতে পারে আন্তর চক্ষু। আন্তর চক্ষুর একুইয়াস হিউমারই চোখের ভিতর স্বাভাবিক চাপ বজায় রাখে। তার ফলে, চোখ বাতাসবিহীন বেলুনের মতো চুপসে যেতে পারে না।

আন্তর চক্ষু কোনো বদ্ধ জলাশয়ের মতো নয়। এখানে একই একুইয়াস



হিউমার বরাবর আটকে থাকে না। পস্টিরিয়র চেম্বারের গায়ে যে সিলিয়ারি বডি আছে সেই সিলিয়ারি বডিই অবিরাম একুইয়াস হিউমার তৈরি করে, তারপর সেই একুইয়াস হিউমার পস্টিরিয়র চেম্বার থেকে বেরিয়ে পিউপিলের ফাঁক দিয়ে অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে আসে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে শরীরের রক্তধারায় মেশে। অবিরাম এই ঘটনা ঘটে।

অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে একুইয়াস হিউমারের যে অবিরাম ধারা বয়ে চলেছে, এই ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হলে একবার আপনার রান্নাঘরে সিঙ্কটার ধারে গিয়ে দাঁড়ান। এবার সিঙ্কের উপর কলটা খুলে দিলে দেখতে পাবেন, কলের মুখ থেকে জল বেরিয়ে সিঙ্কের নিচের পাইপ দিয়ে চলে যাচ্ছে বাইরে।

সিঙ্কে জল জমতে পারছে না। কিন্তু যদি কোনো কারণে পাইপ আটকে যায় তাহলে সিঙ্কে জল জমবে। ঠিক সেইরকম চোখের অ্যান্টিরিয়র চেম্বার থেকে একুইয়াস হিউমার বেরিয়ে যাবার পথ যদি কোনোভাবে আটকে যায় তাহলে অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে একুইয়াস হিউমার জমে যায় এবং তার দরুন শুধু অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে নয়, গোটা চোখেই চাপ বৃদ্ধি পায়। এই চাপের ফলে অপ্টিক নার্ভ



পিষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তখন অপ্টিক নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কে বার্তা যেতে পারে না, তখন অন্ধত্ব। কারণ, বিদ্যুতের তার যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে বাল্ব ঠিক থাকলেও জ্বলে না। আমরা তো আসলে মস্তিষ্ক দিয়ে দেখি, চোখে কেবল বস্তুটার একটা ছবি তৈরি হয়। অপ্টিক নার্ভ ছবির বার্তাটা মস্তিষ্কে পৌঁছে দিলে আমরা দেখতে পাই। সুতরাং অপ্টিক নার্ভের মধ্য দিয়ে যদি বার্তা যেতে না পারে তাহলে দেখা যায় না।

এখন, একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন তিনভাবে অ্যান্টিরিয়র চেম্বারের 'পাইপ' বন্ধ হয়ে যেতে পারে-

প্রথম, পাইপে হয়তো গোড়া থেকেই ত্রুটি আছে, অর্থাৎ পাইপটা তৈরিই হয় নি ঠিকভাবে। এই ধরনের ত্রুটির জন্য জন্ম থেকেই গ্লকোমা দেখা যায়। একে বলে কনজেনিট্যাল গ্লকোমা। জন্মগত ত্রুটির জন্য শিশুর চোখের মধ্যে যখন চাপ বৃদ্ধি পায় তখন চোখের কোমল টিস্যুতে প্রচণ্ড রকম টান পড়ে এবং শিশুর চোখ অনেকটা মোষের চোখের মতো আকারে বড়ো হয়ে যায়, চোখের সামনেটা হয়ে যায় কুয়াশার মতো অস্বচ্ছ। শিশুর তখন আলোয় কষ্ট হয় এবং প্রায়ই চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল ঝরে। তবে সুখের

গ্লকোমার অবনতি



স্বাভাবিক চাপ
চাপ বেড়েছে
চাপ আরও বেড়েছে
স্বাভাবিক অপ্টিক ডিস্ক
নার্ভতন্তু নষ্ট হয়েছে, অপ্টিক ডিস্কে গর্ত হয়েছে
নার্ভতন্তু আরও নষ্ট হয়েছে, অপ্টিক ডিস্কে আরও গর্ত হয়েছে
স্বাভাবিক ফিল্ড অভ ভিশন
সাইড ভিশন কমেছে
অন্ধত্ব এগিয়ে আসছে

ক্রনিক গ্লকোমার ক্রমাবনতি



অ্যাকিউট গ্লকোমার দ্রুত অবনতি



কথা, কনজেনিট্যাল গ্লকোমা খুব বেশি দেখা যায় না। তবু যদি কখনও কোনো শিশুর চোখে কনজেনিট্যাল গ্লকোমার কোনো উপসর্গ দেখা যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চোখের ডাক্তার দেখানো উচিত।

দ্বিতীয়, পাইপে আস্তে আস্তে জঞ্জাল জমে অথবা পলি জমে পাইপটা আটকে যেতে পারে। এইরকমভাবে যে পাইপ আটকে যায় সে দু-একদিনে যায় না, তার জন্য সময় লাগে। অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে এইভাবে যখন পাইপ আটকে যেতে থাকে তখন যে গ্লকোমা দেখা দেয় তাকে বলে ক্রনিক গ্লকোমা। ক্রনিক গ্লকোমাই সব থেকে বেশি দেখা যায়। ক্রনিক গ্লকোমাকে বলা হয় 'a thief in the night', কারণ চোর যেমন রাত্রির অন্ধকারে গৃহস্থের অজান্তে চুরি করে তেমনি ক্রনিক গ্লকোমায় চোখের দৃষ্টি এমন নিঃশব্দে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত-না অপ্টিক নার্ভ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রোগী টের পান না। এই ধরনের গ্লকোমায় সাধারণত কোনো উপসর্গ থাকে না। কোনো ব্যথাবেদনা না। রোগীর অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দৃষ্টিহানি ঘটতে ঘটতে রোগ যখন ধরা পড়ে তখন আর বিশেষ কিছুই করার থাকে না। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। সে ক্ষতি কিছুতেই পূরণ করা যায় না। কেবল আর যাতে ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা করা যায়। ক্রনিক গ্লকোমা রোধের একমাত্র উপায় মাঝে মাঝে চোখ পরীক্ষা করানো, বিশেষ করে চল্লিশ বছর বয়সের পর।

তৃতীয়, মনে করুন একখণ্ড কাগজ সিঙ্কের মধ্যে ছিদ্রের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কাগজটা গিয়ে ছিদ্রটায় চেপে বসল, ছিদ্রটা আটকে গেল। তখন আর জল বার হতে পারবে না, সিঙ্কের মধ্যে জমতে থাকবে। এইভাবে যদি চোখের একুইয়াস হিউমার বার হবার পথ হঠাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যে গ্লকোমা দেখা দেয় তাকে বলে অ্যাকিউট গ্লকোমা। অ্যাকিউট গ্লকোমা ক্রনিক গ্লকোমার মতো অত বেশি দেখা যায় না। অ্যাকিউট গ্লকোমা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধরা যায়, কারণ এর অনেক উপসর্গ থাকে। অ্যাকিউট গ্লকোমায় হঠাৎ হঠাৎ চোখ খুব লাল হয়, চোখে ও চোখের চারপাশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, দৃষ্টিশক্তি অনেকখানি কমে যায় এবং অনেকসময় বমি-বমি ভাব ও বমি হয়। চোখে রামধনুও দেখা যায় আলোর চারধারে। এইরকম সব উপসর্গ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে যদি চিকিৎসা শুরু করা না যায় তাহলে এক-দুদিনের মধ্যেই চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। উপসর্গ দেখা দেওয়া মাত্র যদি চিকিৎসা শুরু করা যায় তাহলে ক্ষতি যা হয়ে গেছে তা সারানো না গেলেও নতুন করে

আর ক্ষতি হতে পারে না। অ্যাকিউট গ্লকোমায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইমার্জেন্সি অপারেশন করার দরকার হয়।

এই তিনটি কারণ ছাড়াও অন্য কতকগুলি কারণে অ্যান্টিরিয়র চেম্বার থেকে একুইয়াস হিউমার বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। সেই কারণগুলি হল: আঘাত, কোনো কোনো অসুখ, হীমারেজ অর্থাৎ চোখের মধ্যে রক্তস্রাব, ডায়াবিটিজ, টিউমার, ইনফ্ল্যামেশন ইত্যাদি। এইসব কারণে যখন চোখের মধ্যে চাপ বেড়ে যায় এবং তার দরুন গ্লকোমা হয় তখন সেই গ্লকোমাকে বলে সেকেণ্ডারি গ্লকোমা।

একটা কথা পরিষ্কার, চোখের মধ্যে চাপ বেড়ে গেলেই গ্লকোমা হয়—তা সে যে কারণেই বাড়ুক।

গ্লকোমা কিন্তু অনেকসময় বংশগতও হতে পারে। মা-বাবার কারও গ্লকোমা থাকলে সন্তানেরও গ্লকোমা হতে পারে। এমন কি, দিদিমা-দাদামশায় কিংবা ঠাকুরমা-ঠাকুরদার থাকলেও হতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, কারও ক্রনিক গ্লকোমা থাকলে তাঁর রক্তের-সম্পর্ক-আছে এমন নিকট আত্মীয়ের গ্লকোমা হবার সম্ভাবনা দশগুণ বেশি।

গ্লকোমার চিকিৎসার সময় ডাক্তারকে অনেক কথা মাথায় রাখতে হয়—রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য কেমন, তিনি অন্য কোনো ওষুধ খাচ্ছেন কিনা, তাঁর ডায়াবিটিজ, আর্টারিওসক্লেরোসিস বা অ্যানিমিয়া আছে কিনা, তাঁর বংশের কারও কখনও গ্লকোমা হয়েছিল কিনা ইত্যাদি।

যত রকমের গ্লকোমা আছে তার মধ্যে ক্রনিক গ্লকোমারই প্রাদুর্ভাব বেশি। ক্রনিক গ্লকোমা খুব ধীরে ধীরে এগোয়। প্রথমে পাশের দৃষ্টি নষ্ট করে, তারপর মাঝের দৃষ্টি। পাশ থেকে আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে মাঝখানে চলে যায়, গোটা চোখটা তখন অন্ধকারে ঢেকে যায়। ক্রনিক গ্লকোমায় প্রথমে মধ্যদৃষ্টি নষ্ট হয় না বলে রোগের গোড়ার দিকে দেখতে অসুবিধা হয় না। ফলে, রোগী জানতে পারেন না, তিনি এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

ক্রনিক গ্লকোমা কখনও জানান দিয়ে আসে না, তার কোনো 'ওয়ার্নিং সিমটম' নেই। তাই তাকে বলা হয় 'most dangerous type of glaucoma.' ক্রনিক গ্লকোমাকে slow poisoning-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যখন অনেকখানি ক্ষতি হয়ে যায়—এবং অপূরণীয় ক্ষতি—তখন এই রোগ ধরা পড়ে। তখন সাইড ভিশন বা পাশের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে, তখন যে ভিশন থাকে তাকে বলে 'টিউব ভিশন' বা 'টানেল ভিশন'। তখন সোজা তাকিয়ে ছাড়া

দেখা যায় না, পাশের দৃষ্টি রুদ্ধ—নল বা সুড়ঙ্গে যেমন হয়। নলে ও সুড়ঙ্গে সোজা তাকিয়ে দেখতে হয়।

ক্রনিক গ্লকোমার কোনো পূর্বলক্ষণ থাকে না বলেই চল্লিশ বছর বয়সের পর মাঝে মাঝে চোখ পরীক্ষা করানো দরকার। পরীক্ষায় যদি দেখা যায়, আপনার চোখের চাপ 'বর্ডারলাইনে' আছে, অর্থাৎ চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, কিন্তু এত বেশি নয় যে, খুব শিগ্‌গির গ্লকোমা ধরবে—তাহলে আপনার ডাক্তার হয়তো এখনই আপনাকে কোনো ওষুধ দেবেন না। আপনাকে তিনি কিছুদিন অন্তর অন্তর তাঁর কাছে যেতে বলবেন। ইংরেজীতে যাকে মনিটর করা বলে, কিছুদিন তিনি আপনার চোখের চাপ ও আরও কয়েকটা জিনিস তা-ই করবেন। তারপর যদি কখনও দেখেন, চোখের চাপ আরও বেড়েছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করে দেবেন।

আর যদি পরীক্ষায় দেখা যায়, আপনার চোখে ক্রনিক গ্লকোমা ধরেছে তাহলে তিনি কালবিলম্ব না করে চিকিৎসা আরম্ভ করে দেবেন। আপনার চোখের চাপ কমাতে তিনি আপনাকে আই-ড্রপ কিংবা খাবার ট্যাবলেট দেবেন। প্রয়োজন হলে ড্রপ আর ট্যাবলেট দুই-ই দিতে পারেন। আপনি যদি তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়মিত চোখে ড্রপ দেন আর ট্যাবলেট খান তাহলে এতেই আপনার চোখের চাপ কমবে। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে ওষুধে তেমন কাজ হয় না, তখন চোখের চাপ কমাতে অপারেশন করার দরকার হয়।

অপারেশন শেষ পন্থা। আগে ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করা হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে শুধু চোখে ড্রপ দিলেই কাজ হয়, আবার কারও কারও ক্ষেত্রে চোখে যেমন ড্রপ দিতে হয় তেমনি ট্যাবলেটও খেতে হয়। অনেকরকমের ওষুধ আছে, সব ওষুধ সবার সয় না। প্রতিটি মানুষই আলাদা, এই কথা মনে রেখেই ওষুধ ঠিক করতে হয়। যে ওষুধে আর-একজনের কাজ হয়েছে সেই ওষুধে আপনার কাজ না-ও হতে পারে। আর-একজন যে ওষুধ খুব সহজেই সয়ে নিয়েছেন সেই ওষুধে আপনার অনেক সাইড-এফেক্ট দেখা দিতে পারে। আপনার চোখের দৃষ্টি আরও ঝাপসা হয়ে যেতে পারে, মাথা ধরতে পারে, আরও কিছু হতে পারে। যা-ই হোক, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে বলবেন।

চোখে যে ওষুধ দেওয়া হয়, দু ধরনের ওষুধ আছে। এক ধরনের ওষুধে চোখের অ্যান্টিরিয়র চেম্বার থেকে একুইয়াস হিউমার বেরিয়ে যাবার পথটা বড়ো হয়, আর-এক ধরনের ওষুধে পস্টিরিয়র চেম্বারে একুইয়াস হিউমার তৈরিই হয় কম। পথ বড়ো হলে সহজেই একুইয়াস হিউমার বেরিয়ে যেতে

পারবে এবং তার ফলে চোখের মধ্যে চাপ কমবে, আর একুইয়াস হিউমার যদি তৈরিই হয় কম তাহলে চোখের মধ্যে চাপ বাড়তে পারবে না।

কোনো কোনো ওষুধে চোখের পিউপিল ছোটো হয় এবং চোখে কম আলো প্রবেশ করে। তাতে চোখের দৃষ্টি হ্রাস পায়। যাঁদের চোখে ছানি আছে, এইসব ওষুধে তাঁদের খুবই অসুবিধা হয়। ছানির জন্য আগে থেকেই চোখের দৃষ্টি কম ছিল, এখন ওষুধের জন্য দৃষ্টি আরও কমে গেল। আবার, কোনো কোনো ওষুধে কারও কারও চোখে ইরিটেশন হয়, চোখ লাল হয়, মনে হয় চোখে হুল ফুটছে—এবং মাথাও ধরে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই কিছুই হয় না, নির্বিবাদে তাঁরা এইসব ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন।

চোখে যে ওষুধ দেওয়া হয় সেই ওষুধ পরে শরীরের রক্তস্রোতে গিয়ে মেশে। ফলে, শরীরের কোনো কোনো অঙ্গের কাজে কখনও কখনও গোলমাল দেখা দিতে পারে। নাড়ির গতি বেড়ে যেতে পারে, হৃৎস্পন্দন ত্বরান্বিত হতে পারে, শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। কোনো কোনো ওষুধ কার্ডিও-ভ্যাসকিউলার সিস্টেমে সাঙ্ঘাতিক গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং যাঁদের হাই ব্লাড প্রেশার আছে তাঁদের এইসব ওষুধ খুব সতর্ক হয়ে ব্যবহার করতে হয়। আপনার হাই ব্লাড প্রেশার থাকলে ডাক্তারকে বলবেন এবং ডাক্তারের প্রেসকৃপশন ছাড়া অন্য কোনো ওষুধও ব্যবহার করবেন না।

অনেকসময় চোখের চাপ কমানোর জন্য চোখে যেমন ওষুধ দিতে হয় তেমনি ওষুধ খেতেও হয়। দুই-ই একসঙ্গে চলে। খাবার ওষুধে চোখের মধ্যে একুইয়াস হিউমারের ধারাটা কমে যায়, অর্থাৎ চোখে কম একুইয়াস হিউমার তৈরি হয়। খাবার ওষুধেও কখনও কখনও কিছু কিছু সাইড-এফেক্ট দেখা যায়। কারও কারও হাত-পায়ে কাঁটা বেঁধার মতো মনে হয়, পেট খারাপ হয়, বমি-বমি ভাব হয়, ঘুম পায় কিংবা ক্ষিধে কমে যায়। কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরই এসব কিছুই হয় না, তাঁরা অনায়াসে এইসব ওষুধ সয়ে নিতে পারেন।

চোখের ওষুধই হোক কি খাবার ওষুধ, কোনো সাইড-এফেক্ট দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে জানাবেন।

চোখের ওষুধের মতো খাবার ওষুধেও কোনে কোনো ক্ষেত্রে হার্ট, কিডনি ও অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে, সুতরাং আপনার অন্য কোনো অসুখ থাকলে ডাক্তারকে আগেই বলে দেবেন। আবার, গ্লকোমার ওষুধের সঙ্গে অন্য কোনো কোনো অসুখের ওষুধের পরস্পর-ক্রিয়ায় শরীরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, সুতরাং যখনই অন্য অসুখের চিকিৎসার জন্য অন্য ডাক্তারের

কাছে যাবেন, তিনি প্রেসকৃপশন লেখার আগেই তাঁকে বলে দেবেন গ্লকোমার জন্য আপনি কী কী ওষুধ ব্যবহার করছেন।

এতসব সাইড-এফেক্টের কথায় আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। আপনাকে শুধু সাবধানে থাকতে হবে, ওষুধের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, গ্লকোমা সারে না, কেবল ওষুধ দিয়ে দমিয়ে রাখা যায়। সারা জীবন তা-ই রাখতে হবে। সারা জীবনই আপনাকে ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে আপনাকে চোখে ওষুধ দিতে হবে বা ওষুধ খেতে হবে। মাঝে মাঝেই আপনাকে ডাক্তারের কাছে গিয়ে চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। ওষুধ আর ডাক্তার আপনার সারা জীবনের সঙ্গী।

শুধু ওষুধে যদি কাজ না হয়, কোনো ওষুধই যদি আপনি সহ্য করতে না পারেন তাহলে অপারেশন ছাড়া উপায় নেই। অপারেশন শেষ উপায়। ক্রনিক গ্লকোমা অপারেশনে চোখের অ্যান্টিরিয়র চেম্বার থেকে একুইয়াস হিউমার বেরিয়ে যাবার জন্য নতুন পথ তৈরি করে দেওয়া হয়। এই অপারেশনের নাম ট্র্যাবিকিউলেকটমি। এই অপারেশনের পরও কখনও কখনও চোখে ওষুধ দেবার বা ওষুধ খাবার দরকার হতে পারে, আবার ওষুধ একেবারে বাদও দেওয়া যেতে পারে। অপারেশনের পর অবস্থা কেমন দাঁড়ায় তা দেখেই ডাক্তার স্থির করবেন ওষুধের দরকার আছে কি নেই। তবে অন্য সমস্ত অপারেশনের মতো গ্লকোমা অপারেশনেও কিছু বিপদের ঝুঁকি আছে। সুতরাং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া চোখে হাত দিতে দেবেন না।

ক্রনিক গ্লকোমা অনেকসময়েই ওষুধ দিয়ে দমিয়ে রাখা যায়, কিন্তু আকিউট গ্লকোমায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওষুধে কাজ না হলে অপারেশন ছাড়া অন্য পথ নেই। অ্যাকিউট গ্লকোমায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশন করতে হয়—এবং ইমার্জেন্সি অপারেশন।

অ্যাকিউট গ্লকোমার প্রাদুর্ভাব ক্রনিক গ্লকোমার মতো অত বেশি নয়, কিন্তু অ্যাকিউট গ্লকোমা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। অ্যাকিউট গ্লকোমায় একেবারে হঠাৎই অ্যান্টিরিয়র চেম্বার থেকে একুইয়াস হিউমার বেরিয়ে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে একুইয়াস জমতে থাকে এবং তার চাপ খুব তাড়াতাড়ি বিপজ্জনক মাত্রায় উঠে যায়।

অ্যাকিউট গ্লকোমার আক্রমণ প্রায়শই একেবারে বিনা ওয়ার্নিংয়ে আসে—এবং উপসর্গ নিয়েই আসে। ক্রনিক গ্লকোমায় প্রথমে কোনো উপসর্গই থাকে না, কিন্তু অ্যাকিউট গ্লকোমায় অনেকগুলি উপসর্গ থাকে। ক্রনিক গ্লকোমা প্রথমেই দু চোখে ধরে, অ্যাকিউট গ্লকোমা সাধারণত প্রথমে এক চোখে ধরে,

তারপরে আর-এক চোখে। অ্যাকিউট গ্লকোমার প্রধান উপসর্গ চোখ প্রচণ্ড লাল হয়ে ফুলে ওঠা ও চোখে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া, হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক রকম দৃষ্টিহানি ঘটা, আলোর চারধারে রামধনু দেখা, মাথা ধরা, বমি-বমি ভাব হওয়া এবং বমি হওয়া। অ্যাকিউট গ্লকোমাকে বলা হয় ইমার্জেন্সি কণ্ডিশন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি চোখের মধ্যে চাপ কমানো না যায় তাহলে চির অন্ধত্ব প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

অ্যাকিউট গ্লকোমার আক্রমণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকভাবে চোখের মধ্যে চাপ কমানোর জন্য ওষুধ খাওয়াতে হয় কিংবা ইনজেকশন দিতে হয়। চোখের চাপ নিরাপদ মাত্রায় কমে গেলে তখন তাড়াতাড়ি অপারেশন করতে হয়। অপারেশনে আইরিসের একটা ছোট্ট অংশ কেটে বাদ দিয়ে একুইয়াস হিউমার বেরিয়ে যাবার পথ করে দেওয়া হয়। এই অপারেশনকে বলে আইরিডেকটমি। এখন এই অপারেশনে বহু জায়গায় লেজার-রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

অ্যাকিউট গ্লকোমার দরুন হঠাৎ যে দৃষ্টিহানি ঘটে, অপারেশন করে তা পুনরুদ্ধার করা যায় না; কিন্তু নতুন করে দৃষ্টিহানি রোধ করা যায়। অর্থাৎ, ক্ষতি যা হয় তা রয়েই যায়, নতুন ক্ষতি আর হতে পারে না। অ্যাকিউট গ্লকোমার আক্রমণের পর খানিকটা দৃষ্টিহানি মেনে নিতেই হয়। কিন্তু যদি অপারেশন করা না হয় তাহলে এই দৃষ্টিটুকুও রাখা যায় না।

অপারেশনে ঝুঁকি নিশ্চয়ই আছে, সে ঝুঁকি নিতেই হবে। অপারেশন না করালে অন্ধত্ব তো প্রায় অবশ্যম্ভাবী, ভালো হাতে অপারেশন করালে সেই অন্ধত্ব নিবারণ করা সম্ভব। তাছাড়া আধুনিক কালে অস্ত্রচিকিৎসার অসামান্য উন্নতির ফলে ঝুঁকি অনেক কমে গেছে।

অ্যাকিউট গ্লকোমার আক্রমণ সাধারণত প্রথমে এক চোখে হয়। কিছুদিন পরে অন্য চোখেও হতে পারে—এবং হবার সম্ভাবনাই বেশি। সেই সম্ভাবনা রোধ করার জন্য আপনার ডাক্তার হয়তো আপনাকে অন্য চোখেও আগেভাগে একটা অপারেশন করিয়ে নিতে বলবেন। যদি বলেন, অবশ্যই তা করিয়ে নেবেন। কারণ, আক্রমণ ঘটার আগেই যদি অপারেশন করা যায় তাহলে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি।

গ্লকোমার ব্যাপারে সবসময় মনে রাখবেন, গ্লকোমা সারে না, কোনো গ্লকোমাই না। একবার গ্লকোমার আক্রমণ ঘটলে কিছু ক্ষতি হবেই। সেই ক্ষতি কিছুতেই পূরণ করা যায় না। আর যাতে ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা করা যায় আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যে। সুতরাং গ্লকোমার চিকিৎসা যত তাড়াতাড়ি

আরম্ভ করা যায় তত মঙ্গল। তার চেয়েও মঙ্গল গ্লকোমার আক্রমণ যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করা। তার একমাত্র ব্যবস্থা, কোনো উপসর্গ থাক বা না-থাক, চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেলেই দু-তিন বছর অন্তর অন্তর চোখ পরীক্ষা করানো।

গ্লকোমার আক্রমণ যদি ঘটেই যায় তাহলে টোটকা-ফোটকা না করে, হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে অবিলম্বে সরাসরি চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন। মনে রাখবেন, ঠিক সময়ে ঠিকমতো চিকিৎসা হলে গ্লকোমার কারণে অন্ধত্ব প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নিবারণ করা সম্ভব। বেশির ভাগ গ্লকোমা-রোগীই অন্ধত্বের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন। কিন্তু তার জন্য তাঁদের প্রতিদিন নিয়ম করে চোখে ওষুধ দিতে হবে বা ওষুধ খেতে হবে--ডাক্তার যেমন বলবেন। আর, মাঝে মাঝে নিয়ম করেই ডাক্তারের কাছে গিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে আসতে হবে।

গ্লকোমা বিপজ্জনক হলেও ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি যদি সতর্ক হয়ে চলেন তাহলে আর-পাঁচজনের মতোই প্রায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন। ওষুধের ব্যাপারে কখনও হেলাফেলা করবেন না। ডাক্তারের নির্দেশমতো রোজ নিয়ম করে চোখে ওষুধ দেবেন বা ওষুধ খাবেন। কোনো সাইড-এফেক্ট দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে বলবেন। অন্য অসুখের জন্য অন্য ডাক্তার যখন দেখাবেন, আগেভাগেই তাঁকে বলে দেবেন আপনার গ্লকোমা আছে। গ্লকোমার জন্য আপনি চোখে কী ওষুধ দিচ্ছেন বা কী ওষুধ খাচ্ছেন তা-ও তাঁকে জানিয়ে দেবেন। বাড়ির বাইরে যখন বার হবেন, সবসময় পকেটে একটা আইডেনটিফিকেশন কার্ড রাখবেন। তাতে লেখা থাকবে আপনার গ্লকোমা আছে, আপনি গ্লকোমার জন্য কী ওষুধ ব্যবহার করছেন তা-ও লেখা থাকবে। রাস্তায় বা বাড়ির বাইরে অন্য কোনোখানে যদি কখনও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে এই কার্ড খুবই কাজে আসবে। চা, কফি, শরবৎ, এমন কি জলও একসঙ্গে খুব বেশি খাবেন না। খুব বেশি জলীয় পদার্থে চোখের মধ্যে চাপ বেড়ে যেতে পারে।

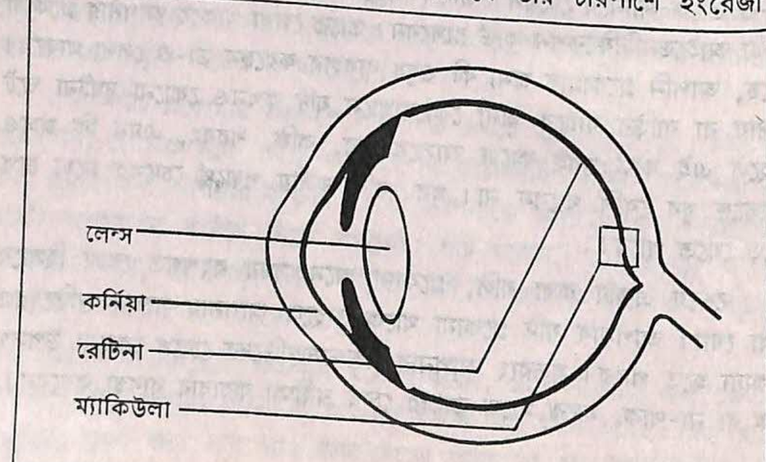
শেষে একটা কথা বলি, গ্লকোমা অনেকসময় বংশগত রোগ হিসাবে দেখা দেয়। আপনার যদি গ্লকোমা থাকে তাহলে আপনার সন্তানসন্ততিদেরও গ্লকোমা হতে পারে। সুতরাং আপনার সন্তানসন্ততিদের চোখে কোনো উপসর্গ থাক বা না-থাক, মাঝে মাঝে তাদের চোখ পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা করবেন।

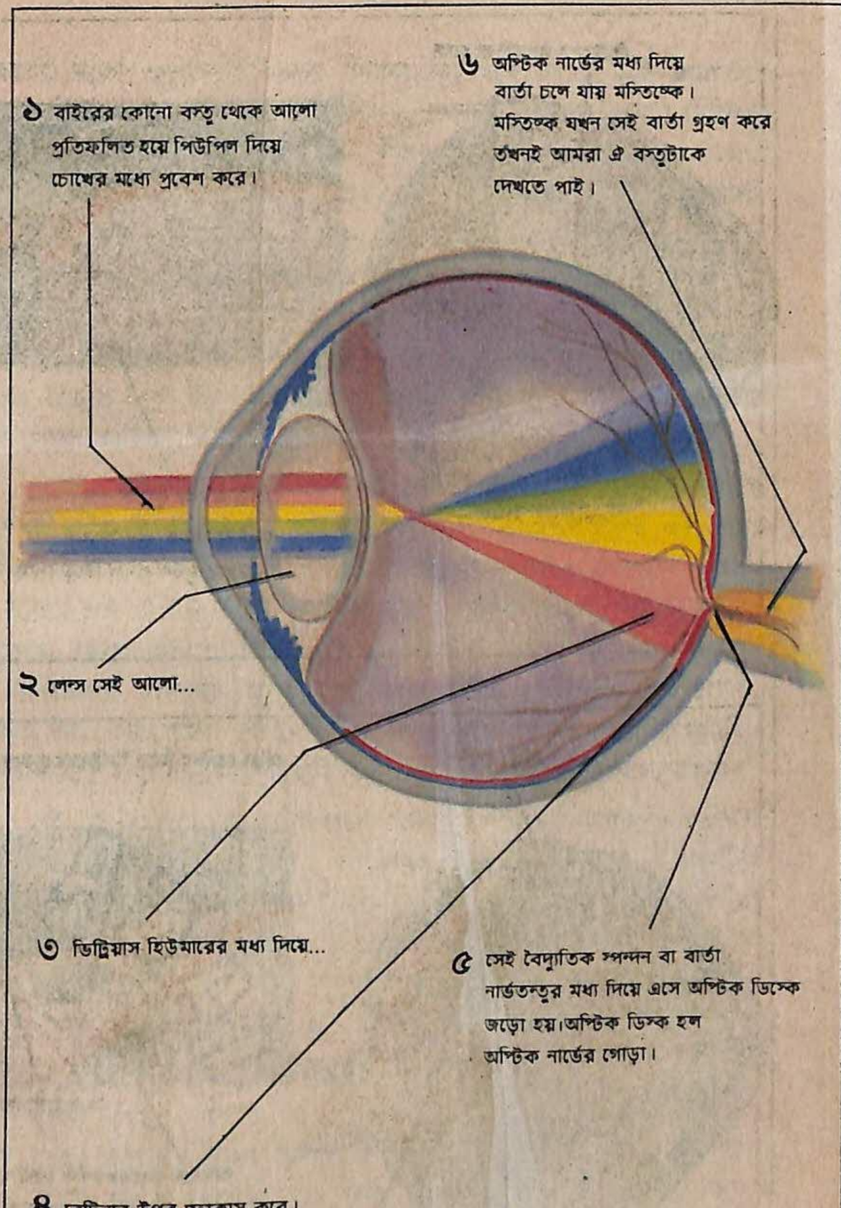
চোদ্দ : রেটিনার অসুখ

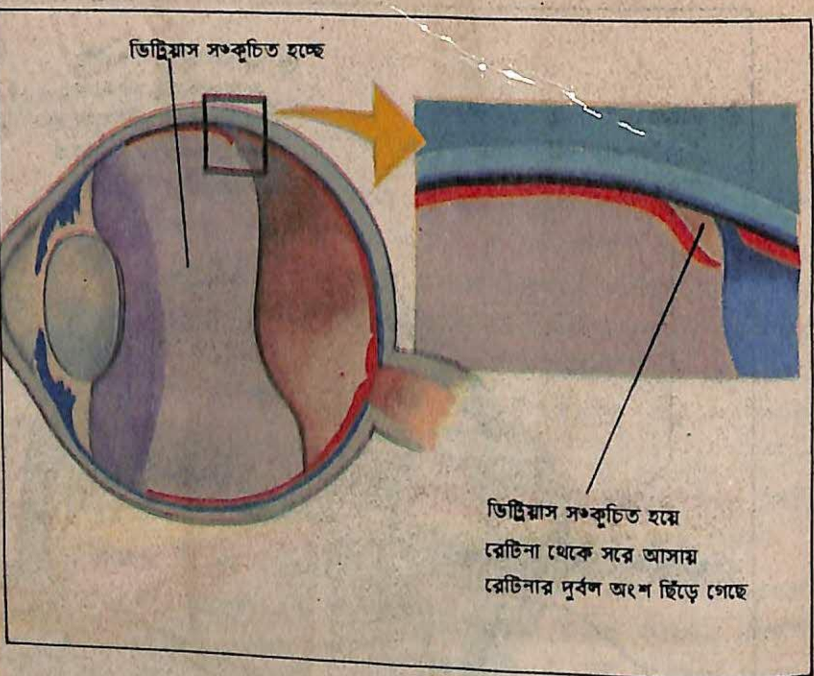
চোখের অনেক অসুখের মধ্যে রেটিনার অসুখ খুবই সাধারণ। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অসুখের শিকার হয়ে থাকেন। চোখের গঠন নিয়ে আলোচনার সময় বলা হয়েছে রেটিনা কী। আমাদের চোখের একেবারে ভিতরের যে আস্তরণ তার নাম রেটিনা। অনেকগুলি স্তরের সমষ্টি এই রেটিনা। করোয়েডের গায়ে লেগে থাকে যে স্তর সেই স্তরকে বলে পিগমেন্ট লেয়ার। সেই স্তর ছাড়া রেটিনার অন্যসব স্তর স্বচ্ছ। রেটিনা প্রায় এক মিলিমিটার পুরু এবং খুবই কোমল। একটা টিস্যু পেপারকে জলে ভেজালে যেমন দেখতে হয়, রেটিনা দেখতে অনেকটা সেইরকম। বুঝতেই পারছেন, এমন জিনিস সহজেই ছিঁড়ে-ফেটে যেতে পারে অথবা অন্যভাবে নষ্ট হতে পারে। রেটিনার অসুখ তাই বেশি।

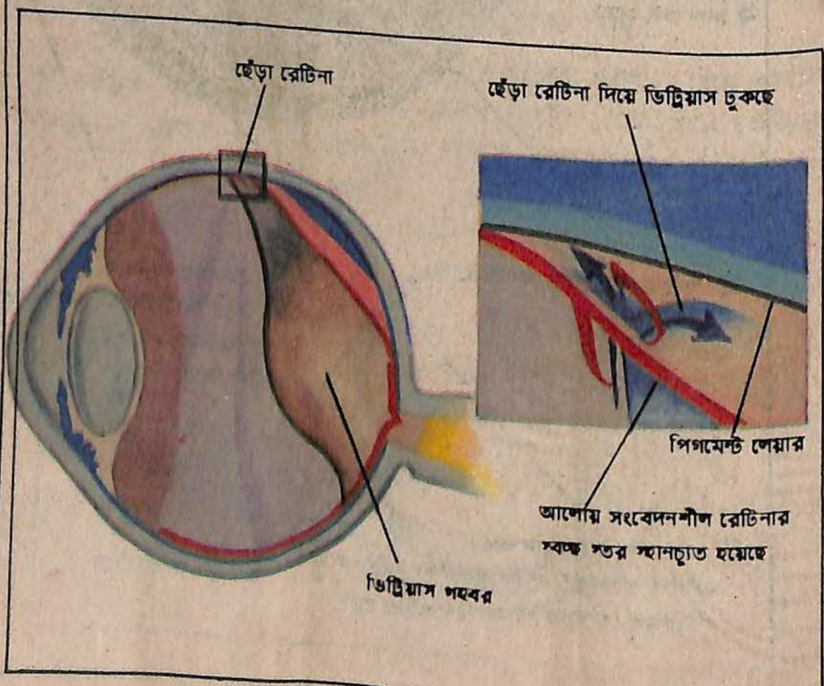
রেটিনায় কী কী গোলমাল হতে পারে তা বোঝার আগে আর-একবার যদি বুঝে নেন আমাদের দেখার ব্যাপারে রেটিনার ভূমিকা কতখানি তাহলে ভালো হয়। পাশের ছবিটার দিকে তাকান; ১ ২ ৩ করে যা লেখা আছে, ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন কীকরে আমরা দেখি।

গোটা রেটিনার ভূমিকা কিন্তু এক নয়। লেন্সের মাঝখান দিয়ে আপনি যদি কল্পনায় একটা সরলরেখা টানেন তাহলে রেখাটা সোজা গিয়ে রেটিনার মাঝখানটায় ঠেকবে। যে বিন্দুতে গিয়ে ঠেকবে তার চারপাশে ইংরেজী O




১ বাইরের কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে পিউপিল দিয়ে চোখের মধ্যে প্রবেশ করে।
২ লেন্স সেই আলো...
৩ ভিট্রিয়াস হিউমারের মধ্য দিয়ে...
৪ রেটিনার উপর ফোকাস করে। রেটিনায় অনেকগুলি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সেই আলো বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত হয়।
৫ সেই বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা বার্তা নার্ভতন্তুর মধ্য দিয়ে এসে অপ্টিক ডিস্কে জড়ো হয়।অপ্টিক ডিস্ক হল অপ্টিক নার্ভের গোড়া।
৬ অপ্টিক নার্ভের মধ্য দিয়ে বার্তা চলে যায় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক যখন সেই বার্তা গ্রহণ করে তখনই আমরা ঐ বস্তুটাকে দেখতে পাই।


ভিট্রিয়াস সংকুচিত হচ্ছে
ভিট্রিয়াস সংকুচিত হয়ে
রেটিনা থেকে সরে আসায়
রেটিনার দুর্বল অংশ ছিঁড়ে গেছে


ছেঁড়া রেটিনা
ছেঁড়া রেটিনা দিয়ে ভিট্রিয়াস ঢুকছে
পিগমেন্ট লেয়ার
আলোয় সংবেদনশীল রেটিনার
স্বচ্ছ স্তর স্থানচ্যুত হয়েছে
ভিট্রিয়াস গহবর

অক্ষরের মতো একটুখানি জায়গা সামান্য নিচু হয়ে গেছে। এই জায়গাটার নাম ম্যাকিউলা। এখানে এই ইংরেজী O অক্ষরটা যতখানি জায়গা অধিকার করে আছে, রেটিনায় প্রায় ততখানি জায়গা জুড়ে আছে ম্যাকিউলা। আমরা সোজা তাকিয়ে কোনো জিনিস যে দেখি সে এই ম্যাকিউলার জন্য। ম্যাকিউলায় আলো পড়লেই সেণ্ট্রাল ভিশন সম্ভব হয়। আমরা রংও দেখি ম্যাকিউলার জন্য। আমাদের লেখাপড়া আর যত সূক্ষ্ম হাতের কাজ সবই রেটিনার এই ছোট্ট অংশের জন্য। ম্যাকিউলাকে ঘিরে রেটিনার চারপাশে যে বিরাট অংশ সে সাইড ভিশনের জন্য, অর্থাৎ এই অংশে আলো পড়লে সোজা তাকিয়েও পাশের জিনিস দেখা যায়। এককথায়, সোজা দেখার জন্য রেটিনার মাঝখানটা আর সোজা তাকিয়ে পাশে দেখার জন্য রেটিনার বাকি অংশ।

এখন, এই কৃশ কোমল রেটিনার কোনো অংশ যদি নষ্ট হয় তাহলে আপনার দৃষ্টিও যে কিছুটা নষ্ট হবে সেকথা একরকম হলফ করেই বলা যায়। রেটিনা অনেকভাবে নষ্ট হতে পারে। রেটিনার কোন্ অংশ কতখানি কীভাবে নষ্ট হয়েছে তার উপরই নির্ভর করবে আপনার কীরকম দৃষ্টিহানি ঘটবে। রেটিনা সাধারণত যেসব কারণে বেশি নষ্ট হয় তা হল—ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন ও ম্যাকিউলার অন্যান্য অসুখ, রেটিন্যাল ব্রেক, রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট, রেটিনাইটিস, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি এবং হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি। এক-একটিতে এক-একরকম দৃষ্টিহানি ঘটে এবং প্রত্যেকটিরই চিকিৎসা আলাদা।

এই অসুখগুলির প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আকার ধারণ করে লিগ্যাল ব্লাইণ্ডনেস ঘটাতে পারে; রেটিন্যাল ব্রেক, রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট আর ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ও হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথির যদি সময়মতো চিকিৎসা না হয় তাহলে টোট্যাল ব্লাইণ্ডনেসও ঘটতে পারে। টোট্যাল ব্লাইণ্ডনেস বলতে সম্পূর্ণ অন্ধত্ব, লিগ্যাল ব্লাইণ্ডনেস সম্পূর্ণ অন্ধত্ব নয়—লো ভিশন অর্থাৎ হ্রস্বদৃষ্টি। হ্রস্বদৃষ্টি সারে না, ম্যাগনিফাইং গ্লাস ইত্যাদি নানারকম বস্তুর সাহায্যে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। সেইসব বস্তুকে বলে লো-ভিশন এড।

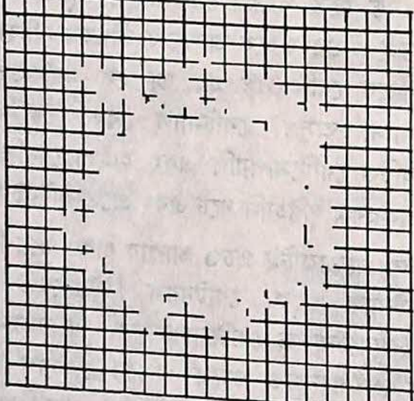
সুখের কথা, রেটিনার অধিকাংশ অসুখেরই এখন সুচিকিৎসা আছে। কয়েক বছর আগেও রেটিনার অসুখে বহু লোক অন্ধ হয়ে যেতেন, ডাক্তাররা তেমন কিছুই করতে পারতেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতির ফলে এখন রেটিনার বেশির ভাগ অসুখই তাঁদের আয়ত্তে এসেছে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁরা এখন রেটিনার বহু অসুখই সারাতে পারেন। সময়মতো সুচিকিৎসা হলে এখন আর কেউ রেটিনার অসুখে বড়ো একটা অন্ধ হন না।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির কারণ এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নি। তবে দেখা গেছে, ডায়াবিটিজ থাকলে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছোটো ছোটো রক্তবাহী শিরা দুর্বল হয়ে যায়। ডায়াবিটিজের উপর যদি স্ত্রীলোকদের গর্ভসঞ্চার হয় অথবা হাই ব্লাড প্রেশার দেখা দেয় তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে।

ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন ও ম্যাকিউলার অন্যান্য অসুখ

কোনো কারণে ম্যাকিউলা যদি নষ্ট হয়ে যায় অথবা ভেঙে পড়ে তাহলে যে ঘটনা ঘটে, ডাক্তাররা তাকে ইংরেজী করে বলেন ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন। এই অসুখে কোনো জিনিসের মাঝখানটা ছাড়া অন্যান্য জায়গা স্পষ্টই দেখা যায়।

রেটিনার উপর যে ছবি পড়ে তার মাঝখানটা থাকে ম্যাকিউলায়। তাই ম্যাকিউলা নষ্ট হয়ে গেলে ছবির মাঝখানটা দেখা যায় না। মনে হয়,



কেউ যেন ছবির এই জায়গাটা খাবলে নিয়েছে। তাছাড়া ছবিটা ভালোই দেখা যায়। খাবলানো জায়গার চারপাশে দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। সুতরাং ম্যাকিউলার ডিজেনারেশনে পুরো অন্ধত্ব ঘটে না।

ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন সাধারণত বয়স্কদেরই হয়, কিন্তু কেবল বয়োবৃদ্ধির কারণেই সবসময় চোখের মধ্যদৃষ্টি নষ্ট হয় না। তবু লেখাপড়া এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম চোখের কাজ করতে না পারার একটা বড়ো কারণ ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন।

সবচেয়ে বেশি যে ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন দেখা যায় তাকে বলে ইনভলুশনাল ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন। সাধারণত বার্ধক্যেই এই অসুখ হয়।

ম্যাকিউলার টিস্যুর ভাঙনে অথবা সেখানকার টিস্যু দুর্বল হয়ে যাওয়ায় এই অসুখ হয়।

ম্যাকিউলার আর-একরকম অসুখ আছে, তাকে বলে ম্যাকিউলার ঈডিমা অথবা সেণ্ট্রাল সেরাস রেটিনোপ্যাথি। চোখের পিছনদিকে পুষ্টি যোগায় অতি সূক্ষ্ম একধরনের রক্তবাহী শিরা-উপশিরা। এইসব শিরা-উপশিরা থেকে ম্যাকিউলাকে আলাদা করে রাখার জন্য মাঝখানে খুব পাতলা একটা টিস্যুর আস্তরণ থাকে। কখনও কখনও এই শিরা-উপশিরাগুলি ভেঙে যায় অথবা তাতে ছিদ্র সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে স্কার টিস্যু অর্থাৎ মরা টিস্যু তৈরি হয়। স্কার টিস্যুর মধ্যে অনেকসময়েই অস্বাভাবিক প্রকৃতির রক্তবাহী শিরা-উপশিরা জন্মায়। এই যে স্কার টিস্যুর মধ্যে অস্বাভাবিক প্রকৃতির নতুন রক্তবাহী শিরা-উপশিরা জন্মায়, সেই শিরা-উপশিরাগুলি খুবই ভঙ্গুর। এগুলি খুব সহজেই ভেঙে যায়। তখন তা থেকে যে রক্ত ও অন্যান্য তরল পদার্থ বার হয় তাতে ম্যাকিউলা নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন করে স্কার টিস্যু তৈরি হয়। তখন কোনো জিনিসের দিকে তাকালে সেই জিনিসটা বিকৃত এবং অস্পষ্ট দেখায়। ম্যাকিউলায় যদি খুব বেশি স্কার টিস্যু থাকে তাহলে চোখের মধ্যদৃষ্টি প্রচণ্ডভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, তখন জিনিসটার মাঝখানটাকে খাবলানো মনে হয়।

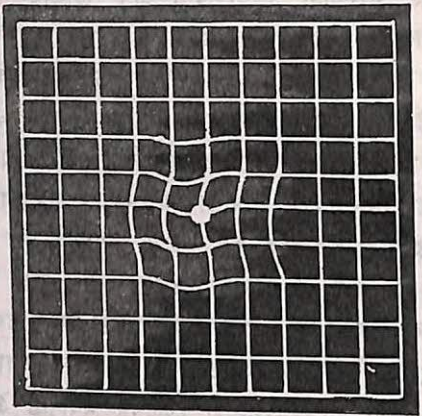
অন্যান্য ধরনের ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন বংশগত, বয়সের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। চোখে আঘাত লাগলে, রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে অথবা প্রদাহ সৃষ্টি হলে ম্যাকিউলার সুক্ষ্ম কোমল টিস্যু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

যদি একটা চোখে ম্যাকিউলার অসুখ হয় তাহলে প্রথম অবস্থায় বড়ো একটা ধরা পড়ে না, বিশেষ করে আর-একটা চোখ যদি ভালো থাকে। ম্যাকিউলার অসুখ সাধারণত একটা চোখেই প্রথমে হয় এবং তখন অন্য চোখে ভালো দেখা যায় বলে কোনো জিনিস দেখতে তেমন অসুবিধা হয় না। ফলে, অসুখ ধরা পড়তে অনেকসময়েই দেরি হয়ে যায়।

ম্যাকিউলার অসুখে এক-একজনের চোখে এক-একরকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই অসুখে অনেকসময় মাত্র একটা চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়, অন্য চোখ বহু বছর ভালো থাকে। যদি দু চোখেই অসুখ হয় তাহলে লেখাপড়া বা অন্য কোনো চোখের কাজ করতে খুবই অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু ম্যাকিউলার কোনো অসুখেই লোকে সম্পূর্ণ অন্ধ হয় না। এই অসুখে পার্শ্বদৃষ্টি অক্ষুন্ন থাকে বলে মানুষ একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে না।

ম্যাকিউলার অসুখে 'কালার ভিশন' অস্পষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ রঙিন

জিনিস অনুজ্জ্বল দেখায়। দেখার ব্যাপারে আরও কতকগুলি অসুবিধা সৃষ্টি হয়। যেমন—লেখা ঝাপসা দেখায়; সরলরেখা মনে হয় বেঁকে গেছে, কখনও কখনও মাঝখানটা বেশি বাঁকা মনে হয়; এবং দৃষ্টির মাঝখানে খানিকটা জায়গা কালো কিংবা ফাঁকা দেখায়।



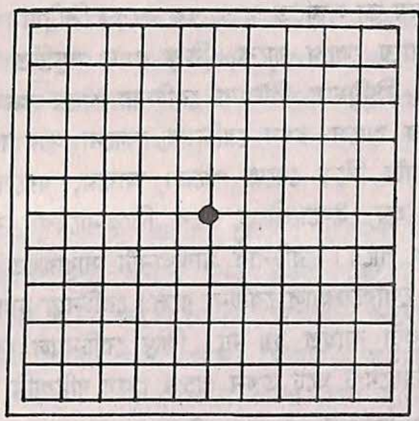
প্রথম অবস্থায় অনেকে বুঝতেই পারেন না, তাঁরা ম্যাকিউলার অসুখে ভুগছেন। অনেক পরে দৃষ্টি যখন অনেকখানি ঝাপসা হয়ে যায় তখনই তাঁরা সন্ত্রস্ত হন। চক্ষুবিশেষজ্ঞেরা কিন্তু কতকগুলি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে একেবারে গোড়াতেই ম্যাকিউলার অসুখ ধরতে পারেন। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যপরীক্ষার অঙ্গ হিসাবে যদি চোখও পরীক্ষা করানো হয় তাহলে এই অসুখ গোড়ায় ধরা পড়ে। এই অসুখ গোড়ায় ধরা পড়া খুবই জরুরী। গোড়ায় যদি অসুখ ধরা পড়ে তাহলে ক্ষতি যা হয়ে গেছে তা সারানো না গেলেও নতুন করে যাতে ক্ষতি হতে না পারে লেজারের সাহায্যে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ক্ষতি যা হয়েছে তার প্রতিকার হিসাবে লো-ভিশন এড দেওয়া যেতে পারে।

সবচেয়ে বেশি যে ইনভল্যুশনাল ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন দেখা যায় তার কোনো চিকিৎসা এখনও পর্যন্ত নেই। তবে ম্যাকিউলার ঈডিমার চিকিৎসা আছে। সে চিকিৎসায় অসুখ সারানো যায় না, অসুখ যাতে তাড়াতাড়ি বাড়তে না পারে তার ব্যবস্থা করা যায়। ম্যাকিউলার ঈডিমা যদি একেবারে গোড়ায় ধরা পড়ে তাহলে লেজারের সাহায্যে তার গতিবৃদ্ধি কমানো যায়। তাতে চোখের দৃষ্টি আর বেশি নষ্ট হতে পারে না।

সুতরাং ম্যাকিউলার অসুখ একেবারে প্রথম অবস্থাতেই যাতে ধরা পড়ে

সেজন্য সতর্ক হওয়া দরকার। আপনার বয়স যদি পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়ে থাকে অথবা আপনার পরিবারে কারও যদি রেটিনার অসুখ থেকে থাকে তাহলে মাঝে মাঝেই আপনার চোখ পরীক্ষা করাবেন। মনে রাখবেন, কেবল চক্ষুবিশেষজ্ঞই আপনার চোখ ভালোভাবে পরীক্ষা করতে পারেন। অতএব কোনো চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছেই যাবেন।

আপনি নিজেও মোটা দাগের একটা পরীক্ষা করে অনেকসময় ধরতে পারেন আপনার চোখে ম্যাকিউলার অসুখ শুরু হয়েছে কিনা। এই পরীক্ষার জন্য একটা গ্রাফ পেপার নেবেন, তার ঠিক মাঝখানে কালি দিয়ে মোটা করে



একটা বিন্দু আকবেন, তারপর এক চোখ ঢেকে অন্য চোখ দিয়ে বিন্দুটার দিকে সোজা তাকাবেন। বিন্দুটার চারপাশের রেখাগুলি যদি ঢেউ-খেলানো মনে হয় অথবা বাঁকা দেখায় তাহলে আপনার চোখে ম্যাকিউলার অসুখ আছে ধরে নিতে পারেন। দু চোখই এইভাবে পরীক্ষা করবেন।

কিন্তু এই পরীক্ষাটাকে কখনও চূড়ান্ত পরীক্ষা বলে মনে করবেন না। চূড়ান্ত পরীক্ষা করবেন চক্ষুবিশেষজ্ঞ। সুতরাং আপনার পরীক্ষায় যদি ম্যাকিউলার অসুখ আছে ধরা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুবিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হবেন।

রেটিন্যাল ব্রেক

আগেই বলেছি, রেটিনা খুবই পলকা একটা পর্দা বা ঝিল্লী। সুতরাং খুব সহজেই তা ছিঁড়ে যেতে পারে। রেটিনা ছিঁড়ে গেলে তাকে রেটিন্যাল ব্রেক বলে।

রেটিনা ছিঁড়ে গিয়েই ক্ষান্ত থাকে না। রেটিনা পরতে পরতে সাজানো কতকগুলি স্তরের সমষ্টি, রেটিনা ছিঁড়ে গেলে সেই স্তরগুলি অনেকসময় একটা থেকে আর-একটা আলাদা হয়ে যায়।

অনেকে রেটিনা ছিঁড়ে যাবার প্রবণতা নিয়েই জন্মান। তাঁরা যখন জন্মান তখন তাঁদের রেটিনা ছেঁড়া থাকে না; রেটিনার কোথাও এমন দুর্বল থাকে যে, একটুতেই পরে ছিঁড়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারটা যদি আগেই ধরা যায় তাহলে চিকিৎসা করে অন্ধত্ব বা প্রচণ্ড রকম দৃষ্টিহানি রোধ করা সম্ভব হয়।

রেটিনা ছিঁড়ে যাবার ঘটনাকে একটা বয়সের অসুখও বলতে পারেন। চোখের মধ্যে লেন্সের পিছনদিকে যে ভিট্রিয়াস হিউমার থাকে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকসময় তা সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। ভিট্রিয়াস হিউমার স্বাভাবিক অবস্থায় রেটিনার গায়ে লেগে থাকে, কিন্তু যখন সঙ্কুচিত হয় তখন রেটিনা থেকে সরে আসে। ভিট্রিয়াস হিউমার রেটিনার গায়ে আলতো করে লেগে থাকলেও যখন সরে আসে তখন রেটিনার কোনো জায়গা যদি দুর্বল থাকে তাহলে সেই জায়গাটা ছিঁড়ে যেতে পারে। আবার, বয়সের জন্য রেটিনার টিস্যুর যে অবক্ষয় হয়, ইংরেজীতে যাকে ডিজেনারেশন বলে তার দরুনও রেটিনা ছিঁড়ে যেতে পারে। রেটিনার মাঝখানটা সাধারণত ছেঁড়ে না, ছেঁড়ে পাশের অংশ যাকে পেরিফেরাল রেটিনা বলে। রেটিনার মাঝখানটা ঠিক থাকে বলে দৃষ্টি বড়ো একটা ব্যাহত হয় না। কিন্তু রেটিন্যাল ব্রেকের দরুন পরে যখন রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট ঘটে তখন প্রচণ্ড রকম দৃষ্টিহানি হয়।

রেটিনা আস্তে আস্তেই ছেঁড়ে। রেটিনা যে ছিঁড়তে শুরু করেছে, অনেক সময় তা বোঝাই যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে কখনও কখনও ওয়ার্নিং সিমটম দেখা দেয়, যেমন—হঠাৎ হঠাৎ চোখে আলোর ঝলক দেখা, চোখের মধ্যে ছোটো ছোটো কালো পোকার মতো বা কেঁচোর মতো কিছু ভাসতে দেখা কিংবা চোখের সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া বা মাকড়সার জাল দেখা।

এইরকম কোনো উপসর্গ দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবেন। ডাক্তার যদি দেখেন, রেটিনার ছেঁড়াটা তেমন মারাত্মক কিছু না তাহলে হয়তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করবেন না। তিনি কেবল মাঝে মাঝে দেখতে চাইবেন, ছেঁড়াটা বাড়ছে কিনা। সুতরাং ডাক্তার যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলবেন, দেখা করবেন। এখানে আপনার নিজেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, আপনার দৃষ্টি কমছে কিনা; এবং যখনই কোনো অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখবেন, অবিলম্বে ডাক্তারকে জানাবেন।

অস্বাভাবিক উপসর্গ বলতে ধরুন, চোখের মধ্যে ঐ যে ছোটো ছোটো পোকা বা কেঁচোর মতো ভাসতে দেখছিলেন তার প্যাটার্নের পরিবর্তন।

আপনার ডাক্তার যদি মনে করেন, চিকিৎসায় ফল হবে তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করে দেবেন। ছেঁড়া রেটিনা দু উপায়ে জোড়া দেওয়া যেতে পারে। একটা হল, ক্রায়োথেরাপি বা কোল্ড ট্রিটমেণ্ট; আর-একটা, লেজার ট্রিটমেণ্ট।

ক্রায়োথেরাপিতে রেটিনার যে জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে সেই জায়গায় চোখের উপর বাইরে থেকেই খুব ঠাণ্ডা একটা যন্ত্র ছোঁয়ানো হয়। সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা চোখের চামড়া ভেদ করে ভিতরে রেটিনায় চলে যায় এবং রেটিনার যে জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে, কেবল সেই ছেঁড়া জায়গার চারপাশটা জমিয়ে দেয়। জমে যাওয়া জায়গাটা যখন সারতে শুরু করে তখন সেখানে স্কার টিস্যু গজায় এবং ছেঁড়া জায়গার কিনারায় রেটিনার স্তরগুলি একসঙ্গে জুড়ে যায়। রেটিনার বাইরের দিকে যদি কোথাও ছিঁড়ে যায় তাহলে এই পদ্ধতিতে রেটিনা জোড়া দিলে খুবই সুফল পাওয়া যায়।

লেজার ট্রিটমেণ্ট সম্পূর্ণ উলটো। লেজার ট্রিটমেণ্ট হল তাপ-চিকিৎসা। কীভাবে এই চিকিৎসা হয় বোঝার জন্য একটা আতশী কাঁচের মধ্য দিয়ে একখণ্ড কাগজের উপর সূর্যের আলো ফেলুন। দেখবেন, আলো যেখানে অভিসারী হয়ে পড়েছে সেখানে আগুন ধরে গেছে। লেজারও অত্যন্ত ঘনীভূত আলোর রশ্মি, সেই রশ্মি যেখানে পড়ে সেখানে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়। লেজার-যন্ত্র থেকে যখন এই আলোর রশ্মি রেটিনার ছেঁড়া জায়গায় ফেলা হয় তখন সেখানে যে তাপ সৃষ্টি হয় তাতে ছেঁড়া জায়গাটা 'ঝালাই' হয়ে যায়, রেটিনার বিচ্ছিন্ন স্তরগুলি আবার একসঙ্গে জুড়ে যায়। এইভাবে যে 'ঝালাই' করা হয় তাকে বলা হয় লেজার ফোটোকোয়াগিউলেশন।

এখানে একটা কথা বলা দরকার, হিম-চিকিৎসাই হোক কি তাপ-চিকিৎসা, ছেঁড়া রেটিনা জুড়ে গেলেও কিন্তু যে দৃষ্টি আপনি হারিয়েছেন তা আর ফিরে পাবেন না। আপনার যে দৃষ্টি অবশিষ্ট আছে তা যাতে বজায় রাখা যায় তার জন্যই এই চিকিৎসা। চিকিৎসার পরেও কিন্তু নতুন জায়গা ছিঁড়তে পারে। যদি ছেঁড়ে তাহলে আবার চিকিৎসার দরকার হবে। সুতরাং একবার চিকিৎসা হয়ে গেলে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকবেন না। আবার যদি কখনও কোনো উপসর্গ দেখেন, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে জানাবেন। মনে রাখবেন, যত তাড়াতাড়ি ছেঁড়া রেটিনা জুড়ে দেওয়া যাবে, রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্টের সম্ভাবনা তত কম হবে।

তবু যদি রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট হয়, অস্ত্রোপচার করে তা আবার ঠিক করে দেওয়া যায় এবং তাতে দৃষ্টি ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়।

রেটিন্যাল ব্রেকের অপারেশনের পর দৌড়ঝাঁপ মোটে করবেন না। দৌড়ঝাঁপের খেলাধুলা একেবারে বন্ধ। খুব বেশি শরীর চালনা করতে হয় এমন কাজকর্মও বাদ দেবেন। ভারী জিনিস তুলবেন না। জোর দিয়ে কোনো কাজ করবেন না।

রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট

রেটিন্যাল ব্রেকের কথা বলতে গিয়ে কয়েকবার রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্টের কথা বলা হয়েছে। রেটিনার পিছনে থাকে করোয়েড। করোয়েড কালো রঞ্জক পদার্থের একটা আস্তরণ। এই করোয়েডের গায়েই লেগে থাকে রেটিনা। রেটিনা অনেকগুলি পাতলা স্তরের সমষ্টি, রেটিনার যে স্তরটি করোয়েডের গায়ে লেগে থাকে সেই অস্বচ্ছ পিগমেণ্ট লেয়ারটি বেশ দৃঢ়ভাবেই করোয়েডের গায়ে লেগে থাকে এবং করোয়েডের সঙ্গে তার প্রায় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু তার পরের স্বচ্ছ স্তরগুলি পরস্পরের সঙ্গে তত দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে না। তাই পরের স্তরগুলি সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অর্থাৎ একটা স্তর থেকে আর-একটা স্তর বিচ্যুত হয়ে পড়ে। চলতি কথায় একে রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট বললেও আসলে বলা উচিত রেটিন্যাল সেপারেশন।

রেটিন্যাল ব্রেক থেকেও রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট হতে পারে। রেটিনা ছিঁড়ে গেলে সময়মতো যদি জোড়া দেওয়া না হয় তাহলে বহুক্ষেত্রেই তার পরিণতি দাঁড়ায় রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট। আপনি যদি প্রচণ্ড রকম মাইওপিক অর্থাৎ নিয়ারসাইটেড হন, আপনার মা-বাবার কারও যদি রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্টের ইতিহাস থেকে থাকে, ক্যাট্যার‍্যাক্ট অপারেশনে আপনার চোখের লেন্স যদি ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে কিংবা আপনার চোখে অথবা মাথায় যদি বড়ো রকমের কোনো আঘাত লেগে থাকে তাহলে আপনার চোখে রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

রেটিনার স্বচ্ছ স্তরের মধ্যে কোন্ আর রড্ নামে দু রকম জিনিস থাকে। এই কোন্ আর রড্ খুব সহজেই আলোয় প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তাই রেটিনার উপর আলো এসে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তা বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত হয় এবং সেই স্পন্দন যখন অপ্টিক নার্ভের মারফৎ মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছয় তখন আমরা দেখতে পাই। এখন, রেটিনার পলকা স্বচ্ছ স্তর কোনো

কারণে ছিঁড়ে গেলে সেই ফাঁক দিয়ে ভিট্রিয়াস চেম্বার থেকে একটু একটু করে ভিট্রিয়াস হিউমার চুইয়ে চুইয়ে রেটিনার স্বচ্ছ স্তরের পিছনে গিয়ে জমতে থাকে আর তার চাপে রেটিনার স্বচ্ছ স্তরটি পিগমেণ্ট লেয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করে। এইভাবে রেটিনার স্বচ্ছ স্তরের বেশ কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রেটিনার এই স্বচ্ছ স্তরেই কোন্ আর রড্, তাই এই স্বচ্ছ স্তরটা যখন পিগমেণ্ট লেয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন দৃষ্টিহানি ঘটে।

রেটিনার এই যে স্থানচ্যুতি, এ আস্তে আস্তে অনেক দিন ধরেও হতে পারে, আবার একেবারে হঠাৎও হতে পারে। যেভাবেই হোক, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রচণ্ড রকম উপসর্গ দিয়েই হয়। যদি ম্যাকিউলা অর্থাৎ মধ্য রেটিনা স্থানচ্যুত হয় তাহলে এমন সাঙ্ঘাতিক দৃষ্টিহানি ঘটে যে, কেবল আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

রেটিনা যখন স্থানচ্যুত হয় তখন চোখের সামনে অনেকসময় একটা 'ছায়া' দেখা যায় অথবা মনে হয় চোখের সামনে কেউ একটা পাতলা কালো পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। কখনও কখনও আবার গোটা দৃষ্টিটাই ঝাপসা হয়ে যায়।

এইরকম কোনো উপসর্গ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবেন। সম্পূর্ণ দৃষ্টিহানি রোধ করার জন্য খুব সামান্য স্থানচ্যুতিও ঠিক করার দরকার হয়। রেটিনার স্বচ্ছ স্তরের যে অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে এসেছে, অপারেশন করে সেই অংশ আবার পিগমেণ্ট লেয়ারে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথমে ক্রায়োথেরাপির সাহায্যে রেটিনার ছেঁড়া অংশ ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়া হয়। তারপর রেটিনার স্বচ্ছ স্তর আর পিগমেণ্ট লেয়ারের মাঝে যে ভিট্রিয়াস হিউমার জমেছে তা বার করে ফেলা হয়। শেষে সিলিকোনের একটা পটি পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে চোখটাকে বেড় দিয়ে ভিতর দিকে সামান্য চেপে বসিয়ে নাইলনের সুতো দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়। সিলিকোনের পটিটা চেপে বসাবার ফলে পিগমেণ্ট লেয়ারটা রেটিনার যে অংশ সরে গেছে সেই অংশের গায়ে গিয়ে ঠেকে। পরে যখন ঠাণ্ডায় জমানো রেটিনার ছেঁড়া জায়গায় স্কার টিস্যু গজায়, ছেঁড়াটা তখন জুড়ে যায় আর স্থানচ্যুত স্বচ্ছ রেটিনার স্তর পিগমেণ্ট লেয়ারের গায়ে আগের মতো আটকে যায়। রেটিনা যে স্থানচ্যুত হয়েছিল, এইভাবে তা ঠিক করা হয়। নাইলনের সুতো দিয়ে সিলিকোনের পটিটা যে সেলাই করা হয় তা আর কাটা হয় না। সেলাই স্থায়িভাবেই চোখের মধ্যে থেকে যায়। তাতে কোনো অসুবিধা হয় না।

অনেকসময় একবার অপারেশনে হয় না। রেটিনা ঠিকভাবে ঠিক জায়গায় বসানোর জন্য কখনও কখনও দুবারও অপারেশন করতে হয়। ছজনের মধ্যে প্রায় একজনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার অপারেশন দরকার হয়। অপারেশনের পর দৃষ্টিশক্তি কতখানি ফিরে পাওয়া যাবে তা অনেকখানি নির্ভর করে রেটিনার কোন্ অংশ স্থানচ্যুত হয়েছিল তার উপর। মাঝের অংশ স্থানচ্যুত হলে খুব বেশি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যায় না। যদি কেবল পাশের অংশ স্থানচ্যুত হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগের উপর। যা-ই হোক, অপারেশন করে স্থানচ্যুত রেটিনা যদি ঠিকভাবে আবার আগের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিছুটা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যাবেই, অন্তত দৃষ্টিশক্তি আর নষ্ট হবে না। রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্টে যদি অপারেশন করা না হয় তাহলে আস্তে আস্তে দৃষ্টিহানি ঘটতে ঘটতে শেষে অনিবার্য অন্ধত্ব।

রেটিনাইটিস

রেটিনার ইনফ্ল্যামেশন বা প্রদাহকে রেটিনাইটিস না বলে কোরিও-রেটিনাইটিস বলাই ভালো। আগে বলা হয়েছে, করোয়েডের সঙ্গে রেটিনা প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে লেগে থাকে। করোয়েডের অসুখ হলে তাই রেটিনাও সহজে আক্রান্ত হয়।

যেহেতু করোয়েড মূলত শিরা-উপশিরার সমষ্টি সেইহেতু শরীরের অনেক রোগই রক্তচলাচলের মাধ্যমে করোয়েডে ছড়িয়ে পড়ে। আর, করোয়েড আক্রান্ত হলে রেটিনাও অক্ষত থাকতে পারে না বলে রেটিনাইটিস হয় এবং চোখের দৃষ্টি অল্পবিস্তর নষ্ট হয়ে যায়। যক্ষ্মা, সিফিলিস, দুষ্টক্ষত ইত্যাদি এইভাবেই রেটিনাকে চিরকালের মতো নষ্ট করে দেয়।

তাই উপসর্গ হিসাবে হঠাৎ চোখের দৃষ্টি কমে গেলে অথবা চোখের সামনে কালো কালো ফুটকি দেখতে পেলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো দরকার।

ক্যান্সার রোগও এইভাবেই করোয়েডের মাধ্যমে রেটিনায় ছড়ায়।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি

ডায়াবিটিজ মেলিটাস এমন একটা রোগ যাতে শরীরে শর্করা ও শ্বেতসার ব্যবহার করার ও সঞ্চয় করে রাখার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে, রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়, ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এবং শরীরের ব্লাড ভেস্‌ল্ অর্থাৎ

ছোটো ছোটো রক্তবাহী শিরায় পরিবর্তন ঘটে। অনেকসময় চোখেও গুরুতর রকমের পরিবর্তন দেখা যায়, বিশেষ করে চোখের রেটিনায়।

ডায়াবিটিজেরই একটা কমপ্লিকেশন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। রেটিনায় বহু ছোটো ছোটো রক্তবাহী শিরা আছে, এই শিরাগুলি রেটিনাকে পুষ্টি যোগায়। ডায়াবিটিজে রেটিনার এই ছোটো ছোটো রক্তবাহী শিরা নষ্ট হয়ে যায়, তার ফলে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হয়।

রেটিনার রক্তবাহী শিরা নষ্ট হয়ে গেলে তা থেকে সিরাম বা রক্ত বার হতে পারে, তার গায়ে ঝাড়ের মতো ভঙ্গুর শাখাপ্রশাখা গজাতে পারে এবং কোথাও কোথাও শিরা ফুলে উঠতে পারে।

এইরকমভাবে রেটিনায় গণ্ডগোল সৃষ্টি হলে দৃষ্টি ব্যাহত হতে পারে। রেটিনার উপর আলো এসে বাইরের বস্তুর একটা ছবি তৈরি করে, আর রেটিনা সেই ছবিটাকে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করে অপ্টিক নার্ভের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পাঠায় বলেই আমরা বস্তুটা দেখতে পাই। এখন, সিরাম বা রক্ত নিঃসরণের ফলে যদি রেটিনা নষ্ট হয়ে যায় অথবা তাতে ক্ষত সৃষ্টি হয় তাহলে রেটিনার উপর যে ছবি তৈরি হবে তা স্পষ্ট হবে না এবং মস্তিষ্কে যে বৈদ্যুতিক স্পন্দন যাবে তা ক্ষীণ হবে। ফলে, বস্তুটা ঝাপসা দেখাবে।

যাঁরা অনেকদিন ধরে ডায়াবিটিজে ভুগছেন তাঁদেরই বেশি ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হবার সম্ভাবনা থাকে। দশ বছরের উপর ডায়াবিটিজে ভুগছেন এমন লোকদের শতকরা প্রায় ৫০ জনের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হতে দেখা যায়। যাঁরা পনের বছরের উপর ডায়াবিটিজে ভুগছেন তাঁদের শতকরা প্রায় ৬০ জনের চোখের রেটিনার কিছু-না-কিছু রক্তবাহী শিরা নষ্ট হয়ই। তবে সুখের কথা, যাঁদের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হয় তাঁদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকেরই দৃষ্টি খুব বেশি ব্যাহত হয় এবং আরও কমসংখ্যক লোকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়।

তবু অন্ধত্বের একটা বড়ো কারণ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, নন-ডায়াবেটিকদের চেয়ে ডায়াবেটিকদের অন্ধ হবার সম্ভাবনা ২৫ গুণ বেশি। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি সাধারণত একসঙ্গে দু চোখেই হয়।

দু ধরনের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আছে—একটা, ব্যাকগ্রাউণ্ড ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি; আর-একটা, প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। ব্যাকগ্রাউণ্ড রেটিনোপ্যাথিকে বলা হয় ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির পূর্বাবস্থা।

ব্যাকগ্রাউণ্ড রেটিনোপ্যাথিতে রেটিনার ভিতরকার রক্তবাহী শিরাগুলি

আকারে আয়তনে বদলে যায়। কিছু শিরা আয়তনে ছোটো হয়ে যায় আর কিছু শিরা আয়তনে বড়ো হয়ে যায় এবং তাদের গায়ে বেলুনের মতো অনেক থলে তৈরি হয়। এই থলে তৈরি হবার ফলে শিরার ভিতর দিয়ে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়। সেই বাধায় শিরা ফেটে গিয়ে তার ভিতর থেকে সিরাম নামে একরকম পরিষ্কার তরল পদার্থ বার হয়, তাতে রেটিনা ফুলে যায় আর রেটিনার উপর সিরামের ফ্যাট ও প্রোটিন কণা জমে।

রেটিনার মাঝখানে অর্থাৎ ম্যাকিউলায় যদি শিরা ফেটে গিয়ে সিরাম বার হয় তাহলে ম্যাকিউলার টিস্যুগুলি ফুলে ওঠে। তার ফলে মধ্যদৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। এই যে সিরাম বার হয়, শিরাগুলি পরে আবার তা শোষণ করে নেয়। তখন ঝাপসা ভাবটা কেটে যায়। একসঙ্গে দিনকয়েকের বেশি ঝাপসা ভাব সাধারণত থাকে না। কিন্তু যে হারে সিরাম শোষণ হয় তার চেয়ে বেশি হারে যদি সিরাম বার হয় তাহলে ঝাপসা ভাব কাটতে পারে না। তখন সবসময়েই কিছু-না-কিছু সিরাম থাকে এবং সিরামের ফ্যাট আর প্রোটিন কণা জমে। কিন্তু তার জন্য দেখায় খুব একটা ব্যাঘাত ঘটে না। রেটিনার রক্তবাহী শিরা ফেটে রেটিনার মধ্যে রক্তস্রাবও হতে পারে। তাতেও সাধারণত দেখায় ব্যাঘাত ঘটে না, কারণ এইভাবে খুব কমই রক্তপাত হয় এবং রেটিনার মাঝখানে ম্যাকিউলা অংশে তা হয় না।

ম্যাকিউলায় যদি সিরাম জমে তাহলেই দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। আর, ম্যাকিউলার কোনো ক্ষতি না হলে ব্যাকগ্রাউণ্ড রেটিনোপ্যাথির কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না—চোখে কোনো ব্যথাবেদনা হয় না, চোখ লাল হয় না, চোখে ইরিটেশন হয় না, চোখে পিচুটি বা অন্য কিছু জমে না, চোখ থেকে জলও ঝরে না। এই ধরনের ব্যাকগ্রাউণ্ড রেটিনোপ্যাথি চোরাগোপ্তাভাবে এগিয়ে চলে এবং শেষে প্রচণ্ড আকারে আত্মপ্রকাশ করে অন্ধত্ব ডেকে আনে।

সেই কারণে যাঁদের ডায়াবিটিজ আছে, চোখে কোনো উপসর্গ দেখা না গেলেও বছরে অন্তত একবার তাঁদের চোখ পরীক্ষা করানো দরকার। আর, যদি দৃষ্টিহানি হতে থাকে তাহলে রোগের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তিন-চার মাস অন্তর চোখ পরীক্ষা করানো দরকার। পরীক্ষায় ব্যাকগ্রাউণ্ড রেটিনোপ্যাথি ধরা পড়লেই অমনি ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করে দেন না। রোগীর বয়স, ইতিহাস, জীবনধারা এবং রেটিনার কতখানি ক্ষতি হয়েছে তা বিচার করে তিনি স্থির করেন, এখনই চিকিৎসা শুরু করবেন, না রোগ কত এগোয় তা দেখার জন্য কিছু অপেক্ষা করবেন। অনেকক্ষেত্রে চিকিৎসার দরকারই হয় না, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতি রোধ করার জন্য এবং কখনও কখনও দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটানোর জন্য চিকিৎসার দরকার হয়।

চিকিৎসা বলতে প্রধানত লেজার ফোটোকোয়াগিউলেশন। এই পদ্ধতিতে চোখে অস্ত্রোপচার করতে হয় না। এতে কেবল রেটিনার ক্ষতিগ্রস্ত অংশে শক্তিশালী লেজার-রশ্মি ফেলা হয়। লেজার-রশ্মির প্রচণ্ড তাপে রক্তবাহী শিরার ফাটলগুলি 'ঝালাই' হয়ে যায় এবং সেখান দিয়ে আর সিরাম বার হতে পারে না।

রোগ গোড়ার দিকে ধরা পড়লে লেজার-চিকিৎসায় উপকার পাওয়া যায়। রেটিনার আর ক্ষতি হতে পারে না। লেজার-চিকিৎসা যদি কখনও ক্ষতি পুরোপুরি বন্ধ করতে না-ও পারে, তবু বড়ো রকমের ক্ষতি অনেকদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে। বড়ো রকমের ক্ষতি প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথিতে। ব্যাকগ্রাউণ্ড রেটিনোপ্যাথির পরের অবস্থাই প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথি।

ডায়াবিটিজ যত পুরনো হবে, প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথির সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। অ্যাডভান্সড স্টেজ বলতে যা বোঝায়, ডায়াবিটিজ সেই অবস্থায় পৌঁছলে প্রতি দশজনের মধ্যে একজনের প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথি হতে দেখা যায়। প্রলিফারেটিভ বলতে, যা প্রলিফারেট করে অর্থাৎ বৃদ্ধি পায়, ছড়ায়। ব্যাকগ্রাউণ্ড রেটিনোপ্যাথি বৃদ্ধি পেয়ে প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথি হয়। প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথিতে রেটিনার ভিতর দিকের গায়ে কিংবা অপ্টিক নার্ভে নতুন নতুন অস্বাভাবিক রক্তবাহী শিরা গজায় এবং কখনও কখনও সেই শিরাগুলির এমন বাড় হয় যে, রেটিনা ছাড়িয়ে ভিট্রিয়াস হিউমারের মধ্যে ঢুকে যায়।

এইসব দুর্বল শিরা প্রায়ই ফেটে গিয়ে ভিট্রিয়াসের মধ্যে রক্তপাত ঘটায়। রক্তপাত বেশি হলে স্বচ্ছ ভিট্রিয়াস তার স্বচ্ছতা হারায়। তখন লেন্স থেকে রেটিনায় আলো পৌঁছবার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

এ ছাড়া ভিট্রিয়াসের মধ্যে ফেটে-যাওয়া শিরাগুলিতে যে স্কার টিস্যু জন্মায় তাতেও দৃষ্টি ব্যাহত হয়। এই টিস্যু পরে অনেকসময় সঙ্কুচিত হয়। ভিট্রিয়াসের মধ্যে টিস্যু যখন সঙ্কুচিত হয় তখন রেটিনায় টান পড়ে, সেই টান সহ্য করতে না পেরে কখনও কখনও রেটিন্যাল ডিট্যাচমেন্ট ঘটে। অর্থাৎ, রেটিনা স্থানচ্যুত হয়। রেটিনার এইরকম স্থানচ্যুতিকে বলে ট্র্যাকশন রেটিন্যাল ডিট্যাচমেন্ট। আইরিসের উপরেও কখনও কখনও রক্তবাহী শিরা গজাতে দেখা যায়। তাতে এক ধরনের গ্লকোমা হয়। এইসব কারণে প্রচণ্ড রকম দৃষ্টিহানি ঘটে, অন্ধত্বও ঘটে অনেকসময়।

ভিট্রিয়াসের মধ্যে সামান্য রক্তপাত হলেও দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। অবশ্য সামান্য রক্তপাত হলে কয়েকদিনের মধ্যে তা মিলিয়ে যায়। তখন দৃষ্টি

আবার পরিষ্কার হয়ে আসে। কিন্তু যদি রক্তপাত হতেই থাকে তাহলে মাসের পর মাস দৃষ্টি ঝাপসা থাকতে পারে এবং তখন চোখে একটা লাল রং দেখা যেতে পারে।

ভিট্রিয়াসের মধ্যে স্কার টিস্যুর দরুন দেখায় বিকৃতি ও ঝাপসা-ভাব আসে যদি রেটিনার মাঝের অংশ স্থানচ্যুত হয়। পেরিফেরাল রেটিনা অর্থাৎ রেটিনার পাশের অংশে কোথাও যদি স্থানচ্যুতি ঘটে তাহলে কোনো উপসর্গই দেখা যায় না।

সেইজন্যই যাঁদের ডায়াবিটিজ আছে তাঁদের চোখে কোনো উপসর্গ দেখা না গেলেও মাঝে মাঝে চোখ পরীক্ষা করানো দরকার-বছরে অন্তত একবার। আর, দৃষ্টিহানি ঘটতে থাকলে তিনমাস কি চারমাস অন্তর চোখ পরীক্ষা করানো উচিত। প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথি যদি সময়মতো ধরা না পড়ে তাহলে ফল মারাত্মক হতে পারে।

প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথির এখন ভালো চিকিৎসা আছে। প্যান-রেটিন্যাল ফোটোকোয়াগিউলেশন নামে এক ধরনের লেজার-চিকিৎসার সাহায্যে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথি আটকানো যায়। এই পদ্ধতিতে গোটা পেরিফেরাল রেটিনায় লেজার প্রয়োগ করা হয়। তাতে রেটিনার কিছু ভালো টিস্যু নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক রক্তবাহী শিরা গজানো অনেকক্ষেত্রেই কমে যায়। তাছাড়া আগের গজানো বহু অস্বাভাবিক রক্তবাহী শিরা নষ্টও হয়। এই চিকিৎসায় পেরিফেরাল ভিশন আর নাইট ভিশন কিছু নষ্ট হয় সত্যি, কিন্তু সেন্ট্রাল ভিশন আর কালার ভিশন রক্ষা করা যায়—যা অনেক বেশি দরকারী।

রেটিনোপ্যাথি একসঙ্গে দু চোখেই হয়। কিন্তু একসঙ্গে দু চোখের চিকিৎসা হয় না বলে চিকিৎসার ফল কয়েক সপ্তাহ, এমন কি বেশ কয়েক মাস বোঝা যায় না। প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথিতেও ব্যাকগ্রাউণ্ড রেটিনোপ্যাথির মতো ম্যাকিউলায় লেজার-চিকিৎসার দরকার হতে পারে। প্যান-রেটিন্যাল ফোটোকোয়াগিউলেশনের পরও লেজার-চিকিৎসার দরকার হতে পারে বলে মাঝে মাঝে চেক-আপের জন্য ডাক্তারের কাছে যাবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথিতে যদি চোখের অনেকখানি ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকে এবং রক্তপাতের ফলে ভিট্রিয়াসও অনেকখানি অস্বচ্ছ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ভিট্রেকটমি নামে এক ধরনের অস্ত্রোপচার করার দরকার হয়। তাতে চোখ কেটে রক্তে-ভরা অস্বচ্ছ ভিট্রিয়াস বার করে ফেলা হয়, তারপর সেই

জায়গায় স্বচ্ছ কৃত্রিম সল্যুশন ভরে দেওয়া হয়। যদি স্কার টিস্যু থাকে তা-ও কেটে বাদ দেওয়া হয়। তাতে রেটিনার উপর থেকে টানটা চলে যায়। ভিট্রেকটমিতে শতকরা ৭০ জনের চোখের দৃষ্টির উন্নতি ঘটতে দেখা যায়।

অনেকসময় রক্তপাতের দরুন ভিট্রিয়াস অস্বচ্ছ হয়ে যাবার পরই ভিট্রেকটমি করা হয়, আবার কখনও কখনও ডাক্তার ছ মাস কি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেন আপনা থেকে রক্ত মিলিয়ে যায় কিনা দেখার জন্য। ব্যাপারটা নির্ভর করে চোখের কতখানি ক্ষতি হয়েছে তার উপর। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, ভিট্রেকটমি করা হয় ডায়াবিটিজের দরুন চোখের অনেকখানি ক্ষতি হয়ে যাবার পর, সুতরাং এই অপারেশনে খুব বেশি স্পষ্ট-দৃষ্টি আশা করা যায় না।

আর-একটা কথা, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির জন্য যদি রেটিন্যাল ডিট্যাচমেন্ট ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করে রেটিনাকে যদি তার আগের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে সাঙ্ঘাতিক রকমের দৃষ্টিহানি ঘটতে পারে, এমন কি অন্ধত্বও ঘটতে পারে।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির চিকিৎসার সাফল্য কত তাড়াতাড়ি রোগ ধরা পড়েছে এবং কীরকম চিকিৎসা হয়েছে, কেবল তার উপরই নির্ভর করে না, রোগীর সচেতনতা এবং নিজের প্রতি তিনি কতখানি যত্নবান তার উপরও নির্ভর করে। ডায়াবিটিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাঁকে নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে এবং খাদ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যাকগ্রাউণ্ড রেটিনোপ্যাথিতে দৌড়ঝাঁপ খুব বেশি সমস্যা সৃষ্টি না করলেও প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথিতে দৌড়ঝাঁপ রক্তপাত বাড়িয়ে দিতে পারে। যাঁদের প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথি আছে তাঁরা বেশি ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করবেন না এবং যাকে স্ট্রেন করা বলে তা এড়িয়ে চলবেন আর মাথা ঝোঁকাবেন না।

হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি

হাই ব্লাড প্রেশারের দরুন যে রেটিনোপ্যাথি হয় তাকে বলে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি। হাই ব্লাড প্রেশারের অন্য নাম হাইপারটেনশন। হাই ব্লাড প্রেশার অর্থাৎ রক্তের অধিক চাপের দরুন চোখের মারাত্মক ক্ষতি হয়। নিয়মিত ওষুধ খেয়ে রক্তের চাপ সীমার মধ্যে রাখলে এই ক্ষতি অনেকাংশেই এড়ানো সম্ভব।

ডায়াবিটিজের মতো হাই ব্লাড প্রেশারেও রেটিনোপ্যাথি হয়, অর্থাৎ রেটিনায় রক্তক্ষরণ হয়, রেটিনার নার্ভকোষ নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া রেটিনার ছোটোবড়ো

যে কোনো শিরায় থ্রম্বোসিসও হতে পারে। কোন্ শিরায় থ্রম্বোসিস হয়েছে তার উপরই নির্ভর করে কতটা দৃষ্টি নষ্ট হবে। রেটিনার মধ্যশিরা অর্থাৎ সেন্ট্রাল ভেইনে থ্রম্বোসিস হলে প্রায় ক্ষেত্রেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। থ্রম্বোসিসের জন্য না হলেও পরবর্তী কালে কমপ্লিকেশন হিসাবে এই চোখের চাপ বেড়ে গিয়ে অর্থাৎ গ্লকোমা হয়ে চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। এই ধরনের চোখে এত অসহ্য ব্যথা হয় যে, চোখ তুলে ফেলা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

পনের : চোখের পাতার অসুখ

বাইরের আঘাত থেকে চোখ রক্ষা করাই চোখের পাতার প্রধান কাজ। এ ছাড়াও চোখের পাতার কাজ আছে—আমাদের চোখের পাতা যে অনবরত বন্ধ হয় আর খোলে তাতে চোখে ঝাঁট পড়ে। চোখের জল দিয়ে চোখের পাতা সারাক্ষণই চোখে ঝাঁট দেয়। তাতে চোখ ধোয়া হয়ে যায়। কর্নিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য চোখের জল দিয়ে সারাক্ষণ কর্নিয়া ধোয়া একান্ত দরকার।

কিন্তু কোনো কারণে যদি চোখের পাতা তোলার ক্ষমতা লোপ পায় তাহলে চোখে ঝাঁট পড়ে না, চোখ ধোয়া হয় না। তখন কর্নিয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সাধারণত জন্মগত কারণে অথবা নার্ভের প্যারালিসিস হলে চোখের পাতা তোলার ক্ষমতা থাকে না। এই অক্ষমতাকে টোসিস বলে। হঠাৎ টোসিস হলে চোখের নার্ভের প্যারালিসিস হওয়াই সম্ভব।

অনেকসময় আবার চোখের পাতা সর্বক্ষণই খুলে থাকে, কিছুতেই বন্ধ করা যায় না। এ-ও এক ধরনের অসুখ। এই অসুখকে বলে ল্যাগ-অফথ্যালমোস। সাধারণত ফেসিয়াল নার্ভের প্যারালিসিস হলে এই অসুখ হয়। এই অসুখে মুখ বেঁকে যায় এবং মুখে খাবার দিলে খাবার শুধু একদিকে চলে যায়। এইরকম হলে ডাক্তার দেখিয়ে ফেসিয়াল প্যারালিসিসের কারণ বার করে তার সঠিক চিকিৎসা করা উচিত।

ল্যাগ-অফথ্যালমোস হলে চোখে মলম লাগিয়ে তুলো চাপা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখা প্রয়োজন, নইলে কর্নিয়ার নিচে ঘা হতে পারে। যেসব গুরুতর অসুখে রোগী অচেতন হয়ে থাকে, চোখ বন্ধ করার ক্ষমতা থাকে না সেইসব অসুখেও চোখে কোনো মলম লাগিয়ে তুলো চাপা দিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখা দরকার। নইলে যে কোনো সময়ে কর্নিয়ায় ঘা হয়ে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

চোখের পাতার আর-একটি সাধারণ অসুখ, পাতার চুল পড়ে যাওয়া। চোখের পিছি বা চুল চোখের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু অনেকসময়

চোখের পাতার মার্জিনে ঘা হয়ে চোখের পিছি পড়ে যায়, তখন এক বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণত মাথার খুস্কির মতো চোখের পাতার মার্জিনে খুস্কি হয়েই চুল পড়তে থাকে। অবিলম্বে চিকিৎসা না করালে মার্জিনে ঘা হয়ে সেখানকার চুলের গোড়া সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে আর চুল গজানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চোখের পিছি ভিতরে ঢুকে গিয়েও অনেক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে চোখ লাল হলে বা কনজাংটিভাইটিস হলে তা সারতেই চায় না। কর্নিয়ায় ক্রমাগত ঘষটানি লেগে কর্নিয়ায় ঘা হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই চোখের মধ্যে পিছি ঢুকলে দেরি না করে কোনো ডাক্তারকে দিয়ে তা তুলে ফেলা উচিত।

কোনো কোনো রোগে চোখের পাতা সম্পূর্ণ ঘুরে যেতে পারে। ভিতরের দিকেও ঘুরে যেতে পারে, আবার বাইরের দিকেও ঘুরে যেতে পারে। ভিতরের দিকে ঘুরে গেলে সবগুলি পিছিই চোখে ঘষটে গিয়ে কর্নিয়ায় ঘা হতে পারে। তাই চোখের পাতা ভিতরের দিকে ঘুরে গেলে অবিলম্বে অপারেশন করে চোখের পাতা ঠিক করা দরকার। চোখের পাতা বাইরের দিকে ঘুরে গেলে চোখ দিয়ে সারাক্ষণ জল পড়ে ও চোখ লাল হয়ে থাকে। এ-ও অপারেশন করে সারানো দরকার।

অঞ্জনিও চোখের পাতার অসুখ। আমরা বলি অঞ্জনি, কিন্তু কথাটা আসলে আঞ্জনি। ভাষাতত্ত্বের নিয়মে কবে যে আঞ্জনি অঞ্জনি হয়ে গেছে বলা মুশকিল। অবশ্য সংস্কৃতে বলে অঞ্জনিকা, তাই অঞ্জনিকা থেকেও অঞ্জনি হতে পারে।

চোখের পাতায় যে যন্ত্রণাদায়ক গুটি বা ব্রণ হয় তাকেই বলে অঞ্জনি। চোখে অঞ্জনি হওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। অনেকের চোখেই অঞ্জনি হয়, আবার আপনা থেকেই সেরে যায়। কখনও কখনও অঞ্জনি আপনা থেকে সারতে চায় না, তখন ডাক্তার দেখানো দরকার। অনেকসময় অপারেশন করে অঞ্জনি সারাতে হতে পারে, তাই অঞ্জনি আপনা থেকে সারতে না চাইলে অবহেলা না করে ডাক্তার দেখানো উচিত। কারও কারও চোখে বারবার অঞ্জনি হয়, বারবার অঞ্জনি হওয়া অনেকসময়েই চোখের কোনো অসুখের উপসর্গ।

অনেক কারণে চোখে অঞ্জনি হতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায়, চোখের

পাতায় যেসব গ্ল্যাণ্ড থাকে সেই গ্ল্যাণ্ডগুলি যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে চোখে অঞ্জনি হতে পারে। মাথার খুস্কি বা চোখের পাতার খুস্কি থেকেও অঞ্জনি হতে পারে। আবার, শরীর দুর্বল করে দেয় এমন অসুখ, যেমন ডায়াবিটিজ থাকলে মাঝে মাঝে চোখে অঞ্জনি হতে পারে। চোখে খুব চাপ পড়লেও অঞ্জনি হতে পারে। যাঁদের স্বাস্থ্য খুব খারাপ তাঁরা যদি হাম অথবা অন্য কোনো বড়ো অসুখে ভোগেন তাহলে তাঁদের চোখে অঞ্জনি হতে দেখা যায়। ক্ষীণস্বাস্থ্য শিশুদের চোখে খুবই অঞ্জনি হয়।

অঞ্জনির প্রাথমিক চিকিৎসা চোখের বিশ্রাম আর চোখ পরিষ্কার রাখা। অঞ্জনি হলে চোখের কাজ না করাই ভালো আর বারবার পরিষ্কার উষ্ণ জলে চোখ ধোয়া দরকার। যদি গরম কম্প্রেস দেন তাহলে অঞ্জনির মুখটা তাড়াতাড়ি ফুটে উঠবে। তখন সেখানকার একটা চুল আস্তে করে টেনে তুললেই অঞ্জনি ফেটে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এখানে একটা কথা মনে রাখবেন, কখনও ফোড়া গালার মতো অঞ্জনি গালার চেষ্টা করবেন না। শুধু অঞ্জনি নয়, মুখের কোনো ব্রণ বা ফোড়াই চাপ দিয়ে গালতে যাবেন না, কারণ এই চাপ দেবার ফলে পুঁজ উলটো দিকে সরে গিয়ে শরীরের রক্তধারায় এবং মস্তিষ্কের শিরায় মিশতে পারে এবং তার ফল সাঙ্ঘাতিক হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসায় যদি অঞ্জনি না সারে তাহলে অবহেলা না করে অবশ্যই ডাক্তার দেখাবেন।

ষোল : কয়েকটি দুরারোগ্য রোগ

রংকানা

এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিসই তার নিজস্ব রং নিয়ে আমাদের চোখে প্রতিভাত হয়। রঙের এই বৈচিত্র্য মূলত নির্ভর করে জিনিসটাকে দেখার জন্য যে আলোর দরকার হয় তার ঔজ্জ্বল্যের উপর এবং যে চোখ জিনিসটাকে দেখে তার বিশেষ আলোকতরঙ্গ শোষণ করার ও প্রতিফলন করার ক্ষমতার উপর। রঙের বিশ্লেষণে মস্তিষ্ক এবং মনস্তত্ত্বের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

দৃশ্যমান জগতে এই যে অগুনতি রঙের সমারোহ, এ কিন্তু আসলে তিনটি মৌলিক রঙের বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণের ফল। এই তিনটি রং হল লাল, সবুজ ও নীল। কোনো মানুষ রং বিশ্লেষণে অক্ষম হলে তাঁকে রংকানা বা কালার ব্লাইণ্ড বলে। রংকানা সম্পূর্ণ অথবা আংশিকও হতে পারে। সম্পূর্ণ রংকানারা কোনো রং-ই চিনতে পারেন না, চোখের সামনের সব জিনিসই তাঁদের কাছে ধূসর বা ছাই রঙের মনে হয়। এইরকম লোকের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম।

বেশির ভাগ রংকানাই আংশিক। কতকগুলি রং অথবা সেই রংগুলির মিশ্রণে যে বিচিত্র রঙিন আভা তৈরি হয় তার কোনো কোনো অংশ অনেকে বুঝতে পারেন না। রংকানা সাধারণত জন্মগত এবং বংশগত রোগ। পুরুষদের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব বেশি—শতকরা প্রায় ৮ ভাগ; স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই রোগ অনেক কম—শতকরা মাত্র ০.৪ ভাগ।

চোখের রেটিনায় রংবিশ্লেষণের বিশেষ ক্ষমতা 'কোন্'-কোষের। এই কোষের আধিক্য থাকে রেটিনার মধ্যভাগে ম্যাকিউলা এলাকায়। অতএব চোখের কোনো অসুখে যদি ম্যাকিউলা আক্রান্ত হয় তবে আংশিক রংকানা হওয়া সম্ভব। ডায়াবিটিজ রোগে সহজেই এই এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে ডায়াবেটিকদের রং চিনতে অসুবিধা হয়। অতিরিক্ত মদ্যপান ও ধূমপানের ফলেও অপ্টিক নার্ভের ক্ষতি হয়ে আংশিক রংকানা দেখা দিতে পারে। যে কারণেই রংকানা দেখা দিক না কেন, এর কোনো চিকিৎসা নেই।

মজার ব্যাপার, অধিকাংশ রংকানারাই জানেন না তাঁরা রংকানা। কেবল কোনো কারণে চোখ পরীক্ষার দরকার হলে তখনই ধরা পড়ে তাঁরা রংকানা।

রং বিশ্লেষণ করার নিঁখুত ক্ষমতা কতকগুলি পেশায় একান্ত আবশ্যিক। রেলের ড্রাইভার এবং গার্ডরা যদি বহু দূর থেকে লাল-সবুজ রঙের সিগন্যাল চিনতে না পারেন তবে তার ফল সহজেই অনুমান করা যায়। মোটর ড্রাইভারদের পক্ষেও ট্রাফিক সিগন্যাল চেনা জরুরী। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য এইসব পেশায় অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে চোখ পরীক্ষা করা হয়, রং বিশ্লেষণে যাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি না থাকে তা দেখা হয়।

বংশগত রাতকানা

আগেই বলা হয়েছে, খাদ্যে ভিটামিন-এ'র অভাব হলে শিশু রাতকানা হয় এবং সময়ে প্রতিকার না করলে জেরফথ্যালমিয়ার আক্রমণে শিশু অচিরেই চিরদিনের মতো অন্ধ হয়ে যেতে পারে। অনেকসময় জন্মগত এবং বংশগত কারণেও লোকে রাতকানা হতে পারে। কারণ জন্মগত হলেও সাধারণত দশ-এগার বছর বয়সের আগে এই রোগ ধরা পড়ে না। অনেকসময় আরও বেশি বয়সে ধরা পড়ে। এই রোগের নাম রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা।

নাম রেটিনাইটিস হলেও এই অসুখে রেটিনায় কোনো প্রদাহ বা ইনফ্ল্যামেশন হয় না। এই অসুখে রেটিনার 'রড্'-কোষ নষ্ট হয়ে যায় এবং রেটিনা কালো পিগমেন্টে ভরে যায়। অল্প আলো অথবা অন্ধকারে দেখার অসুবিধা দিয়ে অসুখ শুরু হলেও এই অসুখে ধীরে ধীরে দৃষ্টির পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং শেষে অপ্টিক নার্ভ শুকিয়ে গিয়ে অনিবার্যভাবে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু এই অসুখ বংশগত সেইহেতু আক্রান্তদের সন্তানসন্ততি না হওয়াই ভালো। এই অসুখের আজও কোনো চিকিৎসা নেই।

বিষাক্ত মদের প্রতিক্রিয়া

বিষাক্ত মদ খাওয়ার ফলে জীবনহানির খবর প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায়। অনেকসময় মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলেও অন্ধত্বের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন হয়, প্রায় অসম্ভব হয় বলা চলে।

মিথাইল অ্যালকোহলের দাম খুবই কম, সেজন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রায়ই ইথাইল অ্যালকোহল বা খাওয়ার মদের সঙ্গে মিথাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে বিক্রি করে। এই ভেজাল মদ অপ্টিক নার্ভের পক্ষে মারাত্মক বিষ। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা না নিলে অপ্টিক নার্ভ নষ্ট হয়ে চিরকালের মতো চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এরপর যাঁরা সিগার খান তাঁদের ক্ষেত্রে মিথাইল অ্যালকোহল

এত তাড়াতাড়ি অপ্টিক নার্ভ নষ্ট করে দেয় যে, চিকিৎসার কোনো সুযোগই থাকে না। সুতরাং যেখানে সেখানে অপরিচিত পরিবেশে মদ্যপান না করাই ভালো।

ওষুধের অ্যালার্জি

অনেকেরই অনেক ওষুধে অ্যালার্জি থাকে, যেমন– সালফা জাতীয় ওষুধে, ব্যথা কমাবার জন্য অকসিফেনবুটাজোন জাতীয় ওষুধে এবং আরও অনেক ওষুধে। যে ওষুধে অ্যালার্জির সম্ভাবনা থাকে সেই ওষুধ কখনও জেনেশুনে খাওয়া উচিত নয়। দৈবাৎ খেয়ে ফেললে চুলকোনি, চামড়ায় দাগ ইত্যাদি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া মাত্র ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। নইলে সারা শরীরের সঙ্গে চোখেও ফুস্কুড়ি হয়ে ঘা হতে পারে এবং তার পরিণাম সম্পূর্ণ অন্ধত্ব।

চোখ লাল হওয়া, চোখে যন্ত্রণা হওয়া, চোখে আলো অসহ্য লাগা ইত্যাদি দিয়েও এই অসুখের সূত্রপাত হয়। এই অসুখ স্টিভেন জনসন রোগ নামে পরিচিত। এই অসুখ খুবই মারাত্মক।

এছাড়াও ম্যালেরিয়া ও আমাশার ওষুধ ক্লোরোকুইন এবং যক্ষ্মার ওষুধ ইথামবুটল চোখের রেটিনার কোষ নষ্ট করে চোখের দৃষ্টি চিরদিনের মতো কমিয়ে দেয়। কোনো ওষুধ খেতে খেতে যদি চোখের দৃষ্টি দিন দিন ঝাপসা হয়ে আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে ডাক্তারকে জানানো দরকার। ডাক্তার তখন বিকল্প ওষুধের ব্যবস্থা করবেন।

সতের : কয়েকটি সাধারণ উপসর্গ

চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়া

অনেকসময় চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ে। চোখে কোনো ব্যথাবেদনা নেই, চোখ লাল নয়—শুধুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। ক্ষণে ক্ষণে চোখ মুছতে হয়, জলের জন্য চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে যায়। কিছুদিন পরে জল ক্রমশ ঘন হয়ে আসে, আরও পরে চোখ দিয়ে সাদা ঘন পুঁজ পড়তে থাকে।

নেত্রনালী নামে পরিচিত এই অসুখকে ইংরেজীতে বলে ড্যাক্রিওসিস্টাইটিস। এই অসুখ খুবই মারাত্মক হতে পারে। কারণ, পুঁজ থেকে চোখে সংক্রমণ হতে পারে, কর্নিয়ায় ঘা হয়ে পচন শুরু হতে পারে। অতএব প্রথম অবস্থাতেই এই অসুখের চিকিৎসা প্রয়োজন। গোড়ায় হয়তো ওষুধপত্র, ইনজেকশন ইত্যাদি দিয়ে এই অসুখ সারানো সম্ভব, পরে অপারেশন করতেই হয়।

অনেকসময় আবার নেত্রনালী হঠাৎ ফুলে উঠে খুবই যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। এই অবস্থাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

হঠাৎ চোখ লাল হওয়া

কনজাংটিভাইটিস বা চোখ ওঠা, কর্নিয়ার ঘা, আইরাইটিস, গ্লকোমা ইত্যাদি কারণে চোখ হঠাৎ লাল হতে পারে। হুপিং কফ অর্থাৎ ঘুংড়ি কাশি, হাই ব্লাড প্রেশার, চোখে আঘাত ইত্যাদি থেকে রক্তপাত হয়েও চোখ হঠাৎ লাল হতে পারে।

এই রোগগুলি সম্পর্কে আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যে কারণেই চোখ লাল হোক, অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। হাতুড়ে চিকিৎসা বা নিজে চিকিৎসা করলে ফল মারাত্মক হতে পারে।

চোখে কালো ফুটকি দেখা

অনেকেই চোখে কালো কালো দাগ দেখেন। তাঁদের মনে হয়, কতকগুলি ছোটো ছোটো ফুটকি চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। এতে দেখতে যেমন অসুবিধা হয় তেমনি মনে একটা বিরক্তিভাব জাগে। চোখে এই ফুটকি দেখা অস্বাভাবিক কিছু না।

আমাদের চোখের মধ্যে লেন্সের পিছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে জেল্যাটিনের মতো এক স্বচ্ছ পদার্থ, তার নাম ভিট্রিয়াস হিউমার। বয়স যত বাড়ে, ভিট্রিয়াস হিউমার তত ভেঙে যেতে চায় এবং কখনও কখনও ভেঙে জলীয় পদার্থে আর আঁশাল পদার্থে ভাগ হয়ে যায়। তখন ঐ আঁশাল পদার্থ লেন্সের পিছনে 'ভাসতে' থাকে আর তাতেই চোখে কালো কালো ফুটকি দেখা যায়।

এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। ঐ ফুটকিগুলি অনেকক্ষেত্রেই হালকা হতে হতে একসময় মিলিয়ে যায়। এতে চোখের কোনো ক্ষতি হয় না।

তবে হঠাৎ যদি চোখের ঐ কালো কালো ফুটকির সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে চিন্তার কারণ ঘটে। চোখের মধ্যে রক্তবাহী শিরা-উপশিরা ভাঙতে থাকলে এমন হতে পারে। আবার, রেটিনা যদি ছিঁড়ে যায় কিংবা স্থানচ্যুত হয় তাহলেও এমন হতে পারে। করোয়েডে ঘা হলেও এমন হতে পারে। সুতরাং চোখের সামনে কালো কালো ফুটকি ভাসতে দেখলে সবসময় তাকে সাধারণ ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। ঐ ফুটকি গুরুতর অসুখের বিপদসঙ্কেতও হতে পারে।

অতএব চোখের সামনে কালো কালো ফুটকি ভাসতে দেখলেই ডাক্তার দেখিয়ে জেনে নেবেন ফুটকিগুলি নির্দোষ, না গুরুতর বিপদের সঙ্কেত।

অকারণে হঠাৎ কম দেখা

কখনও কখনও নেহাৎ অকারণেই এক চোখে অথবা দু চোখে কম দেখা যায়। এমন হলে অবিলম্বে চক্ষুচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। গড়িমসি করলে ভবিষ্যতে হয়তো চিকিৎসার কোনো সুযোগই পাওয়া যাবে না। চোখের মধ্যে রেটিনার শিরায় থ্রম্বোসিস হয়ে অথবা সেন্ট্রাল আর্টারির রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে এই বিপত্তি হতে পারে।

যুবকদের ক্ষেত্রে ইল্‌স্‌ ডিজিজ অর্থাৎ চোখের মধ্যে হঠাৎ রক্তক্ষরণের ফলে সহসা চোখের দৃষ্টি কমে যেতে পারে। অপ্টিক নার্ভের কোনো রোগ অথবা রেটিনার কোনো রোগ, যেমন—রেটিনার ঘা, রেটিনা ফুলে যাওয়া, রেটিনা ছিঁড়ে যাওয়া (ডিট্যাচমেন্ট) ইত্যাদি প্রায়ই বিনা নোটিসে এসে পড়ে। একথা মনে রেখে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে একটুও দেরি করা উচিত নয়।

আঠার : চোখের স্ট্রেন

স্ট্রেন বললে ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি বোঝা যায়, টান বললে তা যায় না, খানিকক্ষণ ভাবতে হয়। এটা বাংলা ভাষার দুর্বলতা নয়, আমাদের ব্যবহারের দুর্বলতা। মুখের কথায় বাংলার মধ্যে আমরা এত বেশি ইংরেজী ব্যবহার করি যে, অনেকসময় ইংরেজীই বেশি বুঝি। তাই চোখের টান না বলে চোখের স্ট্রেন বললে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ধরতে পারি।

চোখের স্ট্রেন বলতে বোঝায় এমন একটা অবস্থা যাতে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, চোখের পিছনদিকে সামান্য ব্যথা করে এবং সেই ব্যথার সঙ্গে কিছুটা মাথার যন্ত্রণাও থাকে, বিশেষ করে কপালের দিকে। চোখে যদিও পরিষ্কার দেখা যায়, দেখাটা স্বস্তিকর হয় না। পড়াশোনা করতে কষ্ট হয়।

অনেক কারণে চোখে স্ট্রেন হতে পারে। সেই কারণগুলি বলার আগে বলে নিই, স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি আছে যে চোখে সেই চোখ কখনও স্ট্রেন করতে চায় না, সেই চোখ কখনও চেষ্টা করে কিছু দেখে না। সেই চোখ সহজভাবে যদি কিছু দেখতে পায় তো ভালো, না পেলে আর দেখার চেষ্টা না করে সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। আলো যদি কম থাকে কিংবা যদি অনেক দূরের জিনিস হয়, স্বাভাবিক চোখ কখনও সেদিকে তাকিয়ে থাকতে চায় না, দৃষ্টি পড়লেও দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। ফলে, চোখে স্ট্রেন হতে পারে না, চোখ ভালো থাকে।

চোখে স্ট্রেন আমরাই করি আর তার জন্য আমাদের চোখে কষ্ট হয়। আমরা যখন জোর করে কিছু দেখার চেষ্টা করি তখনই চোখে স্ট্রেন হয়। আপনার চোখে যদি স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি থাকে আর আপনি যদি রাতের আকাশে অগুনতি তারার দিকে তাকান, চোখে কোনো স্ট্রেন হবে না; কিন্তু যে-ই আপনি তারাগুলি গুনতে চেষ্টা করবেন অমনি আপনার চোখে স্ট্রেন হবে।

সাধারণত চোখে স্ট্রেন হয়

১. অপর্যাপ্ত আলোয় যদি দেখার চেষ্টা করা হয় (অপর্যাপ্ত কথাটা বাংলায় দু অর্থে ব্যবহার করা হয়—কখনও প্রয়োজনের কম অর্থে, কখনও প্রয়োজনের বেশি অর্থে। এখানে দু অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে);

২. চোখের উপরের পাতা যদি অনেকক্ষণ উপরদিকে তুলে তাকিয়ে থাকা হয় অর্থাৎ আমাদের যে ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ে তা বন্ধ করা হয়;
৩. লেখাপড়া, সেলাইফোঁড়াই, সিনেমা-টিভি দেখা ইত্যাদির সময় যেভাবে তাকানো উচিত সেইভাবে যদি তাকানো না হয়;
৪. মাথা বা শরীর যেদিকে ঘুরছে তার উলটো দিকে যদি চোখ ঘোরানো হয়, যেমন—মাথা যখন ডানদিকে ঘুরছে তখন চোখ যদি বাঁদিকে ঘোরে অথবা থুতনি যখন নিচে নামছে তখন চোখ যদি উপরদিকে তাকায়;
৫. কোনো জিনিস পরিষ্কার দেখার জন্য যদি জোর দিয়ে তাকানো হয় অথবা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকা হয়;
৬. অপরিচিত বস্তুর দিকে যদি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকা হয় কিংবা আনন্দহীন বিরক্তিকর জিনিস বেশিক্ষণ দেখা হয়, যে বই ইত্যাদি পড়তে ভালো লাগে না তা যদি বেশিক্ষণ পড়া হয়;
৭. হাটে বাজারে মেলায় বা এইরকম কোনো জায়গায় গিয়ে যদি একসঙ্গে অনেক জিনিস দেখার চেষ্টা করা হয়;
৮. ভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য যদি বেশি থাকে;
৯. যদি অস্বাভাবিক কল্পনা ও বিকৃত চিন্তা করা হয়;
১০. যৌনক্ষুধা যদি বেশি থাকে;
১১. অকারণে যদি চশমা পরা হয়;
১২. ধুলো ধোঁয়া আর বেশি গরমে যদি অনেকক্ষণ থাকা হয়;
১৩. চোখের যখন বিশ্রাম দরকার তখন যদি চোখকে খাটানো হয়; এবং
১৪. খাদ্যে যদি পুষ্টির অভাব থাকে।

এই কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি কারণ নিয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। প্রথমেই আলোর কথা।

আলো

চোখে স্ট্রেন হবার একটা বড়ো কারণ আলো। খুব কম আলোয় দেখার চেষ্টা করলে যেমন চোখে স্ট্রেন হয় তেমনি খুব চড়া আলোয় দেখতে চাইলেও চোখে স্ট্রেন হয়। আমাদের চোখ কম আলোতেও দেখতে পায়, আবার বেশি আলোতেও দেখতে পায়। কিন্তু স্ট্রেন না করে দেখার জন্য আলোর একটা

সীমা আছে—কমের দিকেও আছে, বেশির দিকেও আছে। আপনি যখন যে কাজ করবেন তখন সেই কাজের উপরই নির্ভর করবে কতখানি আলো আপনার দরকার হবে।

আমাদের প্রায় সমস্ত কাজের পক্ষেই সবচেয়ে ভালো দিনের আলো। আমাদের চোখ তৈরিই হয়েছে দিনের আলোয় দেখার জন্য, দিনের আলোতেই আমাদের চোখ 'টিউন-করা'। অন্যসব আলোয় কিছু অভাব থাকেই। সেই অভাব বিজ্ঞানসম্মতভাবে পূরণ করতে পারলে চোখের স্ট্রেন এড়ানো যায়।

আধুনিক সভ্যতায় দিনের আলোয় সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব। রাত্রের জন্য অনেক কাজই তুলে রাখতে হয়। লেখাপড়া, সেলাইফোঁড়াই, টেলিভিশন দেখা, রান্না করা ইত্যাদি অনেক কাজেরই একটা বড়ো অংশ হয় রাত্রে।

রাত্রে লেখাপড়া করার জন্য সবচেয়ে ভালো ৬০ ওয়াটের বাল্ব। বাল্বটা 'সাদা' না হয়ে ঘোলাটে হবে এবং টেবিল থেকে ৪ ফুট উঁচুতে থাকবে। বাল্বটা যদি চোখের সামনে থাকে তাহলে সরাসরি চোখে আলো পড়ে বিঘ্ন ঘটাবে, তাই বাল্ব থাকবে পিছনে এবং বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে আলো এসে টেবিলে পড়বে। লেখাপড়া করার পক্ষে এইরকম আলোই উপযুক্ত। কিন্তু এইরকম আলোতেও চোখে স্ট্রেন হতে পারে যদি বইখাতার পাতা চকচকে হয় অথবা টেবিলের চারপাশে আলো খুব কম থাকে। বইখাতার পাতা চকচকে হলে তা থেকে আলো ঠিকরে চোখে পড়ে চোখে স্ট্রেন ঘটাতে পারে। এইরকম ক্ষেত্রে টেবিলে বইখাতা এমনভাবে ধরতে হবে যাতে আলো ঠিকরে চোখে এসে পড়তে না পারে। টেবিলের চারপাশে যদি অন্ধকার থাকে তাহলে লেখাপড়ায় ঠিকমতো মন বসতে চায় না। তাই টেবিলের চারপাশেও আলো থাকবে এবং সেই আলো টেবিলের আলোর চেয়ে কিছুটা কম হবে।

সেলাইফোঁড়াইয়ের জন্য ডিরেক্ট লাইটই ভালো, ইনডিরেক্ট লাইট নয়। ডিরেক্ট লাইট মানে সোজাসুজি বাল্ব থেকে যে আলো আসে, এই আলোয় ছায়া পড়ে; আর ইনডিরেক্ট লাইট হল ছড়ানো আলো, বাল্ব থেকে কিছুতে ধাক্কা খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে আলো, এই আলোতে ছায়া পড়ে না। সেলাই করার সময় সুতোর ছায়াটা দরকার। ইনডিরেক্ট লাইটে সুতোর ছায়া পড়ে না বলে সুতোটা আলোর মধ্যে হারিয়ে যায়, তাতে সেলাই করতে অসুবিধা হয়।

টেলিভিশন দেখার সময় ঘর কখনও অন্ধকার থাকবে না। ঘরে স্বাভাবিক

আলোই জ্বলবে এবং টেলিভিশনের ব্রিলিয়্যান্স বা ব্রাইটনেস যতটা কম করলে পরিষ্কার দেখা যায় ততটা কম করে দেখতে হবে।

রান্নাঘরে কম আলোর দরকার হয় এবং বাল্বটা সিলিঙে ফোকরের মধ্যে রাখতে পারলে ভালো হয়। বাল্বের আলো অনেকটা হলদে আলো, হলদে আলোয় খাবারের রং ঠিক ঠিক বোঝা যায়। ফ্লুওরেসেন্ট আলো সুবিধাজনক হলেও এই আলোয় খাবারের রং বদলে যায় এবং অনেকসময় ফ্লিকার ইফেক্ট হয় অর্থাৎ মনে হয় যেন আলোটা কেঁপে উঠল, বিশেষ করে হাতা খুন্তি চামচে বা ছুরি নাড়লে। এই ফ্লিকার ইফেক্টে কখনও কখনও দৃষ্টিবিভ্রমও ঘটে।

অনেকের প্রশ্ন, চোখের পক্ষে বাল্বের আলো ভালো, না ফ্লুওরেসেন্ট লাইট অর্থাৎ টিউব লাইট ভালো? প্রশ্নটা বেশি করে জেগেছে আজকের এই দুঃসহ বিদ্যুৎঘাটতির দিনে বিদ্যুতের খরচ কমানোর জন্য যখন বেশি করে টিউব লাইট ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু এককথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল।

বাল্বের চেয়ে টিউবে বিদ্যুৎ খরচ কম এবং টিউবের আলো সারা ঘরে অনেকটা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে একথা সত্যি, কিন্তু টিউবের আলোর কিছু অসুবিধাও আছে। আগেই বলা হয়েছে, রান্নাঘরের পক্ষে টিউব লাইট খুব একটা উপযুক্ত নয়, কারণ হাতা খুন্তি চামচে বা ছুরি নাড়লে ফ্লিকার দেয়। অন্য অনেক কাজের পক্ষেও টিউব লাইট কিছুটা অসুবিধাজনক। টিউব লাইট সারা ঘরে মোটামুটি সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে বলে কনট্র্যাস্ট কমে যায়, লেখাপড়া সেলাইফোঁড়াই ও অনেক সুক্ষ্ম কাজে এই কনট্র্যাস্টটা দরকার।

রান্নাঘরে ছাড়াও অন্য ঘরে টিউব লাইট ফ্লিকার-মুক্ত রাখা অনেকসময়েই কঠিন হয়ে পড়ে। টিউব যত পুরনো হয়, ফ্লিকার তত বাড়ে। কখনও কখনও নতুন টিউবেও ফ্লিকার দেয়। টিউবে ডিফিউজার লাগালে ফ্লিকারের হাত থেকে অনেকটা মুক্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে আলো কিছুটা কমে। তাছাড়া ডিফিউজার যদি কাঁচের না হয়ে প্লাস্টিকের হয় তাহলে কিছুদিন পরে তা হলদে হতে থাকে, তাতে আলো আরও কমতে শুরু করে।

তবু বলা যায়, যত্ন নিলে টিউব লাইট অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি শুধু ঘর আলো করার জন্যই টিউব ব্যবহার করেন আর লেখাপড়া ও অন্যান্য সূক্ষ্ম কাজের জন্য বাল্ব ব্যবহার করেন।

আজকাল সব অফিসেই টিউব লাইটের ছড়াছড়ি। কিন্তু আপনি যদি

টেবিলে বাল্ব-লাগানো একটা ছোট্ট টেবিল-ল্যাম্প রেখে দেন তাহলে স্ট্রেনের কবল থেকে চোখ বাঁচাতে পারবেন।

বাল্বই ব্যবহার করুন আর টিউব, সবসময় লক্ষ্য রাখবেন যেন ধুলোময়লা জমতে না পারে। পরিষ্কার আলোর জন্য পরিষ্কার বাল্ব টিউব দরকার। বাল্বের বা টিউবের গায়ে ধুলোময়লা জমলে কেবল আলোই কম হয় না, আলোর বিক্ষেপণও ঘটে। চোখের পক্ষে সেটা ভালো নয়।

চোখের পাতা

চোখে স্ট্রেন হবার দ্বিতীয় কারণ বলা হয়েছে চোখের উপরের পাতা অনেকক্ষণ উপরদিকে তুলে রাখা, অর্থাৎ অনেকক্ষণ চোখের পলক না ফেলা।

চোখে যাতে স্ট্রেন না হয় সেজন্য চোখের উপরের পাতা সবসময় নিচের দিকে নামানো থাকবে। চোখ থাকবে আধ-বোজা অবস্থায়। চোখের পাতা কখনও কুঁচকে থাকবে না। যখন সামনে তাকাবেন বা উপরদিকে তাকাবেন, চোখের উপরের পাতা তুলবেন না, কেবল থুতনি উপরে তুলবেন। অর্থাৎ, পড়াশোনা করার সময় চোখের পাতা যে অবস্থায় থাকবে, অন্য সময়েও সেই অবস্থায় থাকবে। সিনেমা দেখার সময় লোকে সাধারণত এমনভাবে বসে যে, চোখের পাতা উপরদিকে তুলতে হয়। সেই কারণে বেশির ভাগ লোক সিনেমা দেখার পর চোখে অস্বস্তি বোধ করে। চোখের উপরের পাতা নিচে নামানো থাকলে চোখের বিশ্রাম হয়, উপরে তুলে রাখলে স্ট্রেন হয়। চোখ কখনও কোঁচকাবেন না। চোখ কোঁচকানো চোখের পক্ষে কষ্টদায়ক। তাছাড়া বেশিক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকালে মাথাও ধরে।

চোখের পাতা ঘন ঘন পড়া দরকার। স্বাভাবিক চোখে ঘন ঘন পাতা পড়ে। এত তাড়াতাড়ি ও এত আস্তে চোখের পাতা পড়ে যে, আমরা তা টেরই পাই না। আমাদের দেখতেও অসুবিধা হয় না। চোখের পাতা পড়ায় প্রধান ভূমিকা উপরের পাতার। উপরের পাতা সামান্য নিচে নেমে এসে পিউপিলটা ঢেকে দেয়, তারপর আবার উপরে উঠে যায়। নিচের পাতাটা পেশীতে সামান্য সঙ্কোচন ঘটিয়ে উপরে ওঠে। অস্বাভাবিক চোখে এইরকম নিয়মিত পাতা পড়ে না। পাতার পেশীতে টান ধরে স্ট্রেন ঘটায়। স্বাভাবিক চোখে প্রতি সেকেণ্ডে তিন থেকে চারবার পাতা পড়ে। ঠিকমতো পাতা পড়লে চোখের বিশ্রাম হয়। অভ্যাস করে চোখের পাতা ঠিকমতো ফেলা যায়।

লেখাপড়া

আপনি শুয়ে বসে কীভাবে কোন্ ভঙ্গিতে লেখাপড়া করবেন তার উপর অনেকটা নির্ভর করবে আপনার চোখে স্ট্রেন হবে কি হবে না। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, চেয়ারে বসে টেবিলে লেখাপড়া করা। চেয়ারে বসবেন সোজা হয়ে, মাথা খাড়া রেখে।

আলোর কথা আগেই বলেছি। কখনও সামনের দিক থেকে আলো আসবে না। সূর্যের আলোই হোক কি কৃত্রিম আলো, সে আলো আসবে বাঁদিক থেকে। যদি পিছন থেকে বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে আসে তো সবচেয়ে ভালো হয়। আলো এমনভাবে টেবিলে এসে পড়বে যাতে ছায়া হবে না, গ্লেয়ারও হবে না।

ঘরের বাইরে যদি লেখাপড়া করতে হয়, কখনও চড়া রোদ্দুরে করবেন না। কারণ, ঐ গ্লেয়ার—বইখাতার পাতা থেকে আলো ঠিকরে চোখে এসে চোখের পক্ষে কষ্টের কারণ হতে পারে। যদি রোদ্দুরে পড়তেই হয় তাহলে এমনভাবে বই ধরবেন যেন বই থেকে আলো ঠিকরে চোখে এসে না লাগে। আর, যদি রোদ্দুরে লেখার কাজ করতেই হয় তাহলে সুবিধামতো একটা আড়াল দিয়ে নেবেন।

পড়ার সময় বই থুতনির চেয়ে নিচে রাখবেন যাতে উপরের পাতা উপরদিকে তুলতে না হয় আর বইটা এমন দূরত্বে রাখবেন যাতে অক্ষরগুলি স্পষ্ট পড়া যায়। সাধারণত ১৬ থেকে ১৮ ইঞ্চি দূরত্বই অনেকের পক্ষে ঠিক হয়। একটা লাইন পড়ার সময় অন্তত দুবার চোখের পাতা পড়া চাই।

আপনি শুয়ে শুয়েও পড়তে পারেন, যদি মাথাটা উঁচু করে রাখেন আর ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলেন। কাত হয়ে শুয়ে পড়লে চোখে স্ট্রেন হয়। হাতের তালুতে থুতনি রেখে পড়লে কিংবা গালে হাত দিয়ে পড়লেও চোখে স্ট্রেন হয়। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বইয়ের দিকে তাকিয়ে না পড়ে মাঝে মাঝে চোখ তুলে ঘরের এখানে-ওখানে একবার করে তাকিয়ে নেওয়া ভালো। একটা প্যারাগ্রাফ বা একটা পৃষ্ঠা পড়ার পর দু-এক সেকেণ্ড থামলে চোখের বিশ্রাম হয়। ছোটো হরফের বই পড়লে চোখ খারাপ হয় বলে একটা ধারণা আছে, কিন্তু স্ট্রেন না করে ছোটো হরফের বই পড়লে চোখ খারাপ হয় না।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, একনাগাড়ে অনেকক্ষণ পড়ার দরকার হলে মাঝে মাঝে একটু দূরে তাকিয়ে নিতে পারলে চোখে স্ট্রেন হয় না। সেই কারণে

সবসময় জানলার ধারে পড়ার টেবিল রাখতে পারলে ভালো হয়। জানলা দিয়ে যদি দূরে গাছগাছালি দেখা যায় তাহলে খুবই ভালো হয়।

অনেকে ঘরের কোণায় কিংবা দেওয়ালের দিকে মুখ করে লেখাপড়া করেন। তাঁদের ধারণা, এতে মনোযোগ বাড়ে। ধারণাটা মোটেই ঠিক নয়। এতে চোখে আরও বেশি স্ট্রেন হয়।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, ৪০ মিনিট পড়ার পর ১০ মিনিট জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চোখ দুটিকে বিশ্রাম দিলে চোখ ভালো থাকে। তাঁরা এই ব্যাপারটার নাম দিয়েছেন 40:10 ratio, অর্থাৎ ৪০:১০ অনুপাত।

আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা, সারা দিনের পরিশ্রমের পর রাত্রে পড়াশোনায় তেমন মন বসে না, চোখে স্ট্রেন হয়। রাত্রের পড়াশোনার ব্যাপারটা যদি ভোরবেলায় টাটকা মনে, টাটকা চোখে করা যায় তাহলে অনেক বেশি কাজ হয়। কিন্তু সে তো আর সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। যাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় তাঁরা যদি ভোরবেলায় ওঠার অভ্যাস করেন তাহলে অনেকদিক থেকেই ভালো হয়।

পড়ার ব্যাপারে শেষে একটা কথা বলি, খুব ঝাঁকুনি দেয় এমন যানবাহনে বসে বইপত্র না পড়াই ভালো। যদি পড়তেই হয় তাহলে মাঝে মাঝে খানিকক্ষণ করে বাইরে তাকিয়ে নেবেন।

লেখার সময় চোখের দৃষ্টি সবসময় কলমের ডগায় থাকবে এবং যেমন যেমন কলম সরবে, চোখের দৃষ্টিও তেমন তেমন সরাবেন। অনেকে লিখতে লিখতে ফিরে পড়েন অর্থাৎ কলম এগিয়ে চলে আর তাঁরা লাইনের আগের লেখাগুলি পড়তে থাকেন। এই অভ্যাস ভালো নয়।

সেলাইফোঁড়াই

অনেক মহিলা সেলাই করার সময় বা ছুঁচের কাজ করার সময় চোখে কষ্ট বোধ করেন। খানিক পরে তাঁদের মাথাও ধরে। তাঁরা তাঁদের ছুঁচের দিকে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন আর ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলেন না বলেই এমন হয়। তাঁদের ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা উচিত এবং ছুঁচের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিও ওঠানামা করা উচিত। ছুঁচ যদি উপরে ওঠে, দৃষ্টিও উপরে উঠবে; ছুঁচ নিচে নামলে দৃষ্টিও নিচে নামবে। এইভাবে চোখের দৃষ্টি সরালে চোখে স্ট্রেন কম হবে।

সিনেমা

সিনেমা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর বলে একটা ধারণা আছে। ধারণাটা একেবারে অমূলক নয়। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বেঠিকভাবে তাকিয়ে সিনেমা দেখলে চোখে স্ট্রেন হতে পারে। সাধারণত লোকে কাত হয়ে বসে চোখের পাতা উপরদিকে তুলে সিনেমা দেখে, চোখের পলক খুব বেশি পড়ে না। তাতেই চোখে স্ট্রেন হয়।

সামনের দিকে বসলেও চোখে স্ট্রেন হয়, কারণ সিনেমা হলের সামনের দিকটা বেশ ঢালু থাকে, পর্দাটা থাকে উঁচুতে। সামনের সীটে বসে সিনেমা দেখতে হলে মাথা কিছুটা পিছনদিকে হেলিয়ে চোখের উপরের পাতা উপরদিকে তুলে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। তাতে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সামনের দিকে আলোর তীব্রতাও বেশি থাকে, তাতেও চোখ ক্লান্ত হয়। হলের যত পিছনে বসা যাবে, চোখে তত কম স্ট্রেন হবে।

সিনেমা হলে বসতে হবে সোজা হয়ে এবং খুব শিথিল ভঙ্গিতে, আরাম করে। চোখের উপরের পাতা থাকবে নিচে নামানো। চিবুকটা একটু তুলে বসবেন আর ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলবেন। কখনও একদৃষ্টে পর্দার দিকে চেয়ে থাকবেন না। ঘন ঘন চোখের পাতা না ফেলে যদি একদৃষ্টে পর্দার দিকে তাকিয়ে সিনেমা দেখেন তাহলে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

সিনেমার টিকিট কেনার সময় চেষ্টা করবেন যাতে মাঝের সারিতে সীট পান। পাশের সারিতে বসলে ছবির পার্সপেকটিভ বিকৃত হয়ে যায়, তাতে চোখে স্ট্রেন হয়।

নিয়ম মেনে যদি সিনেমা দেখেন তাহলে চোখের স্ট্রেন এড়াতে পারেন।

টেলিভিশন

সিনেমার স্থান এখন অনেকটাই টেলিভিশন নিয়ে নিয়েছে। অনেক বাড়িতেই এখন টেলিভিশন। আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেরই এখন অনেকটা সময় কাটে টেলিভিশনের সামনে। বেশি টেলিভিশন দেখলে চোখ খারাপ হয় কিনা সে প্রশ্ন শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্য দেশেও উঠেছে এবং তার উত্তরও দেওয়া হয়েছে।

নিয়ম মেনে যদি টেলিভিশন দেখা যায় তাহলে চোখ খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

টেলিভিশন দেখায় যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরী সে হল—পরিষ্কার ছবি।

ছবি যদি অস্পষ্ট হয় কিংবা কাঁপে তাহলে মাথা ধরবে, চোখে ক্লান্তি আসবে। আপনার ঘর কত বড়ো তার উপরই নির্ভর করবে আপনার টেলিভিশন-সেটের পর্দা কত বড়ো হওয়া উচিত। ছোটো ঘরে যদি বড়ো পর্দার টেলিভিশন-সেট বসান তাহলে ছবির যত দোষত্রুটি সব বড়ো হয়ে দেখা দেবে ও আপনার চোখে তার প্রভাব পড়বে—এবং চোখ আরও বেশি ক্লান্ত হবে।

আপনার ঘর যদি বড়ো হয় এবং আপনি যদি বেশ দূর থেকে টেলিভিশন দেখেন তাহলে বড়ো পর্দাতেও ছবির খুঁতত্রুটি আপনার চোখে বড়ো হয়ে দেখা দেবে না, ফলে চোখের উপর চাপ পড়বে না।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, আপনি যদি টেলিভিশন-সেট থেকে দশ ফুট বা তারও বেশি দূরে বসেন তাহলে ভালো হয়। পাঁচ ফুটের কম দূরত্বে বসে কখনও টেলিভিশন দেখবেন না। যাতে আরামে টেলিভিশন দেখা যায় এবং চোখে স্ট্রেন না হয় সেজন্য বলা হয়, টেলিভিশন-সেটের পর্দার যা মাপ তার চেয়ে মোটামুটি দশগুণ বেশি দূরত্বে বসে টেলিভিশন দেখবেন। টেলিভিশন দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে যদি বসার জায়গা বদল করেন তাহলে চোখের কিছু বিশ্রাম হয়, ঘাড়ের পেশীও কিছু রেহাই পায়।

টেলিভিশন-সেট কখনও উঁচুতে রাখবেন না। অনেক বাড়িতে টেলিভিশন-সেট ছোটো আলমারির মাথায় অথবা বড়ো টেবিলের উপরে রাখা হয়, এতে চোখে স্ট্রেন হয়। চোখে যাতে স্ট্রেন না হয় সেজন্য টেলিভিশন-সেট সবসময়েই দৃষ্টিরেখায় বা তার কিছু নিচে রাখা উচিত। লক্ষ্য রাখা উচিত টেলিভিশন দেখতে চোখের উপরের পাতা যেন উপরে তুলে রাখতে না হয়, কারণ তাতেই চোখে স্ট্রেন হয় বেশি।

অনেকে ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার করে টেলিভিশন দেখেন, চোখের পক্ষে এটা ভালো নয়। সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে টেলিভিশনের তীব্র আলো একটা বিরাট কনট্র্যাস্ট। এই কনট্র্যাস্ট মেনে নেওয়া চোখের পক্ষে কষ্টকর। মানুষ তো সর্বক্ষণ টেলিভিশনের পর্দার দিকে চেয়ে থাকে না, মাঝে মাঝে পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে ঘরের এদিকে-ওদিকেও তাকায়। তাতে চোখে স্ট্রেন হয়। যতক্ষণ টেলিভিশনের উজ্জ্বল আলোর দিকে চোখ চেয়ে থাকে ততক্ষণ চোখের পিউপিল একরকম থাকে, যে-ই চোখ ঘোর অন্ধকারের দিকে যায় অমনি পিউপিল অন্যরকম হতে চেষ্টা করে অর্থাৎ বড়ো হতে চেষ্টা করে, তখন আলো-আঁধারির কনট্র্যাস্টটা বেশি হওয়ায় চোখের আইরিসের উপর বেশি চাপ পড়ে, ফলে চোখ ক্লান্ত হয়। সুতরাং টেলিভিশন যখন দেখবেন, ঘরে আলো জ্বলবে।

তবে লক্ষ্য রাখবেন, সেই আলো যেন টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে আপনার চোখে এসে না লাগে। আবার, আলো সরাসরি আপনার চোখে এসে না পড়ে সেদিকেও খেয়াল রাখবেন। সবদিক বুঝেশুনে ঠিক জায়গায় টেলিভিশন-সেটটা বসাবেন।

টেলিভিশন-পর্দার উজ্জ্বলতা সবসময় কমের দিকে রাখবেন, তাতে পর্দাটা পরিষ্কার দেখতে পাবেন। উজ্জ্বলতা যদি বাড়ান তাহলে চোখে গ্লেয়ার পড়বে, ফলে চোখে স্ট্রেন হবে।

টেলিভিশন-সেটের পর্দায় ফিলটার লাগানোয় আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু চোখে আলোর তীব্রতা কমাতে কালো চশমা পরে কখনও টেলিভিশন দেখবেন না, কারণ আপনি যখন ঘরের কম উজ্জ্বল দিকে তাকাবেন তখন আপনার চোখে স্ট্রেন হবে।

সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে: আপনি যখন টেলিভিশন দেখবেন, ঘরে তখন শেড-দেওয়া ৪০ ওয়াটের একটা বাল্ব জ্বলবে, বাল্বটা কিন্তু থাকবে আপনার ঘাড়ের পিছনে। আপনার টেলিভিশন-সেটের পর্দার মাপ যদি ১০ ইঞ্চি হয় তাহলে আপনি বসবেন ৮ ফুট দূরে, ১৬ ইঞ্চি হলে ১৪ ফুট দূরে, ২৪ ইঞ্চি হলে অন্তত ২০ ফুট দূরে। আপনার প্রতিবেশীর বাড়িতে বড়ো টেলিভিশন আছে বলে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য আপনার ঘরের মাপ বিচার না করে বড়ো টেলিভিশন এনে বসাবেন না, তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।

একনাগাড়ে কতক্ষণ টেলিভিশন দেখা যেতে পারে সে বিষয়ে কোনো নিয়ম বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এক-একজনের ক্ষেত্রে এক-এক নিয়ম। অনেকে যেমন ক্লান্ত না হয়েই অনেকক্ষণ হাঁটতে পারেন তেমনি অনেকে অনবসন্ন চোখে অনেকক্ষণ টেলিভিশন দেখতে পারেন। তবে টেলিভিশন দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে খানিকক্ষণ করে অন্যদিকে তাকানো ভালো, তাতে চোখের বিশ্রাম হয়। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনের সার্থকতা এখানে আবিষ্কার করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপন আর ক'জন দেখেন! বিজ্ঞাপনের সময়টা চোখ বিশ্রাম পায়। টেলিভিশন দেখতে বসার আগে চোখমুখ যদি ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নেন তাহলে ভালো হয়।

টেলিভিশন-সেট যাতে সবসময়েই ভালো কণ্ডিশনে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। টেলিভিশন-সেট ভালো কণ্ডিশনে থাকলে ফোকাস ঠিক থাকবে, তাতে চোখের উপর বাড়তি চাপ পড়বে না।

চোখ ভালো আছে কিনা পরীক্ষা করার একটা সহজ উপায় টেলিভিশন। টেলিভিশন দেখতে চোখের ঠিক ঠিক ব্যবহার দরকার হয়, তাই টেলিভিশন দেখতে গিয়ে চোখ যদি সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে, চোখে কোনো দোষ আছে, চোখ ঠিকমতো কাজ করছে না। এই ওয়ার্নিং পেয়ে আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন।

শেষে আবার মনে করিয়ে দিই, কান দিয়ে শোনার সময় যেমন আমাদের কোনো চেষ্টা করতে হয় না তেমনি চোখ দিয়ে দেখার সময়েও কোনোরকম চেষ্টা করবেন না অর্থাৎ চোখে জোর দেবেন না। যদি কোনো জিনিস স্পষ্ট দেখতে না পান তো স্পষ্ট দেখার জন্য চোখে জোর খাটাবেন না। তখন অন্য জিনিসের দিকে তাকাবেন আর ঘন ঘন চোখের পলক ফেলবেন। যে জিনিস অতি দ্রুত সরে যাচ্ছে সে জিনিস দেখার চেষ্টা করলে চোখে স্ট্রেন হয়। আপনি যখন চলন্ত গাড়িতে থাকবেন তখন বাইরের জিনিস পিছনে সরে যাচ্ছে কল্পনা করবেন।

আর-একটা কথা, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, অনেকে কোনোকিছু মনোযোগ দিয়ে শোনার সময় চোখ বন্ধ করেন। চোখ বন্ধ করলে কেবল মনোযোগই বাড়ে না, চোখের বিশ্রামও হয়। চোখ বন্ধ করে গন্ধ শুঁকলে গন্ধটা অনেক বেশি উপভোগ করা যায়। যাঁরা চোখ বন্ধ করে গান শোনেন কি বক্তৃতা শোনেন তাঁদের দেহমন অনেক হালকা লাগে। গায়ক বা বক্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে চোখে স্ট্রেন হয়।

উনিশ : আই-ব্যাঙ্ক

আগেই বলা হয়েছে, চোখের কর্নিয়ার কোনো অসুখ হলে স্বচ্ছ কর্নিয়া আর স্বচ্ছ থাকে না, অস্বচ্ছ হয়ে যায় এবং তখন অস্বচ্ছ কর্নিয়ার ভিতর দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করতে না পারার জন্য চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ লোপ পায়।

চোখে আঘাত লাগলে, চোখে ঘা হলে, শিশুকালে অপুষ্টির জন্য চোখে জেরফথ্যালমিয়া রোগ হলে অথবা জন্মগত বা বংশগত কোনো কারণে চোখের কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে যেতে পারে। তখন চোখের দিকে তাকালে স্বচ্ছ কালো চকচকে কর্নিয়ার পরিবর্তে সাদা ঘষা-কাঁচের মতো একটা জিনিস দেখা যায়। কোনো চিকিৎসাতেই চোখের কর্নিয়ার স্বচ্ছতা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। অনুমান করা হয়, আমাদের দেশে অন্ধদের প্রায় এক-চতুর্থাংশই চোখের কর্নিয়ার অস্বচ্ছতার শিকার।

অস্বচ্ছ কর্নিয়া কাঁচ জাতীয় কোনো স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে পরিবর্তন করার কথা প্রথম যাঁর মাথায় এসেছিল তিনি ফরাসী দেশের এক হাতুড়ে চিকিৎসক, নাম পেলিয়ের ডি কোয়েংসি। সে ১৭৭১ সালে। ১৮১৮ সালে জার্মানিতে খরগোশের চোখের কর্নিয়া বদলানো সম্ভব হয়। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মানুষের অস্বচ্ছ কর্নিয়া খরগোশ, শুওর, বানর প্রভৃতি প্রাণীর স্বচ্ছ কর্নিয়া দিয়ে বদলানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা বিফল হন। এরপরই বিজ্ঞানীদের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে, মানুষের চোখে মনুষ্যেতর কোনো প্রাণীর কর্নিয়া সংস্থাপন করা সম্ভব নয়।

অনেকদিন চুপচাপ থাকার পর কর্নিয়া বদলানোর চেষ্টা আবার পুরোদমে শুরু হয় মোরাভিয়ার চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ জারমের এক আশ্চর্য সফল অস্ত্রোপচারের পর। ডাঃ জারম ১৯০৫ সালে পঁয়তিরিশ বছর বয়সের এক যুবকের চোখে একজন অন্ধ মানুষের চোখের কর্নিয়া সংস্থাপন করেন! অন্ধ মানুষটির চোখের কর্নিয়া ভালো ছিল। সেই কর্নিয়া সংস্থাপনের পর যুবকটি প্রায় পূর্ণ দৃষ্টি ফিরে পায়। আর, তখনই প্রমাণ হয়ে যায়, মানুষের চোখে শুধু মানুষেরই চোখের কর্নিয়া সংস্থাপন করা সম্ভব। যেহেতু জীবিত কোনো মানুষের চোখের কর্নিয়া পাওয়া সম্ভব নয় সেইহেতু সঙ্গতভাবেই তখন নজর গেল মৃত মানুষের

চোখের দিকে। মৃত্যুর চার থেকে ছ ঘণ্টা পর্যন্ত চোখ অবিকৃত থাকে। অতএব এই সময়ের মধ্যে যদি চোখ তুলে নেওয়া যায় তবে সেই চোখের কর্নিয়া অন্য মানুষের চোখে সংস্থাপন করা সম্ভব।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিভিন্ন দেশে কর্নিয়া বদল করে অনেক অন্ধ লোকের দৃষ্টি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। স্বভাবতই চক্ষুচিকিৎসকরা তখন এই পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার জন্য মৃত মানুষের চোখ সহজলভ্য করার দিকে দৃষ্টি দেন। এই প্রচেষ্টারই ফল আই-ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা। ১৯৪৫ সালে ডাঃ আর প্যাটন নিউ ইয়র্ক শহরে বিশ্বের প্রথম আই-ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এরপর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আই-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে আমাদের দেশের প্রথম আই-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

আই-ব্যাঙ্ক পরিকল্পনার বড়ো কথা, মৃত মানুষের চোখ তোলা ও সেই চোখ যাতে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা যায় তার জন্য আইন প্রণয়ন করা। বিভিন্ন দেশে সেইজন্য কর্নিয়া গ্রাফটিং অ্যাক্ট আছে। আমাদের দেশেও আছে। আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গে কর্নিয়া গ্রাফটিং অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয় ১৯৬৫ সালে আর কলকাতায় প্রথম আই-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ১৯৬৬ সালে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এই আইন অনুসারে যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তাঁর চোখ দুটি লিখিত বা মৌখিকভাবে দান করে যেতে পারেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর নিকট আত্মীয়স্বজন তাঁর চোখ দুটি আই-ব্যাঙ্কের লোকদের তুলতে দেবার এবং চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য তা ব্যবহার করতে দেবার অনুমতি দিতে পারেন। আমাদের দেশে যদিও কাগজে-পত্রে আই-ব্যাঙ্কের সংখ্যা বর্তমানে একশর উপর, সত্যিকারের কার্যকর আই-ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুবই নগণ্য। পূর্বভারতের চিত্র রীতিমত হতাশাব্যঞ্জক। ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কার, যথাযোগ্য প্রচারের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে আই-ব্যাঙ্ক এখানে আজও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। সেই তুলনায় পশ্চিমভারতের চিত্র অনেক ভালো। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতে আই-ব্যাঙ্ক আন্দোলন অনেকাংশেই সফল। আই-ব্যাঙ্কের দৌলতে কর্নিয়ার অস্বচ্ছতার কারণে অন্ধ বহু মানুষ আবার পূর্ণ দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন। তাঁরা এখন সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছেন।

আমাদের দেশে এখন আনুমানিক পঁচিশ লক্ষ লোক কর্নিয়ার অস্বচ্ছতার কারণে অন্ধ হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত দু লক্ষ লোক এখনই আবার পূর্ণদৃষ্টি ফিরে পেতে পারেন যদি তাঁদের চোখের কর্নিয়া বদলে দেওয়া যায়। ব্যাপারটা প্রায় ঘড়ির কাঁচ বদল করার মতো। ঘড়ির কলকব্জা সবই ঠিক

আছে, শুধু কাঁচ ঘষে গিয়ে অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। কাঁচটা বদলে নিলেই ঘড়িটা আবার অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। শুধু ঘষা-কাঁচের জন্য কেউ ঘড়ি ফেলে দেন না। সেইরকম আমরা যখন অনেক সহজে মৃত ব্যক্তির ভালো চোখ কাজে লাগিয়ে বহু মানুষকে অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারি তখন আই-ব্যাঙ্ককে সার্থকনামা করতে একটু সচেষ্ট হতে পারি না?

যে কোনো আই-ব্যাঙ্ক সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে চাই কিছু নিবেদিতপ্রাণ দরদী স্বেচ্ছাসেবী, যাঁরা নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন মরণোত্তর চক্ষুসংগ্রহের জন্য। মৃত্যুর আগে মানুষ যাতে স্বেচ্ছায় তাঁর চোখ দুটি দান করে যান তার চেষ্টা তাঁরা করবেন। কোনো আইন বা সরকারী ব্যবস্থায় এটা সম্ভব নয়। ক্রমাগত প্রচার চালিয়েই একমাত্র সম্ভব এই ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা। স্বেচ্ছাসেবকদেরই দায়িত্ব নিতে হবে, চোখ দুটি দান করে গেছেন এমন কারও মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গেই যেন আই-ব্যাঙ্কে খবর পৌঁছয়। আই-ব্যাঙ্কের চিকিৎসক-স্বেচ্ছাসেবকরা অবিলম্বে চোখ তুলে আনার ব্যবস্থা করবেন। চার থেকে ছ ঘণ্টার মধ্যে তা করতে হবে—এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে হবে। আই-ব্যাঙ্কের কাছে হাসপাতালে প্রতীক্ষমাণ রোগীদের তালিকা থাকবে। আই-ব্যাঙ্কের ল্যাবরেটরিতে প্রাথমিক পরীক্ষায় যদি দেখা যায় মৃত ব্যক্তির চোখের কর্নিয়া খুবই স্বচ্ছ এবং তাতে কোনো রোগ নেই আর তাঁর মৃত্যুর কারণ কোনো সংক্রামক রোগ নয় তাহলে তাঁর চোখ দুটি বরফের আধারে করে অবিলম্বে পাঠানো হবে হাসপাতালে। হাসপাতালে সার্জন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করবেন। চোখের কর্নিয়ার অস্বচ্ছ অংশ কেটে ফেলে দিয়ে সেখানে মৃত ব্যক্তির স্বচ্ছ কর্নিয়ার অংশ বসিয়ে সেলাই করে দেবেন। পরিবেশ অনুকূল হলে এবং কোনো গোলযোগ না ঘটলে শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই এই অস্ত্রোপচার সফল হবার সম্ভাবনা প্রবল। তবে দাতা এবং গ্রহীতা কর্নিয়ার অবস্থার উপরেই এটা নির্ভর করে। অ্যামেরিকার আই-ব্যাঙ্কগুলি বছরে যত চোখ সংগ্রহ করে তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কর্নিয়াই ব্যবহার করা হয় না ভালো কর্নিয়া নয় বলে। অনেক সময় সফল অস্ত্রোপচারের পরও বদলানো-কর্নিয়া আবার অস্বচ্ছ হয়ে যায় এবং তা যায় একজনের অঙ্গ আর-একজনের দেহ গ্রহণ করতে চায় না বলে। রক্তের মতো অদূর ভবিষ্যতে কর্নিয়ারও হয়তো গ্রুপ নির্দেশ করে এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

এখানে একটা কথা বোধ হয় বলা প্রয়োজন, অনেকের ধারণা, যে কোনো অন্ধ লোকের দৃষ্টিই বুঝি মৃত ব্যক্তির চোখের সাহায্যে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। ধারণাটা ঠিক নয়। পুরো চোখ কখনই গ্রাফ্‌ট্‌ করা যায় না। চোখের

সামনের স্বচ্ছ অংশ অর্থাৎ কর্নিয়াই শুধু বদলানো যায়। কর্নিয়া বদলানোর আগে স্থির নিশ্চিত হতে হয় যে, অন্ধ লোকটির চোখে অন্য কোনো রোগ নেই, শুধু তাঁর চোখের কর্নিয়াই অস্বচ্ছ। কেবল তখনই আই-ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় মৃত ব্যক্তির সুস্থ কর্নিয়া তাঁর চোখে বসিয়ে দৃষ্টি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

কিন্তু সে তো কেবল কাগজে-পত্রে, বাস্তবে সম্ভব হয় কোথায়? একটা বেসরকারী হিসাবে দেখা যায়, আমাদের দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ অন্ধ মানুষ কর্নিয়া ট্র্যান্সপ্লান্টেশনের আশায় দিন গুনছেন সেখানে বছরে কর্নিয়া ট্র্যান্সপ্লান্টেশন হয় মাত্র তিন হাজার। ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসের এক সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, সারা দেশে এখন আই-ব্যাঙ্ক আছে ১০৭টি, তার মধ্যে ৯৬টি সরকারী ক্ষেত্রে আর বাকি ১১টি বেসরকারী ক্ষেত্রে। এই আই-ব্যাঙ্কগুলিতে ১৯৮৮ সালে চোখ সংগৃহীত হয়েছে মাত্র ৪৮৪৯টি।

চক্ষুদানের প্রতিশ্রুতি যে আসে না তা নয়, বহু প্রতিশ্রুতিই আসে। কিন্তু যাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন তাঁদের বেশির ভাগই অল্পবয়সী। বেশি বয়সের যাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন তাঁদের অনেকের মৃত্যুর পর চোখ সংগ্রহ করা যায় না। তার প্রধান কারণ, আই-ব্যাঙ্কে ঠিক সময়ে তাঁদের মৃত্যুর খবর পৌঁছয় না। এ ব্যাপারে আই-ব্যাঙ্কের স্বেচ্ছাসেবীদের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোকদেরও দায়িত্ব আছে। স্বীকার করি, নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর পর বাড়ির লোকদের মনের এমন অবস্থা থাকে না যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আই-ব্যাঙ্কে খবর দিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি মনে রাখেন, তাঁদের এই খবর দেবার উপর দুজন কাতর মানুষের চোখের দৃষ্টি নির্ভর করছে তাহলে বোধ হয় ব্যাপারটা কিছু সহজ হয়।

বয়স্ক মানুষেরা যাতে আরও বেশি করে চক্ষুদানের প্রতিশ্রুতি দেন সে বিষয়ে চেষ্টা করা দরকার। বয়স্ক অবয়স্ক সকলেই যাতে স্বেচ্ছায় চক্ষুদানের প্রতিশ্রুতি দিতে এগিয়ে আসেন সেজন্য সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। চক্ষুদানের ব্যাপারে যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংস্কার আছে সব দূর হয়ে যাওয়া উচিত। মনে রাখা উচিত, চক্ষুদানের মতো বড়ো দান জগতে আর নেই। মৃত্যুর পর যে দুটি চোখ গোটা দেহের সঙ্গে চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে অথবা কবরে মাটির সঙ্গে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেই দুটি চোখের দুটি কর্নিয়া যদি দুজন অন্ধ মানুষের চোখে বসানো যায় তাহলে মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকা যেতে পারে—এবং তা পারে ঐ দুজন মানুষের চোখের আলোয়।

চক্ষুদানের প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার—

১. বয়স্ক অবয়স্ক সকলেই চক্ষুদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দেবেন তাদের অভিভাবকরা।

২. যাঁদের চোখে চশমা আছে, ছানি কিংবা অন্য কোনো দোষ আছে তাঁরাও চক্ষুদান করতে পারেন। কিন্তু কর্নিয়ায় কোনো অসুখ থাকলে সে চোখ নেওয়া যাবে না। আবার যাঁরা ক্যান্সার, সিফিলিস, কুষ্ঠ, জলাতঙ্ক, এইডস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের চোখও অচল।

৩. মৃত মানুষের চোখ তুলে নেবার পর খালি জায়গায় প্লাস্টিকের চোখ বসিয়ে দেওয়া হয় অথবা চোখের পাতা সেলাই করে দেওয়া হয়, ফলে মৃতদেহ বিকৃত হতে পারে না।

৪. মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি চোখ তুলে নেওয়া যায় তত ভালো। তাই সঙ্গে সঙ্গে আই-ব্যাঙ্কে অথবা হাসপাতালে খবর দেওয়া দরকার যাতে মৃত্যুর চার ঘণ্টার মধ্যেই চোখ তুলে নেওয়া সম্ভব হয়। সমস্ত আই-ব্যাঙ্ক আর হাসপাতাল এই কাজের জন্য দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে।

৫. কেবল অন্ধ মানুষের চোখে দৃষ্টি দেবার জন্যই মৃত মানুষের চোখ দরকার হয় না, গবেষণার জন্যও দরকার হয়।

৬. আমাদের সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্মে অন্ধ মানুষের চোখে দৃষ্টি দেবার জন্য চক্ষুদান সমর্থন করা হয়েছে।

৭. কোনো অন্ধ মানুষকে কর্নিয়ার জন্য দাম দিতে হয় না, কর্নিয়া ট্র্যান্সপ্লান্টেশনের জন্যও তাঁর কোনো খরচ লাগে না।

৮. আপনার মৃত্যুর পরেও যাতে আপনার চোখ দুটি বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য এখনই আপনি কোনো আই-ব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করতে পারেন।

কুড়ি : পরিশিষ্ট

অপারেশন করে মাইওপিয়া সারানো

আমাদের চোখের কর্নিয়া অনেকটা অর্ধবৃত্তাকার, তার মাঝখানটা ধনুকের মতো ফোলা। এই ফোলা জায়গাটা যদি ফালি ফালি করে চিরে দেওয়া হয় তাহলে ফোলা-ভাব কমে গিয়ে কর্নিয়া কিছুটা চ্যাপ্টা হয়ে যায়। তাতে হাই মাইওপিয়া অনেকখানি কমে, চশমার পাওয়ার চার-পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। এই অপারেশনকে বলে রেডিয়াল কের্যাটোটমি।

এই অপারেশন খুব সহজ মনে হলেও নিরাপদ নয় সবসময়। কারণ, এই অপারেশনে কর্নিয়া অনেকগুলি রেখায় বেশ গভীর করে কাটতে হয় এবং তাতে ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে—যেখানে কর্নিয়ার সামান্য আঁচড়ও বিষিয়ে গিয়ে মারাত্মক ঘা হতে পারে ও তার ফলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

কম্পিউটরে চোখ পরীক্ষা

আজকাল প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখা যায়, 'কম্পিউটরের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমা দেওয়া হয়'। এই ধরনের বিজ্ঞাপনে অনেকেই আকৃষ্ট হন। তাঁরা মনে করেন, ডাক্তারের চেয়ে কম্পিউটর নির্ভুলভাবে চোখ পরীক্ষা করতে পারে। তাছাড়া কম্পিউটরে চোখ পরীক্ষা করালে তাঁদের আভিজাত্যও যেন বাড়ে।

তাঁদের জানা দরকার, কম্পিউটর চোখের ভিতরটা দেখতে পায় না, চোখে কোনো অসুখ থাকলে কম্পিউটরে তা ধরা পড়ে না। কম্পিউটর কেবল বাইরে থেকে হিসাব করে চশমার একটা পাওয়ার জানিয়ে দেয়। সেই পাওয়ার অনুযায়ী চশমা নিলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু চোখে কোনো অসুখ থাকলে তার কোনো প্রতিকার হয় না। পরে একসময় সেই অসুখ যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন ডাক্তারের কাছে যেতেই হয়, তখন ডাক্তারের পক্ষে কিছু করা সম্ভব না-ও হতে পারে, কারণ চোখের অনেক অসুখে সময় একটা বড়ো ব্যাপার, অসুখ ধরা পড়তে দেরি হয়ে গেলে বিশেষ কিছু করার থাকে না।

কম্পিউটরের সাহায্যে খুব সহজেই নির্ভুলভাবে চশমার সঠিক পাওয়ার নির্ণয় করা যায় ঠিকই, কিন্তু সঠিক অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঠিক পাওয়ারে সবসময় চোখে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় না। কম্পিউটরের দেওয়া পাওয়ারের চেয়ে অভিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসকের দেওয়া পাওয়ারেই বরং চোখে অনেক বেশি আরাম পাওয়া যায়। কম্পিউটর পাওয়ার-নির্ধারণে ডাক্তারকে অবশ্যই সাহায্য করতে পারে, কিন্তু শেষকথা বলবেন ডাক্তার।

পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন এই প্রথার চল—আগে কম্পিউটর বলে দেয় কত পাওয়ারের চশমা দরকার, শেষে ডাক্তার ঠিক করে দেন কত পাওয়ারের চশমা নিতে হবে।

চোখ পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছেই যাবেন

অনেকে চোখে ঝাপসা দেখলে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে চশমার দোকানে ছোটেন। 'বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমা দেওয়া হয়' বলে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, অনেকসময় সেই বিজ্ঞাপনে তাঁরা আকৃষ্ট হন। তাঁদের ধারণা, চোখে ঝাপসা দেখা তেমন কিছু না, চশমা নিলেই ঠিক হয়ে যায়, তার জন্য অযথা ডাক্তারকে পয়সা দেওয়া কেন! বিশেষ করে, বয়স্ক লোকদের মধ্যে এই ধারণাটা বেশি দেখা যায়। তাঁরা মনে করেন, বয়সের দোষে চোখে ঝাপসা দেখায়, তার জন্য ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই, চশমার দোকানে গিয়ে চশমা নিলেই চলে।

কিন্তু এর ফল অনেকসময় মারাত্মক হতে পারে। কারণ, চশমার দোকানের অপ্টিশিয়ান চক্ষুবিশেজ্ঞ নন। তিনি চোখের ভিতরটা পরীক্ষা করেন না, কেবল চার্ট পড়িয়ে চোখের পাওয়ার দেখেন, তারপর সেই পাওয়ার অনুযায়ী চশমা দেন। চোখে যদি তেমন কোনো অসুখ না থাকে তাহলে সেই চশমায় হয়তো কাজ হয়; আর যদি অসুখ থাকে তাহলে চশমায় ঝাপসা-ভাব কেটে গেলেও অসুখটা ধরা পড়ে না। চোখের এমন অনেক অসুখ আছে যাতে ঝাপসা দেখায় এবং চশমা নিলে সেই ঝাপসা-ভাব সাময়িকভাবে কেটে যায়, কিন্তু অসুখটা থেকেই যায়। অসুখটা তলে তলে বাড়তে বাড়তে একসময় হয়তো এমন আকার ধারণ করে যে, চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তাই শুধু ঝাপসা দেখা ছাড়া চোখে যদি অন্য কোনো উপসর্গ না-ও থাকে তবু চশমা নেবার আগে ডাক্তার দেখাবেন, অন্তত প্রথমবার।

চশমা ব্যবহার করবেন নিয়ম মেনে

কখনও অন্যের চশমা ব্যবহার করবেন না। মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পেলেই অমনি সে চশমা ব্যবহার করবেন না। সবসময় ডাক্তারের প্রেসকৃপশন অনুযায়ী চশমা তৈরি করিয়ে নেবেন এবং ভালো দোকান থেকে তৈরি করাবেন। শস্তার দিকে যাবেন না। চশমা তৈরি করাবার পর ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নেবেন।

চশমা ব্যবহার করার কতকগুলি নিয়ম আছে–

১. চশমা যতখানি সম্ভব চোখের কাছাকাছি থাকা উচিত। তাই সবসময় লক্ষ্য রাখবেন, ফ্রেম যেন ঢিলা না হয়, চশমা যেন নাকের নিচে নেমে না আসে।

২. চশমা যখন পরবেন বা খুলবেন, দু হাতে দুদিকের ডাঁটা ধরবেন। কখনও এক হাতে একদিকের ডাঁটা ধরে চশমা পরবেন না বা খুলবেন না। চশমা পরার বা খোলার সময় ডাঁটায় টান দেবেন না, আস্তে করে পরবেন বা খুলবেন।

৩. কখনও কাঁচ নিচের দিকে করে চশমা রাখবেন না, কারণ তাতে কাঁচে দাগ পড়ে যেতে পারে। ছানি-চশমা বা হাই পাওয়ারের চশমা সবসময় মুড়ে রাখবেন, কারণ এই ধরনের চশমার কাঁচের দিকটা ভারী বলে ব্যালান্স হারিয়ে এইদিকটা নিচে চলে যায় এবং তাতে কাঁচে দাগ পড়ে।

৪. চশমার ফ্রেমে কাঁচের ধারে ধারে খুব সহজেই ধুলোময়লা জমে। কাজেই মাঝে মাঝে হালকা সাবান-জলে একটা পুরনো টুথব্রাশ দিয়ে আলতো করে চশমা পরিষ্কার করবেন। চোখের অনেক ইরিটেশনের কারণ কিন্তু এই ধুলোময়লা। গায়ে-মাখা সাবানের জলে চশমা পরিষ্কার করলে চশমার কোনো ক্ষতি হয় না, বরং চশমা ভালো থাকে। ঘামে চশমার ফ্রেম খেয়ে যায়, তাই রোজ রাত্রে শোবার আগে যদি হালকা সাবান-জলে চশমা পরিষ্কার করতে পারেন তো ভালো হয়। চশমা ধোবার পর নরম ন্যাকড়া দিয়ে চশমা মুছে রাখবেন।

৫. চশমার লেন্স পরিষ্কার করার জন্য এক ধরনের কাগজ কিনতে পাওয়া যায়। বারবার সেই কাগজ ব্যবহার করলে লেন্স নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সিলিকোন এবং কিছু কেমিক্যাল ক্লীনারের ব্যাপারেও সাবধান, কারণ এইসব রাসায়নিকের ধোঁয়ায় অনেকসময় চোখে

ইরিটেশন হয়, চোখ লাল হয়। চশমা পরিষ্কার করার পক্ষে সবচেয়ে ভালো সাবান-জল।

সান-গ্লাস কিনবেন দেখেশুনে

মানুষের চোখ এমনভাবে তৈরি যে, সাধারণ অবস্থায় সান-গ্লাসের দরকার হয় না; একটা অন্ধকার ঘর থেকে বাইরে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় বার হলে চোখ অনায়াসে সেই আলোয় মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সান-গ্লাস অথবা ঐ ধরনের একটা রক্ষাকবচের দরকার হয়, যেমন—

১. অনেকক্ষণ ধরে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে গাড়ি চালাতে গেলে ইনফ্রা-রেড রশ্মির কবল থেকে চোখ রক্ষা করার জন্য সান-গ্লাসের দরকার হয়;
২. তুষারে অথবা বরফে কিংবা জলে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে পড়লে চোখের ক্ষতি হতে পারে, সেই কারণে আপনি যদি পাহাড়ের মাথায় অথবা মেরুপ্রদেশে কিংবা সাগরে যান তখন আপনার সান-গ্লাস দরকার হবে; এবং
৩. যাঁরা কলকারখানায় অ্যাসেটিলিন ফ্লেম অথবা অন্য কোনো প্রখর আলোয় কাজ করেন তাঁদের সান-গ্লাস না হলেও একধরনের প্রোটেকটিভ গ্লাসের দরকার হয়।

কিন্তু আমাদের অনেকেরই মনে হয়, চড়া রোদ্দুরে সান-গ্লাস পরে বার হলে চোখে কষ্ট কম হয়। এক্ষেত্রে গাঢ় রঙের চশমা না পরে আলো কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে এমন হালকা রঙের চশমা পরলেই চলে।

কেউ কেউ ঘরের ভিতরেও রঙিন চশমা পরেন। সেটা উচিত নয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার, স্বাভাবিক চোখে কোনো রক্ষাকবচ দরকার হয় না, যদি-না সেই চোখ আলোয় খুব সেন্সিটিভ হয়। যাঁদের চোখ আলোয় খুব সেন্সিটিভ নয় তাঁরা যদি ঘরের মধ্যেও রঙিন চশমা পরেন তাহলে তাঁদের চোখ আলোয় সেন্সিটিভ হয়ে ওঠে, তখন তাঁরা ঘরে বাইরে কোথাও রঙিন চশমা ছাড়া চলতে পারেন না। তাই যাঁদের চোখ স্বাভাবিক, ঘরের মধ্যে তাঁদের রঙিন চশমা পরা উচিত নয়। ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া শিশুদের কখনই রঙিন চশমা পরতে দেওয়া উচিত নয়।

বাজারে অনেক রঙের রঙিন চশমা পাওয়া যায়। যাঁরা সান-গ্লাস হিসাবে রঙিন চশমা ব্যবহার করতে চান তাঁরা বুঝেসুঝে রং বাছাই করবেন। যে

কোনো রঙের সান-গ্লাস যে কোনো জায়গায় চলে না। যেখানে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি বেশি, যেমন জলে ও বরফে, সেখানে হালকা লাল কিংবা হালকা বাদামী রঙের সান-গ্লাসই ভালো। গরমের দেশে কিংবা যখন তৃণহীন ঊষর অঞ্চলে অনেকক্ষণ গাড়ি চালাবার দরকার হয় তখন অত্যধিক ইনফ্রা-রেড রশ্মির কবল থেকে চোখ বাঁচাবার জন্য উপযুক্ত সান-গ্লাস হচ্ছে সবুজ অথবা সবুজাভ সান-গ্লাস। আর, রেগুলার সান-গ্লাস হিসাবে শহরের পথে মাঝেসাঝে পরার জন্য হালকা বাদামী অথবা হালকা ধূসর রঙের সান-গ্লাসই যথেষ্ট। রেগুলার সান-গ্লাস হিসাবে কখনও গাঢ় রঙের সান-গ্লাস ব্যবহার করবেন না, যত হালকা রঙে আপনি আরাম বোধ করেন তত হালকা রঙের সান-গ্লাসই ব্যবহার করবেন।

মনে রাখবেন, সান-গ্লাস হিসাবে নীল আর হলদে রঙের চশমা কোনো কাজের নয়। নীল রঙের চশমা ইনফ্রা-রেড রশ্মি বিশেষ শোষণ করতে পারে না। হালকা নীল রঙের চশমায় অবশ্য ক্ষতি কিছু হয় না, তবে এই রঙের সান-গ্লাস কেবলই 'শো'। হলদে রঙের চশমার অবশ্য কিছু সুবিধা আছে—এই রঙের চশমায় গ্লেয়ার অর্থাৎ আলোর চোখ-ধাঁধানো ভাব অনেকটা কমে, আর লাল ও সবুজের পার্থক্যটা বাড়ে। তাছাড়া মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিংবা হালকা কুয়াশায় হলদে রঙের চশমায় ভিজিবিলিটি অনেক বেশি পাওয়া যায়, তাই শিকারী, পাইলট, মোটর ড্রাইভার, টেনিস খেলোয়াড় এবং এই ধরনের লোকেরা হলদে চশমা পছন্দ করেন। কিন্তু তাঁরা যদি রাত্রে এই চশমা পরেন তাহলে বিপদ ঘটতে পারে, কারণ এই চশমায় রাত্রে গাঢ় রঙের জিনিস ভালো দেখা যায় না। হলদে রঙের চশমার অন্য ব্যবহার থাকলেও সান-গ্লাস হিসাবে কখনই হলদে রঙের চশমা পরতে বলা হয় না।

আজকাল অটোম্যাটিক সান-গ্লাস বলে একরকম সান-গ্লাস পাওয়া যায়, এই সান-গ্লাসকে ফোটোক্রোম্যাটিক লেন্সও বলা হয়। এই লেন্স ঘরের সাধারণ আলোয় 'সাদা'-ই থাকে, কিন্তু রোদ্দুরে আপনা থেকে বাদামী হয়ে যায়। রোদ্দুর থেকে ঘরে এলে আবার আপনা থেকেই রং বদলে আগের মতো 'সাদা' হয়ে যায়। এই ধরনের লেন্সের এখন খুব চল। যাঁরা পাওয়ারের চশমা পরেন তাঁরা অনেকেই এখন পাওয়ার-দেওয়া ফোটোক্রোম্যাটিক লেন্স ব্যবহার করেন।

বাজারে প্লাস্টিক সান-গ্লাস এখন ঢেলে বিক্রি হয়। প্লাস্টিক সান-গ্লাসের একটা অসুবিধা, যে রঙের সান-গ্লাসই হোক না কেন, ইনফ্রা-রেড রশ্মি ছেঁকে বাদ দিতে পারে না, ফলে চড়া রোদে অনেক দূরের রাস্তায় মোটর

ড্রাইভিংয়ের পক্ষে কোনো কাজের নয়। তবে ঠিকমতো তৈরি করা হলে প্লাস্টিক সান-গ্লাসের কতকগুলি সুবিধা আছে—অপ্টিক্সের দিক দিয়েও আছে। প্লাস্টিক সান-গ্লাস ওজনে হালকা বলেও তার কদর আছে।

প্লাস্টিক সান-গ্লাস আছে দুরকমের—ভালো আর খারাপ। ভালো প্লাস্টিক সান-গ্লাসের দাম বেশি, কিন্তু কাজের; আর খারাপ প্লাস্টিক সান-গ্লাস ফুটপাথের দোকানে খুব শস্তায় কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাজের নয়।

প্লাস্টিক সান-গ্লাস যদি কেনেন, দেখেশুনে কিনবেন। প্লাস্টিক সান-গ্লাস ভালো কিনা পরীক্ষা করার দুটি সহজ উপায় আছে। প্রথম, প্লাস্টিক সান-গ্লাস কেনার আগে দেখে নেবেন ধারেকাছে কোনো ল্যাম্প-পোস্ট বা ঐরকম কোনো খুঁটি আছে কিনা। তারপর খুঁটির দিকে মুখ করে হাতটা ছড়িয়ে প্লাস্টিক সান-গ্লাসটা ধরে আস্তে আস্তে একদিক থেকে আর-একদিকে সরাবেন। তাতে যদি খুঁটিটা বাঁকা বা এবড়োখেবড়ো দেখায় তাহলে বুঝবেন সান-গ্লাসটা ভালো নয়। দ্বিতীয়, একটা টিউব-লাইটের তলায় এমনভাবে প্লাস্টিক সান-গ্লাসটা ধরবেন যেন তাতে আলো প্রতিফলিত হতে পারে। সান-গ্লাস যদি ভালো হয় তাহলে দেখবেন সোজা পরিষ্কারভাবে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে আর প্রতিফলিত আলো যদি এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় তাহলে বুঝবেন সান-গ্লাসটা খারাপ।

খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখবেন না

খালি চোখে সূর্যের দিকে সাধারণত আমরা তাকাই না। তাকাবার দরকার হয় না, তাই তাকাই না। কিন্তু গ্রহণের সময় সূর্য কেমন করে একটু একটু করে রাহুগ্রস্ত হয়, গ্রহণের কলায় কলায় কী দৃশ্য ফুটে ওঠে তা দেখার কৌতূহল অনেকের। তাই প্রতিবার সূর্যগ্রহণের সময় বিশেষজ্ঞরা সাবধান করে দেন, খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখবেন না, চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তবে সূর্য যখন রাহুর পূর্ণগ্রাসে, সূর্য থেকে যখন সরাসরি কোনো রশ্মি আসতে পারে না তখন অবশ্য খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখায় বিপদ নেই। কিন্তু কৌতূহলে তো বাড়াবাড়ি থাকতে পারে, তাই খালি চোখে সূর্যগ্রহণ একেবারেই না দেখা ভালো।

প্রখর সূর্যের রশ্মি উত্তল লেন্সের ভিতর দিয়ে কাগজে কিংবা কাঠে ফেললে সহজেই আগুন ধরে যায়। আমাদের চোখের মধ্যে যে উত্তল লেন্স আছে সেই লেন্সে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে রেটিনায় পড়ে রেটিনা নষ্ট করে দিতে পারে। তাতে দৃষ্টিশক্তির অবলুপ্তি ঘটতে পারে।

এই ঘটনা গ্রহণের সূর্যেও ঘটতে পারে, আবার অগ্রহণের সূর্যেও ঘটতে পারে। গ্রহণ অথবা অগ্রহণ, খালি চোখে প্রখর সূর্যের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রধানত অতিবেগুনী রশ্মি আর অবলোহিত রশ্মির জন্যই চোখ নষ্ট হয়। অতিবেগুনী রশ্মির জন্য স্বচ্ছ লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গিয়ে চোখে ছানি পড়ে অন্ধতা ঘটতে পারে। অন্ধতা ঘটতে পারে অবলোহিত রশ্মির প্রভাবেও। অবলোহিত রশ্মি আসলে তাপরশ্মি। এই তাপরশ্মির শক্তি বেশি, লেন্স ভেদ করে সোজা চলে যায় রেটিনায়! রেটিনায় অনেকক্ষণ এই রশ্মি পড়লে রেটিনা ‘জ্বলে’ গিয়ে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অতএব গ্রহণ অগ্রহণ, কখনই খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকানো উচিত নয়। গ্রহণের সূর্য দেখতে হলে সূর্যরশ্মির প্রখরতা অন্তত এক লক্ষ গুণ কমাতে হবে, সেইসঙ্গে অতিবেগুনী রশ্মি আর অবলোহিত রশ্মি ছেঁকে বাদ দিতে হবে। দূরবীক্ষণযন্ত্রের আবিষ্কারক গ্যালিলিও তা পারেন নি, একটানা অনেকক্ষণ দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়ে সূর্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

সেই অন্ধতার অভিশাপ এড়াতে ভুলেও যেন কেউ দূরবীন বা বাইনোকিউলারের ভিতর দিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখার চেষ্টা না করেন। সান-গ্লাস বা কালো চশমায় আলোর তীব্রতা কমলেও অতিবেগুনী রশ্মি আর অবলোহিত রশ্মি আটকায় না, তাই সান-গ্লাসের মধ্য দিয়েও সূর্যগ্রহণ দেখা উচিত নয়।

সূর্যগ্রহণ দেখার সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ উপায় হল, সম্পূর্ণ এক্সপোজ করা এবং সম্পূর্ণ ডেভেলপ করা দুখণ্ড ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম একসঙ্গে করে তার ভিতর দিয়ে দেখা। অর্থাৎ, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ফোটোগ্রাফিক ফিল্মের দুখণ্ড নেগেটিভ গায়ে গায়ে লাগিয়ে তার ভিতর দিয়ে সূর্যের দিকে তাকানো। মনে রাখবেন, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ফিল্মের নেগেটিভ, রঙিন ফিল্মের নেগেটিভ নয়।

সম্পূর্ণ এক্সপোজার দেওয়া এক্স-রে ফিল্মের মধ্য দিয়েও নিরাপদে সূর্যগ্রহণ দেখা যেতে পারে। আবার, দুখণ্ড কাঁচ নিয়ে তার এক-একপিঠে ভালো করে ভুসোকালি মাখিয়ে কালি-মাখানো পিঠ দুটি একসঙ্গে করে তার মধ্য দিয়েও পারে। লোহাঝালাই কারখানায় ঝালাইকরেরা চোখের যে ঢাকনা ব্যবহার করে সেইরকম ঢাকনার মধ্য দিয়েও নিরাপদে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। কিন্তু ঘষা-কাঁচ কিংবা প্লাস্টিকের পাতের মধ্য দিয়ে কখনও নয়।

সান-গ্লাস, রঙিন ফিল্মের নেগেটিভ, ঘষা-কাঁচ, প্লাস্টিকের পাত ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ মনে হলেও মোটেই নিরাপদ নয়। এসবই অধাতব ফিলটার,

এসবে আলোর তীব্রতা কমলেও অতিবেগুনী রশ্মি আর অবলোহিত রশ্মি ছাঁকা যায় না।

কোনোরকম ফিলটারের মধ্য দিয়ে সূর্যের দিকে না তাকিয়েও সূর্যগ্রহণ দেখা যেতে পারে। কালো পাথরেব বাটিতে জল রেখে সেই জলের দিকে তাকিয়ে স্পর্শ থেকে মোক্ষ পর্যন্ত গ্রহণের প্রতিটি কলা সুন্দরভাবে দেখা যায়। কিন্তু বাটিটি কালো পাথরের হওয়া চাই; কাঁসা, পিতল, স্টেনলেস স্টীল অথবা অন্য কোনো ধাতুর নয়। ধাতুর বাটি হলে সৌরবিকিরণের প্রতিফলনে চোখ ঝলসে যেতে পারে।

সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য অল্প খরচে ও অল্প পরিশ্রমে খুব সহজেই একটা বীক্ষণযন্ত্রও তৈরি করে নিতে পারেন। একটা অ্যালিউমিনিয়মের পাত কিংবা পিজবোর্ডের মাঝখানে আলপিন অথবা ছুঁচ দিয়ে ছোট্ট একটি ছিদ্র করবেন। ছিদ্রের ব্যাস হবে এক মিলিমিটার মতো। সছিদ্র এই অ্যালিউমিনিয়মের পাত কিংবা পিজবোর্ডটা ঘরের সাদা দেওয়াল থেকে এক মিটার দূরত্বে এমনভাবে ধরবেন যেন ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি এসে দেওয়ালে পড়ে। এইভাবে ঘরের দেওয়ালে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাবে।

যদি আরও বেশি স্পষ্ট দেখতে চান তাহলে একখণ্ড কালো কাগজ নিয়ে তার মাঝখানে এক থেকে দু সেন্টিমিটার ব্যাস ধরে গোল করে একটা ছিদ্র তৈরি করবেন, তারপর কাগজটা একটা ছোটো আয়নায় সেঁটে দেবেন। গ্রহণের সময় আয়নাটা এমনভাবে ধরবেন যেন সূর্যের আলো আয়নার ঐ ফাঁকা জায়গায় প্রতিফলিত হয়ে ঘরের দেওয়ালে এসে পড়ে। এইভাবে সরাসরি সূর্যের দিকে না তাকিয়ে ঘরের দেওয়ালেই আপনি সূর্যগ্রহণ দেখতে পারেন।

যদি কোনো কারণে খালি চোখে সরাসরি সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখেই ফেলেন এবং তার দরুন চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুচিকিৎসকের দ্বারস্থ হবেন। নিজে ডাক্তারি করবেন না, হাতুড়ে বদ্যির শরণও নেবেন না।

চোখে কাজল সুর্মা পরবেন না

অনেক মহিলা সুন্দর দেখাবে বলে চোখে কাজল কিংবা সুর্মা পরেন। শিশুদের চোখে কাজল পরানো আজও অনেক জায়গায় নিত্যদিনের ঘটনা। শিশুদের কাজল পরানো হয় প্রধানত চোখ ভালো হবে বলে। অনেকসময় 'নজর' লাগার হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্যও কাজল পরানো হয়।

শিশুদের যাঁরা কাজল পরান তাঁদের জানা দরকার, কাজলে চোখ ভালো হয় না, বরং খারাপ হতে পারে। কাজল পরালে চোখ একটু বড়ো দেখায়, এই যা। নইলে কাজল পরানোর কোনো সদ্‌গুণ নেই, উলটে অপগুণ দেখা দিতে পারে। আর, 'নজর' লাগা? সে তো সম্পূর্ণ অন্ধবিশ্বাস।

কাজল আর সুর্মা পরলে মহিলাদের সুন্দর দেখায় কিনা, সে যে যেমন দেখে। তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু যা নিয়ে তর্ক হতে পারে না তা হল, কাজলে আর সুর্মায় অনেকসময় চোখের ক্ষতি হতে পারে। বড়োদেরও পারে, ছোটোদেরও পারে।

বাড়িতে কাজল তৈরি করা হয় সাধারণত প্রদীপের সলতে পুড়িয়ে। কাজল-লতায় তেল কিংবা ঘি মাখিয়ে প্রদীপের শিখার উপর ধরলে কাজল-লতায় ভুসো পড়ে, সেই ভুসো মাড়লে কাজল হয়। ভুসো আসলে কার্বন। এমনিতে তা বিষাক্ত নয়, কিন্তু কাজল-লতা খোলা থাকলে তাতে পোকামাকড় পড়ে কাজল বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। কাজল-লতা সবসময় ঢেকে রাখলে এই ভয় থাকে না। সুতরাং বাড়িতে তৈরি কাজল অনেকটাই নিরাপদ।

কিন্তু কেনা কাজলে বিপদ ঘটতে পারে। কাজলের ব্যবসা যারা করে তারা বাড়ির মতো করে কাজল তৈরি করবে ভাবা মূঢ়তা। অতক্ষণ ধরে সলতে পুড়িয়ে অল্প অল্প করে তারা ভুসো তৈরি করবে মনে করা উচিত নয়। ভুসোর বদলে কী দিয়ে তারা কাজল তৈরি করে কে জানে! তাদের কাজলে চোখের পক্ষে ক্ষতিকর জিনিস থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং বাজার থেকে কেনা কাজল ব্যবহার করলে চোখ নষ্ট হতে পারে।

বাড়িতে তৈরি কাজলই হোক কি দোকান থেকে কেনা কাজল, কাজল চোখের পক্ষে 'ইরিট্যান্ট', অর্থাৎ চোখের মধ্যে কাজল গেলে চোখ জ্বালা করে। তাতে চোখের ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া চোখের মতো নরম এবং সংবেদনশীল জায়গায় চটচটে কিছু না লাগানোই ভালো। কারণ, রোগজীবাণুই হোক কি ধুলোবালি, সেখানে আটকে গিয়ে চোখের ক্ষতি করতে পারে।

সুর্মায় সীসা থাকে, সীসা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। সীসার বিষে চোখের ক্ষতি হতে পারে।

তাই কী দরকার কাজল অথবা সুর্মা পরার? খুব যদি ইচ্ছা হয় তাহলে বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে তৈরি এবং পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নভাবে রাখা কাজলই পরবেন।

চোখ পরিশ্রান্ত হলে যা করবেন

অনেকের ধারণা, বেশি লেখাপড়া করলে কি সেলাইফোঁড়াই করলে চোখ খারাপ হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, যদি নিয়ম মেনে লেখাপড়া বা সেলাইফোঁড়াই করা হয় তাহলে বেশি ব্যবহারেও চোখ খারাপ হয় না।

নিয়ম মেনে খুব বেশি চোখ ব্যবহার করলে চোখ পরিশ্রান্ত হতে পারে। চোখ পরিশ্রান্ত হলে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবেন, আরাম লাগবে। অনেকে দূর থেকে জোরে জোরে চোখে জলের ঝাপটা দেন, তাতে চোখের ক্ষতি হতে পারে। চোখে আঘাত লাগে এমনভাবে চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া উচিত নয়। চোখে জলের ঝাপটা দেবার জন্য আঁজলা ভরে জল নেবেন, তারপর চোখের দু ইঞ্চি মতো কাছে এনে জলটা হড়াৎ করে চোখে ছিটিয়ে দেবেন। এইরকম বার কুড়ি করবেন, তারপর চোখমুখ মুছে ফেলবেন।

নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়লে খানিকক্ষণ যদি চোখ বুজে থাকেন তাহলে চোখে এক ধরনের আরাম লাগে, চোখ হালকা মনে হয়; দৃষ্টিও পরিষ্কার হয়ে যায়। চোখ বুজলে চোখের মধ্যে আলোর প্রবেশ কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, চোখের পাতা ভেদ করে কিছু আলো তখনও চোখের মধ্যে যায়। চোখ বুজে চোখের সামনে একটা হাত নাড়ুন, পরিষ্কার বুঝতে পারবেন একটা ছায়া নড়ছে। এখন, চোখের মধ্যে আলোর প্রবেশ যদি সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায় তাহলে চোখের ক্লান্তি আরও বেশি দূর হয় এবং চোখে আরও বেশি আরাম বোধ হয়।

খুব সহজে যে পদ্ধতিতে চোখের মধ্যে আলোর প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়, ইংরেজীতে তাকে বলে পামিং। পাম মানে হাতের তালু, দু হাতের তালু দিয়ে চোখদুটো এমনভাবে ঢাকুন যেন আঙুলগুলি থাকে কপালে, এক হাতের আঙুল আর-এক হাতের আঙুলের উপর আড়াআড়ি। দু হাতের তালু দু চোখের উপর আলতোভাবে থাকবে, চোখে কোনো চাপ পড়বে না। এইভাবে দু চোখ দু হাতের তালু দিয়ে ঢেকে দিলে চোখের মধ্যে কোনো আলো যেতে পারবে না, ফলে চোখের সামনে একটা নিঃসীম কালো সমুদ্র দেখা যাবে। আপনি যত বেশি কালো দেখতে পাবেন, চোখের আরাম তত বেশি হবে। চোখে কালো দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যদি মনেও কালো ভাবেন তাহলে কালো আরও ঘন মনে হবে, আপনি আরও বেশি আরাম পাবেন। আপনি যদি ঠিকমতো পামিং করতে পারেন, চোখ খোলার পর দেখবেন, চোখে কী ঠাণ্ডা হালকা অনুভূতি; আপনার যত চোখের ক্লান্তি, চোখের ব্যথা আর

মাথাধরা যেন অনেকখানি দূর হয়ে গেছে। মনটা হালকা লাগছে, শরীরটাও ভালো লাগছে। কিন্তু শরীরমন যদি ভালো না থাকে তাহলে ঠিকমতো পামিং করা যায় না। শরীরের ক্লান্তি, ক্ষুধা, ক্রোধ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভাবনা, চিন্তা ইত্যাদিতে ভালো পামিং হয় না।

পামিং করার জন্য প্রথমে আপনাকে আরাম করে বসতে হবে, তারপর দু হাতের তালু দিয়ে দু চোখ আলতো করে ঢাকতে হবে। চোখে চাপ পড়বে না একেবারে। দু হাতের আঙুল আড়াআড়িভাবে থাকবে কপালের উপর। কনুই যাতে ভার হয়ে না যায় সেজন্য কনুইয়ের তলায় একটা বালিশ দিয়ে নেবেন অথবা কনুই দুটো টেবিলের উপর রাখবেন। একবারে সাধারণত পাঁচ থেকে দশ মিনিট পামিং করলেই চলে। তবে আপনি যদি বেশি করতে চান তাতে ক্ষতি কিছু নেই, বরং ভালো। গরমকালে পামিংয়ের সময় চোখে যদি গরম লাগে অথবা হাত ঘামে তাহলে হাতের তালুতে ভিজে তুলো দিয়ে নেবেন।

দিনেরাতে যে কোনো সময় পামিং করতে পারেন এবং যতবার খুশি ও যতক্ষণ খুশি করতে পারেন, কিন্তু পামিং করার সময় মনে মনে যদি কালো ভাবতে না পারেন তাহলে পামিংয়ে ভালো ফল পাবেন না। পামিং মানে কেবল চোখের মধ্যে আলোর প্রবেশ বন্ধ করে চোখে কালো দেখা নয়, মনেও কালো ভাবা।

নিয়ম করে সকালে যদি একবার পামিং করেন আর সারা দিনেরাতে চার-পাঁচবার তাহলে চোখের ক্লান্তি থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকতে পারবেন। রাত্রে শোবার আগে যদি একবার পামিং করে নেন তাহলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে, ঘুম হবেও ভালো।

পামিং করার আগে ঠাণ্ডা জলে চোখমুখ আর হাত ধুয়ে নেবেন, পামিং করার পরে ঘন ঘন বার কয়েক আস্তে করে চোখের পাতা ফেলবেন।

পামিংয়ে বেশির ভাগ লোকেরই উপকার হয়, কিন্তু কিছু লোকের অপকারও হতে পারে। পামিংয়ের ফলে কারও কারও চোখে স্ট্রেন বেড়ে যায়। তাঁরা পামিং করবেন না। তাঁরা অন্য উপায়ে চোখের ক্লান্তি দূর করবেন।

শিশুদের চোখ খারাপ বুঝবেন যেমন করে

এখন অল্পবয়সেই অনেক ছেলেমেয়ের চোখ খারাপ হয়, বিশেষ করে যারা লেখাপড়া করে। তারা প্রথম যখন স্কুলে যায় তখন তাদের অনেকেরই চোখ ভালো থাকে, কিছুদিন পরেই চোখ খারাপ হয়। যাদের চোখ খারাপ

হয় তাদের বেশির ভাগেরই চোখে হাইপারমেট্রোপিয়া আর অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্ দেখা যায়। দশ-বার বছর বয়সে দেখা যায় মাইওপিয়া।

এই যে অল্পবয়সে চোখ খারাপ হওয়া এর অন্যতম প্রধান কারণ স্ট্রেন। স্কুলে ছেলেমেয়েদের চোখে যাতে স্ট্রেন না হয় সেজন্য কেমন জায়গায় স্কুল হবে, ক্লাসঘর কত বড়ো হবে, আলো কীরকম হবে, ডেস্ক কত উঁচু হবে, বইয়ের হরফ কোন্ সাইজের হবে—এইরকম অনেক নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক'জন মানছে সেই নিয়ম? এখন তো যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো স্কুল গজাচ্ছে কোনো নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই। শিশুদের স্কুল এখন একটা ভালো ব্যবসা, এই ব্যবসার খাতিরেই এখন বাড়ির গ্যারেজেও স্কুল গজাচ্ছে। আলো-বাতাসের ব্যাপার নেই, খোলামেলার পরোয়া নেই—'ইংলিশ মিডিয়াম কিণ্ডারগার্টেন স্কুল' বলে একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিলেই হল।

স্কুলে ছেলেমেয়েদের চোখ খারাপ হওয়ার আরও কতকগুলি কারণ আছে, যেমন—শারীরিক অথবা মানসিক শাস্তির ভয়, নিরানন্দ বিষয়ে পড়াশোনা, পরীক্ষা অথবা অন্য কোনো কারণে আতঙ্ক এবং এমনসব মানুষের সংস্পর্শে আসা যাদের ধরণধারণ ও মেজাজ আলাদা।

শিশুদের চোখ খারাপ হয়েছে কিনা তাদের কতকগুলি আচরণ দেখে বোঝা যায়, যেমন— চোখ খারাপ হলে তারা

১. ঘন ঘন চোখ রগড়াবে;
২. প্রায়ই এক চোখ বন্ধ করে অথবা হাত দিয়ে এক চোখ ঢেকে অন্য চোখে তাকাবে;
৩. ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তেরছাভাবে চাইবে;
৪. অনেকক্ষণ লেখাপড়া করার পর মাথা ধরেছে বলবে;
৫. লেখাপড়া করার সময় একদিকে মাথা কাত করে থাকবে;
৬. বইখাতা চোখের খুব কাছে এনে ধরবে;
৭. পড়ার সময় বইয়ের উপর চোখ সরাবার বদলে মাথা সরাবে;
৮. ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে খাতায় লেখা টোকার সময় অনেক কথা বাদ দেবে;
৯. চোখের পাতা ফুলবে, বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে;
১০. বাসে ট্রামে মোটরে, এমন কি ট্রেনে চড়লেও অসুস্থতা বোধ করবে; এবং
১১. যে কোনো সময় চোখে অন্ধকার দেখবে।

চোখের অসুখের পূর্বাভাস পাবেন যা দেখে

চোখের অনেক অসুখেরই কিছু-না-কিছু বিপদসঙ্কেত বা পূর্বাভাস পাওয়া যায় এবং সেগুলিকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১. চোখ লাল হওয়া। অনেকসময় কোনো গুরুতর অসুখের পূর্বলক্ষণ হিসাবে চোখ লাল হতে পারে এবং সেই অসুখে চোখ অন্ধও হয়ে যেতে পারে। কোনো গুরুতর অসুখের পূর্বলক্ষণ হিসাবে যদি চোখ লাল হয় তাহলে—
   ক. দৃষ্টিহানি ঘটতে পারে,
   খ. চোখে যন্ত্রণা হতে পারে,
   গ. কর্নিয়ার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে,
   ঘ. আকারে ও আয়তনে পিউপিল অসমাঙ্গ হয়ে যেতে পারে,
   ঙ. কর্নিয়ার চারধারে লাল-ভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে,
   চ. চোখের মধ্যে চাপ অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যেতে পারে,
   ছ. আগের কোনো চোখের অসুখ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে,
   জ. উপযুক্ত চিকিৎসাতেও তিন-চারদিনের মধ্যে ফল না পাওয়া যেতে পারে।

২. চোখে অস্বস্তি অথবা যন্ত্রণা হওয়া, বিশেষ করে চোখে কোনো আঘাতের পর।

৩. দৃষ্টি বিঘ্নিত হওয়া, যেমন—
   ক. দূরের অথবা কাছের কোনো জিনিস দেখতে অসুবিধা,
   খ. দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া অথবা আলোর চারধারে রামধনু দেখা,
   গ. সাইড ভিশন নষ্ট হয়ে যাওয়া,
   ঘ. একটা জিনিসকে সবসময় দুটো জিনিস দেখা,
   ঙ. চোখের সামনে হঠাৎ কালো কালো ফুটকি ভাসতে দেখা।

৪. চোখ টেরা হওয়া, বিশেষ করে শিশুদের।

৫. চোখে অথবা চোখের পাতায় ব্রণ হওয়া কিংবা কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে যাওয়া।

৬. সবসময় চোখে পিচুটি পড়া, ছাল ওঠা কিংবা জল ঝরা।

৭. দু চোখের পিউপিলের আয়তন অসমান হয়ে যাওয়া কিংবা আকারে বিকৃতি ঘটা।

এইরকম কোনো একটি উপসর্গও যদি দেখা দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো উচিত।

চোখ পরীক্ষার ব্যাপারে সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রয়োজ্য কোনো নিয়ম নির্দেশ করা কঠিন, তবে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে—

১. জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চোখ পরীক্ষা করা দরকার যাতে জানা যায় শিশু চোখে কোনো বিকৃতি নিয়ে জন্মেছে কিনা, জন্মের সময় তার চোখে আঘাত লেগেছে কিনা এবং জন্মের পর তার চোখে কোনো ইনফেকশন হয়েছে কিনা ;
২. চোখে অ্যামব্লাইওপিয়া আছে কিনা দেখার জন্য শিশুর চার-পাঁচ বছর বয়সে চোখ পরীক্ষা করা দরকার ;
৩. চল্লিশ বছর বয়সের পর চোখে কোনো উপসর্গ থাক বা না-থাক, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর চোখ পরীক্ষা করা দরকার, কারণ চল্লিশ বছর বয়সের পরেই অন্ধত্বের ঘটনা বেশি ঘটে ;
৪. পরিবারে কারও চোখে যদি গ্লকোমার ইতিহাস থেকে থাকে তাহলে চল্লিশ বছর বয়স হলেই বছরে অন্তত একবার চোখের চাপ পরীক্ষা করা দরকার ;
৫. ডায়াবিটিজ ও হাই ব্লাড প্রেশার থাকলে বছরে একবার চোখ পরীক্ষা করা দরকার, তা সে কোনো উপসর্গ থাক আর না-ই থাক ; এবং
৬. চোখে কোনো অপারেশনের পর ডাক্তার মাঝে মাঝে চোখ পরীক্ষা করতে বলেন, আবার চোখে গুরুতর রকমের ইনফ্ল্যামেশন হলে কিংবা ডায়াবিটিজে রেটিনা আক্রান্ত হলে অথবা চোখে অন্য কোনো বড়ো রকমের অসুখ থাকলেও ডাক্তার মাঝে মাঝে চোখ পরীক্ষা করতে বলেন—ডাক্তার যখনই চোখ পরীক্ষা করতে বলবেন তখনই চোখ পরীক্ষা করা দরকার।

ইংরেজী বানানে

অকসিফেনবুটাজোন	oxyphenbutazone
অঙ্কোসারসিয়াসিস	onchocerciasis
অটোমেশন	automation
অপ্টিক ডিস্ক	optic disc
অপ্টিক নার্ভ	optic nerve
অপ্টিক্যাল	optical
অপ্টিক্যাল এড	optical aid
অপ্টিক্স	optics
অপ্টিশিয়ান	optician
অর্থোপ্টিক একসারসাইজ	orthoptic excercise
আই-কাপ	eye-cup
আই-ড্রপ	eye-drop
আই-বল	eye-ball
আই মেক-আপ	eye make-up
আইরাইটিস	iritis
আইরিডেকটমি	iridectomy
আইরিস	iris
আউট অভ ফোকাস	out of focus
আরথ্রাইটিস	arthritis
আর্টারিওসক্লেরোসিস	arteriosclerosis
আলট্রা-ভায়োলেট	ultra-violet
আলট্রা-সোনিক ওয়েভ	ultra-sonic wave
অ্যাকিউট গ্লকোমা	acute glaucoma
অ্যাকোমোডেশন	accommodation
অ্যাডজাস্ট	adjust
অ্যাড্যাপ্টেশন	adaptation
অ্যানিমিয়া	anaemia

অ্যান্টিরিয়র চেম্বার	anterior chamber
অ্যামব্লাইওপিক	amblyopic
অ্যামব্লাইওপিয়া	amblyopia
অ্যালক্যালি	alkali
অ্যাসেটিলিন ফ্লেম	acetylene flame
অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম্‌	astigmatism
ইথাইল অ্যালকোহল	ethyl alcohol
ইথামবুটল	ethambutol
ইনট্রা-অকিউলার লেন্স	intra-ocular lens
ইনট্রা-ক্যাপসিউলার এক্সট্র্যাকশন	intra-capsular extraction
ইনভল্যুশনাল ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন	involutional macular degeneration
ইনফেকশন	infection
ইনফ্রা-রেড	infra-red
ইনফ্ল্যামেশন	inflammation
ইনার আই	inner eye
ইমার্জেন্সি অপারেশন	emergency operation
ইমার্জেন্সি কণ্ডিশন	emergency condition
ইয়াগ লেজার	YAG laser
ইয়েলো স্পট	yellow spot
ইরিটেশন	irritation
ইরিট্যান্ট	irritant
ইল্‌স্‌ ডিজিজ	Eales' disease
ইলেকট্রিক কেব্‌ল্‌	electric cable
ঈডিমা	oedema
এইডস	AIDS
একুইয়াস হিউমার	aqueous humour
এক্সটেণ্ডেড ওয়্যার	extended wear
এক্সট্রা-ক্যাপসিউলার এক্সট্র্যাকশন	extra-capsular extraction
এনজাইম	enzyme
এয়ারোসল-স্প্রে	aerosol spray
ওয়াইড অ্যাঙ্গল ভিউ	wide angle view
ওয়ার্নিং সিমটম	warning symptom

কনকমিট্যাণ্ট স্কুইণ্ট	concomitant squint
কনকেভ	concave
কনজাংটাইভা	conjunctiva
কনজাংটিভাইটিস	conjuctivitis
কনজেনিট্যাল	congenital
কনজেনিট্যাল ক্যাট্যার্যাক্ট	congenital cataract
কনজেনিট্যাল গ্লকোমা	congential glaucoma
কনট্যাক্ট লেন্স	contact lens
কনট্র্যাস্ট	contrast
কনভার্জেণ্ট স্কুইণ্ট	convergent squint
কনভেক্স	convex
কনসেনট্রেটেড	concentrated
কণ্ডিশন	condition
কমপ্লিকেশন	complication
কম্প্রেস	compress
করোয়েড	choroid
কর্নিয়া	cornea
কর্নিয়া ট্র্যান্সপ্লাণ্ট	cornea transplant
কর্নিয়াল	corneal
কর্নিয়াল স্কারিং	corneal scarring
কসমেটিক সার্জারি	cosmetic surgery
কার্ডিও-ভ্যাসকিউলার সিস্টেম	cardio-vascular system
কালার ব্লাইণ্ড	colour blind
কালার ভিশন	colour vision
ক্রিস্ট্যালিন	crystalline
কেমিক্যাল ক্লীনার	chemical cleaner
কেরাটোকোনাস	keratoconus
কেরাটোম্যালেশিয়া	keratomalacia
কোন্	cone
কোরিওরেটিনাইটিস	chorioretinitis
কোল্ড ট্রিটমেণ্ট	cold treatment
ক্যাট্যার্যাক্ট	cataract

ক্যাপসিউল	capsule
ক্যারোটিন	carotene
ক্রনিক গ্লকোমা	chronic glaucoma
ক্রায়োথেরাপি	cryotherapy
ক্রায়ো-প্রোব	cryo-probe
ক্লীনিং ফ্লুইড	cleaning fluid
ক্লোরোকুইন	chloroquin
গ্যালাকটোসিমিয়া	galactosaemia
গ্যাস পারমিয়েব্‌ল্‌	gas permeable
গ্রাইণ্ডিং মেশিন	grinding machine
গ্রাফ্‌ট্‌	graft
গ্লকোমা	glaucoma
গ্লেয়ার	glare
জার	jar
জার্মান মীজ্‌ল্‌স্‌	German measles
জেরফথ্যালমিয়া	xerophthalmia
জেল্যাটিন	gelatine
টকসোপ্লাজমা	toxoplasma
টানেল ভিশন	tunnel vision
টিউন	tune
টিউব ভিশন	tube vision
টিউমার	tumour
টিস্যু	tissue
টিস্যু পেপার	tissue paper
টোট্যাল ব্লাইণ্ডনেস	total blindness
টোসিস	ptosis
ট্রম্যাটিক ক্যাট্যার্যাক্ট	traumatic cataract
ট্র্যাকশন রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট	traction retinal detachment
ট্র্যাকোমা	trachoma
ট্র্যান্সপ্লাণ্ট	transplant
ট্র্যান্সপ্লাণ্টেশন	transplantation
ট্র্যাবিকিউল্লেকটমি	trabeculectomy

ডাইভার্জেন্ট স্কুইন্ট	divergent squint
ডাব্‌ল্ ভিশন	double vision
ডায়াবিটিজ	diabetes
ডায়াবিটিজ মেলিটাস	diabetes mellitus
ডায়াবেটিক	diabetic
ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি	diabetic retinopathy
ডিজেনারেশন	degeneration
ডিট্যাচমেন্ট	detachment
ডিফিউজার	diffuser
ডিসইনফেক্ট	disinfect
ডেভেলপমেন্টাল ক্যাট্যার্যাক্ট	developmental cataract
ড্যাক্রিওসিস্টাইটিস	dacryocystitis
থ্রি ডাইমেনশনাল	three dimensional
নন-প্যারালিটিক স্কুইন্ট	non-paralytic squint
নাইট ভিশন	night vision
নিউট্র্যালাইজ	neutralize
নিয়ার পয়েন্ট	near point
নিয়ারসাইটেড	nearsighted
নিয়ারসাইটেডনেস	nearsightedness
নিস্ট্যাগমাস	nystagmus
পস্টিরিয়র চেম্বার	posterior chamber
পাম	palm
পামিং	palming
পারসিস্টেন্স অভ ভিশন	persistence of vision
পার্ট-টাইম ওয়্যার	part-time wear
পার্সপেকটিভ	perspective
পিউপিল	pupil
পিগমেন্ট লেয়ার	pigment layer
পেরিফের‍্যাল	peripheral
পেরিফের‍্যাল ভিশন	peripheral vision
প্যান-রেটিন্যাল ফোটোকোয়াগিউলেশন	pan-retinal photocoagulation
প্যারালিটিক স্কুইন্ট	paralytic squint

প্রলিফারেট	proliferate
প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি	proliferative diabetic retinopathy
প্রিজম্ কারেকশন	prism correction
প্রেসবাইওপিয়া	presbyopia
প্রোটিন	protein
প্রোটেকটিভ ক্যাপ	protective cap
প্রোটেকটিভ গ্লাস	ptotective glass
ফরসেপ	forceps
ফলো-আপ ভিজিট	follow-up visit
ফার পয়েন্ট	far point
ফারসাইটেডনেস	farsightedness
ফার্স্ট এড	first aid
ফাঙ্গাস	fungus
ফিলটার	filter
ফিল্ড অভ ভিশন	field of vision
ফেস প্রোটেকটর	face protector
ফেসিয়াল নার্ভ	facial nerve
ফোকাস	focus
ফোটোক্রোম্যাটিক লেন্স	photochromatic lens
ফোভিয়া সেণ্ট্রালিস	fovea centralis
ফ্লিকটেনিউলার কনজাংটিভাইটিস	phlyctenular conjunctivitis
ফ্লিকার	flicker
ফ্লিকার ইফেক্ট	flicker effect
ফ্লুওরেসেন্ট	fluorescent
বর্ডারলাইন	borderline
বাই-কনভেক্স লেন্স	bi-convex lens
বাইনোকিউলার ভিশন	binocular vision
বিটট্স্ স্পট	Bitot's spot
বুফথ্যালমস	buphthalmos
ব্যাকগ্রাউণ্ড ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি	background diabetic retinopathy
ব্যাকটিরিয়া	bacteria
ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক	broad-spectrum antibiotic

ব্রাইটনেস	brightness
ব্রিলিয়্যান্স	brilliance
ব্রেক	break
ব্লাইণ্ড এরিয়া	blind area
ব্লাইণ্ড স্পট	blind spot
ব্লাড ভেস্ল্	blood vessel
ভাইরাস	virus
ভার্নাল কনজাংটিভাইটিস	vernal conjunctivitis
ভিউ	view
ভিজিবিলিটি	visibility
ভিজ্যুয়াল কর্টেক্স	visual cortex
ভিজ্যুয়াল পার্প্ল্	visual purple
ভিজ্যুয়াল সিস্টেম	visual system
ভিট্রিয়াস হিউমার	vitreous humour
ভিট্রেকটমি	vitrectomy
মনিটর	monitor
মনোকিউলার অ্যাফেকিয়া	monocular aphakia
মাইওপিক	myopic
মাইওপিয়া	myopia
মাইক্রোসার্জারি	microsurgery
মাল্টিপ্ল্ স্ক্লেরোসিস	multiple sclerosis
মিউকাস	mucus
মিথাইল অ্যালকোহল	methyl alcohol
মেট্যাবলিক ক্যাট্যার্যাক্ট	metabolic cataract
ম্যাকিউলা	macula
ম্যাকিউলার ঈডিমা	macular oedema
ম্যাকিউলার ডিজেনারেশন	macular degeneration
ম্যাগনিফাইং গ্লাস	magnifying glass
ম্যাগনিফিকেশন	magnification
রড্	rod
রিজেকশন	rejection
রিজেক্ট	reject

রিফ্র্যাকটিভ এরার	refractive error
রুবেলা	Rubella
রেগুল্যার	regular
রেটিনা	retina
রেটিনাইটিস	retinitis
রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা	retinitis pigmentosa
রেটিনোব্লাস্টোমা	retinoblastoma
রেটিন্যাল ডিট্যাচমেণ্ট	retinal detachment
রেটিন্যাল সেপারেশন	retinal separation
রেটিন্যাল ব্রেক	retinal break
রেট্রোলেন্টাল ফাইব্রোপ্লাসিয়া	retrolental fibroplasia
রেডিয়াল কের‍্যাটোটমি	radial keratotomy
লংসাইটেডনেস	longsightedness
লাইফ-স্টাইল	life-style
লিগ্যাল ব্লাইণ্ডনেস	legal blindness
লীস্ট ডিস্ট্যান্স অভ ডিস্টিংক্ট ভিশন	least distance of distinct vision
লুব্রিকেশন	lubrication
লুব্রিক্যান্ট	lubricant
লেজার	laser
লেজার ট্রিটমেণ্ট	laser treatment
লেজার ফোটোকোয়াগিউলেশন	laser photocoagulation
লেজি আই	lazy eye
লো ভিশন	low vision
লো-ভিশন অপ্টিক্যাল এড	low-vision optical aid
লো-ভিশন এড	low-vision aid
ল্যাগ-অফথ্যালমোস	lagophthalmos
শর্টসাইটেডনেস	shortsightedness
সফিস্টিকেশন	sophistication
সাইড-এফেক্ট	side-effect
সাইড ভিশন	side vision
সাকশন-ইভ্যাকিউয়েশন	suction-evacuation
সাব-কনজাংটাইভ্যাল হীমারেজ	sub-conjunctival haemorrhage

সারফেস টেনশন	surface tension
সার্জিক্যাল	surgical
সাসপেন্সরি লিগামেন্ট	suspensory ligament
সিঙ্ক	sink
সিমপ্যাথেটিক অফথ্যালমিয়া	sympathetic ophthalmia
সিরাম	serum
সিলিকোন	silicone
সিলিন্ড্রিক্যাল	cylindrical
সিলিয়ারি বডি	ciliary body
সিলিয়ারি মাস্‌ল্	ciliary muscle
সীনাইল ক্যাট্যার‍্যাক্ট	senile cataract
সেকেণ্ডারি গ্লকোমা	secondary glaucoma
সেট	set
সেণ্ট্রাল আর্টারি	central artery
সেণ্ট্রাল ভিশন	central vision
সেণ্ট্রাল ভেইন	central vein
সেণ্ট্রাল সেরাস রেটিনোপ্যাথি	central serous retinopathy
সেফটি গ্লাস	safety glass
সেফটি রুল	safety rule
সেন্সিটিভ	sensitive
স্কার	scar
স্কার টিস্যু	scar tissue
স্ক্লেরা	sclera
স্ক্লেরোটিক	sclerotic
স্টেরয়েড	steroid
স্টেরাইল গজ	sterile gauze
স্টেরিওস্কোপিক ভিশন	stereoscopic vision
স্ট্যাণ্ড ম্যাগনিফাইয়ার	stand magnifier
স্ট্রেন	strain
স্ট্রোক	stroke
স্পেকট্যাক্‌ল্ ব্লার	spectacle blur
স্ফেরিক্যাল	spherical

স্ফেরো-সিলিণ্ড্রিক্যাল	sphero-cylindrical
হরমোন	hormone
হাই ক্যালরি ডায়েট	high calorie diet
হাইপারটেনশন	hypertension
হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি	hypertensive retinopathy
হাইপারমেট্রোপিয়া	hypermetropia
হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজ্‌ম্	hypoparathyroidism
হাই রিস্ক গ্রুপ	high risk group
হার্পিস সিমপ্লেক্স	herpes simplex
হীমারেজ	haemorrhage
হুপিং কফ	whooping-cough

ছবির জন্য কৃতজ্ঞতাস্বীকার

১. অ্যামেরিকান অ্যাকাডেমি অভ অফথ্যালমোলজি, সান ফ্রান্সিস্কো, অ্যামেরিকা
২. পেশেন্ট ইনফর্মেশন লাইব্রেরি, ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যামেরিকা
৩. ওয়ার্ল্ড ব্লাইণ্ড ইউনিয়ন, রিয়াধ, সৌদী আরব
৪. ইন্সটিটিউট অভ অফথ্যালমোলজি, লণ্ডন, বৃটেন
৫. এফ. হফম্যান-লা রোশ অ্যাণ্ড কোম্পানি, বাসলে, সুইজারল্যাণ্ড
৬. গ্লাক্সো ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড, গ্রীনফোর্ড, বৃটেন
৭. আই কেয়ার অ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা



ডঃ রমেন মজুমদার মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞান-লেখক হিসাবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের উপর বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তিনি লিখছেন। আধুনিক বাংলা লোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নাম অগ্রগণ্য। লোকবিজ্ঞানের প্রসার ও প্রচার অভিযানের সঙ্গে বহুদিন থেকেই তিনি যুক্ত। স্বরচিত ও অনূদিত গ্রন্থ আর পত্রপত্রিকার ক্ষেত্র ছাড়াও বেতারে ও দূরদর্শনে তিনি সুপরিচিত। ১৯৮৭ সালে তিনি তাঁর 'সুখাসনে সুখাহার' গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন।

ডঃ মজুমদার দীর্ঘদিন যুগান্তর পত্রিকার প্রধান সহ-সম্পাদক।। যুগান্তরে যখন পৃথক বিজ্ঞানবিভাগ ছিল তখন তিনি তারও সম্পাদক ছিলেন।

মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও মানবিকীবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় তাঁর অধ্যয়ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন পি-এইচ. ডি.। পৃথিবীর বহুদেশ তিনি ঘুরেছেন – কখনও সরকারী আমন্ত্রণে সরকারী অতিথি হিসাবে, আবার কখনও কর্মোপলক্ষে। পূর্ব ও পশ্চিমের কয়েকটি দেশে তিনি সাংবাদিক হিসাবে কাজও করেছেন।